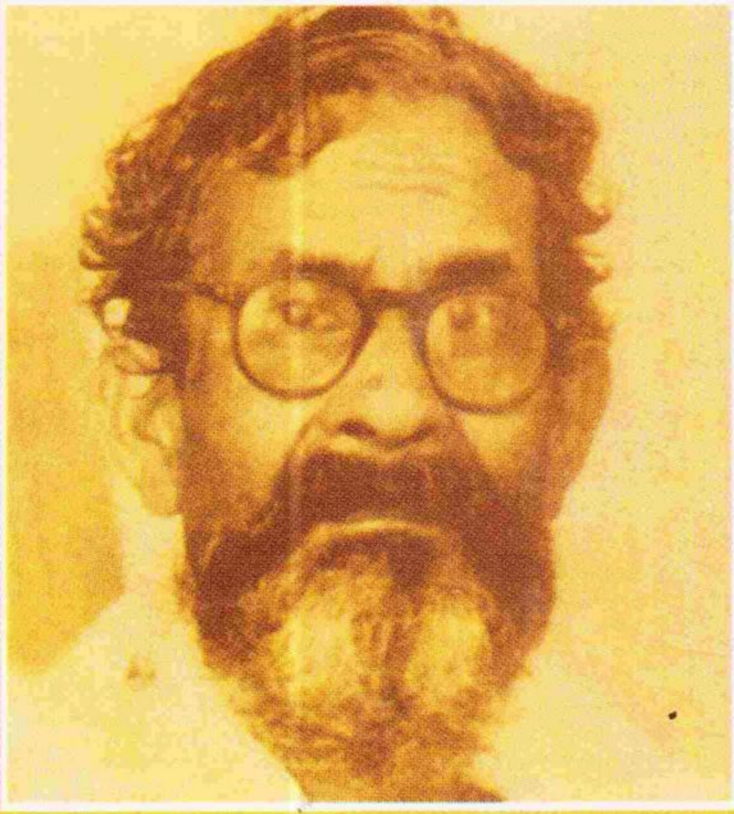
ক্ষিতিমোহন সেন

হিন্দুধর্ম



ক্ষিতিমোহন সেনের জন্ম ১৮৮০, কাশীতে। কাশী কুইন্স কলেজ থেকে সংস্কৃতে এম এ। কর্মজীবন শুরু চম্বারাজ্যের শিক্ষাবিভাগে। ১৯০৮ সালে রবীন্দ্রনাথের আহ্বানে ব্রহ্মচর্যাশ্রমে যোগদান, পরে বিদ্যাভবনের অধ্যক্ষ, কিছুদিন বিশ্বভারতীর অস্থায়ী উপাচার্য।

লোকসংগীত ও ছড়া সংগ্রহের জন্য তিনি ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে ভ্রমণ করেছেন। কবীর, দাদূ, মধ্যযুগের মরমিয়া সাধক এবং বাউলদের গানের সুসংবদ্ধ সংগ্রহ তাঁর অসামান্য কৃতিত্ব। তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থ : কবীর, মধ্যযুগের সাধনার ধারা, ভারতের সংস্কৃতি, বাংলার সাধনা, জাতিভেদ, হিন্দু মুসলমানের যুক্তসাধনা, বলাকা কাব্য পরিক্রমা, বাংলার বাউল, চিন্ময় বঙ্গ, প্রাচীন ভারতের নারী, যুগগুরু রামমোহন।

রবীন্দ্রনাথের 'ওয়ান হান্ড্রেড পোয়েমস অফ কবীর' গ্রন্থটি ক্ষিতিমোহনের কবীর-বচন সংগ্রহ অবলম্বনে রচিত (১৯১৪)।

বিশ্বভারতীর প্রথম 'দেশিকোত্তম' (১৯৫২)।

মৃত্যু : ১২ মার্চ ১৯৬০।


ISBN 984-8674-18-7
9 789847 840116 >

হিন্দুধর্ম

ক্ষিতিমোহন সেন

অনুবাদ সোমেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

তপন প্রকাশন

হিন্দুধর্ম

ক্ষিতিমোহন সেন

প্রকাশক :
বিজয় রায়
তপন প্রকাশন
৬৫ প্যারী দাস রোড, ঢাকা-১১০০

পরিবেশক :
নবযুগ প্রকাশনী
২/৩ প্যারী দাস রোড, ঢাকা-১১০০

প্রকাশকাল : সেপ্টেম্বর, ২০০৮

প্রচ্ছদ : লিটন

মূল্য : ৮০.০০ টাকা

মুদ্রণে :
জে. কে. প্রেস এন্ড পাবলিকেশন্স
২ জয় চন্দ্র ঘোষ লেন, ঢাকা-১১০০

ISBN 984 8674 18 7

সূচি

তৃতীয় ভাগ
হিন্দু ধর্মগ্রন্থ্ থেকে নির্বাচিত অংশ

ভূমিকা

খ্রিস্টান, ইসলাম বা বৌদ্ধ—বিশ্বের এই সব ধর্মের যেমন একজন প্রবর্তক আছেন হিন্দুধর্মের তেমন কোনও প্রবর্তক নেই। প্রায় পাঁচ হাজার বছর ধরে ভারতের সমস্ত ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনকে সাঙ্গীকরণ ও স্বীকরণের মধ্যে দিয়ে ক্রমশ গড়ে উঠেছে এই ধর্ম। ফলত মতান্তরের মীমাংসার জন্য এর কোনও বাইবেল, কোরাণ কিংবা ধম্মপদ নেই। বেদ, উপনিষদ, গীতা, রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ, তথাকথিত ষড়দর্শন-বিষয়ক গ্রন্থাবলী, ভক্তিধর্মান্দোলনের পদাবলী সাহিত্য, মরমিয়া সাধকের গান—এ সমস্তই প্রামাণ্য আকর, কিন্তু কোনোটিই এককভাবে নয়। এই বিচিত্র মতাদর্শের মধ্যে বহু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়েই পার্থক্য আছে। এমনকি আজও তাদের তফাতগুলো কোনও দিক থেকেই তুচ্ছ নয়। এই কারণেই হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে সর্বজনপাঠ্য কোনও বই লেখা খুবই দুরূহ কাজ। কেননা বিভিন্ন মতবাদের মধ্যে কোনটিকে অপেক্ষাকৃত গুরুত্ব দেয়া যাবে তা স্থির করা আদৌ সহজ নয়। জানি না আমার বিচার প্রাজ্ঞ পাঠকের গ্রহণযোগ্য হবে কিনা। চেষ্টা করেছি যথাসম্ভব নৈর্ব্যক্তিক থাকার, কিন্তু এই একটি ক্ষেত্র যেখানে ব্যক্তিগত পক্ষপাত এড়িয়ে চলা খুবই কঠিন। অতীতে কিছুদিন হিন্দু দর্শন বিষয়ে বহু গ্রন্থ সম্বন্ধেই আমার সমালোচনা ছিল এই যে উচ্চশিক্ষিত সম্প্রদায়ের তথ্যাবলীর প্রতি বেশি মনোযোগী হয়ে সেগুলো সমাজের নিম্নবর্গের জনগোষ্ঠীর ধর্মান্দোলনকে খুবই কম গুরুত্ব দিয়েছে। লোকায়ত ধর্মান্দোলনে যে দর্শনের প্রকাশ তাকেও অন্তর্ভুক্ত করার জন্য আমার বিবেচনা মতো আরও একটু উদার দৃষ্টিভঙ্গির আশ্রয় নিয়েছি। আশা করি অধিকাংশ পাঠক এই উপস্থাপনে একটা ভারসাম্য লক্ষ্য করবেন। তবে এ বিষয়ে আমি যথেষ্ট সচেতন যে এই একটা ক্ষেত্র যেখানে মতের অনৈক্য এড়ানো অসম্ভব।

এ গ্রন্থে আমার লক্ষ্য সেই সব পাঠক, হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে যাঁদের কোনও বদ্ধধারণা নেই। সেই কারণেই পাঠকের কাছে নতুন ঠেকতে পারে এমন সব তত্ত্বকেই ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছি। হিন্দুধর্মের বিশেষজ্ঞ বানাতে চাইনি পাঠককে। বেশ দক্ষতার সঙ্গে লেখা অনেকগুলো বিপুলায়তন বই আছে ধর্ম বিষয়ে। উৎসাহী পাঠক সেগুলো দেখে নিতে পারবেন সহজেই। এই গ্রন্থ নিছক ভূমিকা ছাড়া কিছু নয়। হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে কিছুই জানেন না এমন পাঠকদের এ ধর্মের স্বভাব আর ক্রিয়াকলাপের একটা প্রাথমিক ধারণা দেয়ার, আর সেই সঙ্গে তাঁদের মনে একটু আগ্রহ জাগিয়ে তোলার উদ্দেশ্যেই এ বই লেখা। কোনও কোনও পরিচ্ছেদের অতি সংক্ষিপ্ত চেহারায় হয়তো হতাশ হবেন কিছু পাঠক। যেমন ষড়দর্শন-বিষয়ক পরিচ্ছেদটির, কিন্তু এটা সম্পূর্ণ ইচ্ছাকৃত। হিন্দুধর্ম নিয়ে কথার ভার আর বাড়াতে চাইনি।

আমি শুধু চেষ্টা করেছি এমন কিছু লিখতে যা নানা কাজে জড়িয়ে থাকা মানুষও পড়তে পারেন। মনে হয় সন্তুষ্টির জন্য বিদগ্ধ পাঠককে অন্য কোথাও সন্ধান করতে হবে। অবশ্য তিনি প্রাথমিক পরিচয়ের জন্য এ বইটি ব্যবহার করতে পারেন। এর মধ্যে অধিকাংশ হিন্দু মতবাদের মূল বৈশিষ্ট্যগুলোকে মনে হয় তুলে ধরার চেষ্টা করেছি।

এ গ্রন্থের পরিকল্পনার কিছু ব্যাখ্যা দেয়া দরকার। প্রথম ভাগে হিন্দুধর্মের সম্প্রদায়গুলোর (অর্থাৎ বিভিন্ন মতবাদগুলোর) প্রকৃতি ও তত্ত্বের আলোচনা করা হয়েছে। দ্বিতীয় ভাগে আলোচিত হয়েছে হিন্দু চিন্তা আর সাধনার বিবর্তন ইতিহাসের ক্রম অনুসরণ করেই। আর তৃতীয় ভাগে আছে হরেক শাস্ত্রগ্রন্থ থেকে উদ্ধৃতির একটি সংকলন। এই উদ্ধৃতিগুলো ধর্মজগতের মোটামুটি ব্যাপক ক্ষেত্র জুড়ে আছে। আমার বিশ্বাস, এগুলোর মধ্যে দিয়ে কিছু কিছু তত্ত্বের সঙ্গে পাঠক সরাসরি পরিচিত হতে পারবেন।

পরিশেষে এই গ্রন্থ রচনায় যে আনুকূল্য ও সহায়তা পেয়েছি আমার বন্ধু ও সহকর্মীদের কাছ থেকে কৃতজ্ঞচিত্তে তা স্মরণ করি। আমার শিক্ষা এবং জীবনের পটভূমি প্রায় সম্পূর্ণ ভাবেই প্রাচ্য, আর আমার ভাবনা সহজতর স্ফূর্তি পায় ইংরেজি নয়, ভারতীয় ভাষাতেই। এ পর্যন্ত আমার প্রায় সব

রচনাই ভারতীয় ভাষায়। আমার বন্ধু আর শুভার্থীদের সহায়তা ছাড়া বইটির ইংরেজিতে উপস্থাপন খুবই কঠিন হত। এ গ্রন্থরচনায় আরও নানাভাবে সাহায্য করেছেন তাঁরা। বিশেষ করে ড. শিশির কুমার ঘোষের সক্রিয় সাহায্য এবং সহযোগিতায় আমি কৃতজ্ঞ। আমার দৌহিত্র ড. অমর্ত্য সেনের কাছেও বিশেষ সহায়তা পেয়েছি এ গ্রন্থের উপস্থাপনা আর বিন্যাসের কাজে।

ক্ষিতিমোহন সেন

শান্তিনিকেতন
জানুয়ারি ১৯৫৯

প্রথম ভাগ

হিন্দুধর্মের প্রকৃতি ও মূল তত্ত্ব

সূচনা

প্রায় চারশো বছর আগে ভারতে রজ্জব নামে এক সাধক কবি ছিলেন। যখন জানা গেল রজ্জব সিদ্ধিলাভ করেছেন, তখন চারদিক থেকে মানুষের দল তাঁকে শুধোতে লাগল, 'কী দেখছেন আপনি?' 'কী শুনতে পাচ্ছেন?' তিনি উত্তর দিলেন, 'আমি দেখছি জীবনের নিত্য লীলা, আর আমার কানে বাজছে অলৌকিক কণ্ঠের সুরময় বাণী—"যা এখনও রূপ পায়নি তাকে রূপ দাও, শোনাও তোমার কথা, প্রকাশ করো"।'

রজ্জবের ভাষায়, 'জীবন প্রকাশ খোঁজে, তাকে কথা কইতে হবে।' বাস্তব প্রয়োজন মেটানোর জন্য মানুষকে কাজ করতে হয়, করতে হয় পরিশ্রম। কিন্তু এইতো আর তার পক্ষে যথেষ্ট নয় ; আরও কিছু তার চাই। তিন হাজার বছরেরও বেশি পুরনো অথর্ববেদের উচ্ছিষ্ট সূক্তে প্রশস্তি আছে এই 'আরও কিছুর'। প্রথমেই এই অস্তিত্বের রহস্যকে ঘিরে এক ভয়-মেশানো বিস্ময়ের প্রকাশ দেখা যায়। হিন্দুধর্মে আমরা মুখ্যত দুই হাজার খ্রিস্টপূর্বাব্দে রচিত বৈদিক সংহিতায় এ জিনিস দেখি। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় এগুলো হল বিস্ময় আর ভয় জাগানো অস্তিত্বকে ঘিরে মানুষের সমবেত প্রতিক্রিয়ার কাব্যিক দলিল, সভ্যতার একেবারে ঊষালগ্নে যে মানুষের প্রবল আদিম কল্পনা উদ্দীপ্ত হয়ে উঠেছিল জীবনের অন্তরে নিহিত অপরিমেয় রহস্যে।'[১]

এরই থেকে বিচিত্র অনুমানের জন্ম, আর সেই অনুমান থেকে গড়ে ওঠে অস্তিত্ব আর জীবনের নানা তত্ত্ব যার দেখা মেলে উপনিষদে (৮০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ) আর তার পরবর্তী হিন্দু দর্শনে।

১. Nicol Macnicol সম্পাদিত *Hindu Scriptures*-এর ভূমিকা। Everyman's Library, 1938, পৃ. ১৪৮-৯।

হিন্দুধর্মের এটি একটি দিক। অন্য দিক হল জীবনাচরণের নীতি বা নৈতিক আচরণবিধি। মানুষ কী করে আর তার মূল্যবোধ অনুযায়ী কী করণীয় এ দুইয়ের মধ্যে একটা বিরোধ দেখার প্রবণতা আছে প্রত্যেক ধর্মেই। যখনই মানুষকে পরম একের সৃষ্টি এবং সকল মানুষকে ভাই বলে স্বীকার করা হয়, তখনই সামনে এসে দাঁড়ায় নিঃস্বার্থ সেবা আর ত্যাগের আদর্শ। যখনই উপনিষদে সর্বব্যাপী ব্রহ্মের তত্ত্ব প্রকাশিত হয় তখনই অস্বীকার করা কঠিন হয়ে ওঠে ভগবদ্‌গীতার নিষ্কাম কর্মের আদর্শ।

আজ আমরা বাস করছি বিজ্ঞানের যুগে। বহু বিষয়েই আজ আমরা আমাদের পূর্বসূরিদের চেয়ে বেশি ভাগ্যবান। অবশ্য তাঁদের চেয়ে বেশি নিরাপত্তা বোধ করছি আজ, এমন বলা হঠকারী সিদ্ধান্তই হবে। এমনকি আমাদের ভোগবাদী সমাজ ব্যক্তি ও ব্যষ্টিজীবনে সামঞ্জস্য ঘটিয়েছে, এমন দাবি করা আরও কঠিন। নব্য বিজ্ঞান আর তারই সঙ্গে যুক্ত সামাজিক বিকাশ আমাদের একই সঙ্গে সমস্যা আর সুযোগের সামনে এনে দাঁড় করিয়েছে। হিন্দুধর্ম এ কালের এই সব বিভ্রান্তিকর সমস্যার সমাধান পুরোপুরি বলে দেয় এমন দাবি আমি করি না। কিন্তু এর মৌলিক বিশ্বাস আর জীবনদর্শন হয়তো আধুনিক বিশ্বের সমস্যার ক্ষেত্রে অপ্রাসঙ্গিক নয় এবং হয়তো বা এই যুগসংকটে উঠে আসা কিছু প্রশ্নের পুরো তাৎপর্য বুঝে নেয়ার ক্ষেত্রে সহায়কও। এই প্রেক্ষিতেই হিন্দুধর্মের মূল তত্ত্বগুলোর বিবরণ দেয়ার তাৎপর্য রয়েছে। অতীতে এই তত্ত্বগুলোই বিশ্বের প্রায় অর্ধেক মানুষের চিন্তাকে প্রভাবিত করেছে, কিছু হিন্দুধর্মেরই মধ্যে দিয়ে, আবার কিছু এরই প্রশাখা জৈন বা বৌদ্ধধর্মের সহায়তায়। সেটাই বোধ করি বইটি লেখার যুক্তি হিসেবে যথেষ্ট। কিন্তু গ্রন্থ-লেখকের বিশ্বাস হিন্দু দর্শন শুধুই অতীতের ব্যাপার নয়, বর্তমান কালের সমস্যার ক্ষেত্রেও আজ একান্ত প্রাসঙ্গিক। হিন্দুধর্মের দৃষ্টিকোণের সঙ্গে আদৌ পরিচয় নেই এমন মানুষের কাছে এই ধর্মের মূল তত্ত্বের ব্যাখ্যা করা একটু কঠিন কাজ। এর একটা কারণ কিছু কিছু পারিভাষিক শব্দের কোনও উপযুক্ত প্রতিশব্দ নেই ইউরোপীয় ভাষাগুলোতে। হিন্দুধর্ম বিষয়ে যাঁরা লেখেন তাঁরা প্রত্যেকেই জানাতে বাধ্য হন যে 'ধর্ম' আর 'রিলিজন' এক জিনিস নয়, 'মন্দির' হিন্দু 'গির্জা' নয়,

'জাতি'র তর্জমা করা হয়েছে 'কাস্ট' কিন্তু তর্জমাটি লাগসই নয় আদৌ। হিন্দু দর্শনের এক গুরুত্বপূর্ণ শব্দ 'সাধনা'র কোনও প্রতিশব্দই নেই ইংরেজিতে। এর তুলনা পাওয়া যায় তখন অখ্রিস্টান সংস্কৃতি আর ভাষার জগতে 'ক্রশ' কিংবা 'চ্যারিটি'র ঠিক প্রতিশব্দটি খুঁজতে গিয়ে এমনি অসুবিধেয় পড়তে হয় আমাদের।

হিন্দুধর্মের সংজ্ঞা নিয়েও আর এক অসুবিধা। হিন্দুধর্ম একটা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে গড়ে তোলা কোনও বড় স্থপতির বিরাট স্থাপত্যের মতো নয়, বরং অনেকটা মহীরুহের মতো বেড়ে উঠেছে ধীরে ধীরে। দেখা যাবে বহু সংস্কৃতির প্রভাবকে এ ধারণ ক'রে আছে নিজের মধ্যে, ঠিক ভারতীয় মহাজাতির মতোই। হিন্দু চিন্তাজগতের অজস্র বৈচিত্র্য। সেই কারণেই A.C. Bonquet তুলনামূলক ধর্মালোচনা বিষয়ে লিখতে গিয়ে লক্ষ্য করেন 'বিশেষত ভারতবর্ষ তার সীমার মধ্যে ধর্মীয় সমস্যা সমাধানের সব রকম সম্ভাব্য চেষ্টার দৃষ্টান্ত রেখেছে।'[২] তথাকথিত আর্য আক্রমণের পূর্বেকার দ্রাবিড় সংস্কৃতি, অদ্রাবিড়ীয় জনগোষ্ঠীর সংস্কৃতি, যথার্থ সংস্কৃতায়িত আর্য সংস্কৃতি, আরও পরবর্তী আক্রমণকারীদের সংস্কৃতি, (হিন্দুধর্ম থেকে জন্ম নেয়া) বৌদ্ধ, জৈন, শিখ ধর্ম এবং বাইরে থেকে আসা ইসলাম ও খ্রিস্টধর্ম—হিন্দুচিন্তার বিবর্তনের নানা ধাপ হিসেবে এ সমস্তই অনুসন্ধানের বিষয়।

কিন্তু এর মানে এই নয় যে হিন্দুধর্মের নানান শাখার মধ্যে কোথাও কোনও মিল নেই। এমন ইঙ্গিত কখনও কখনও করা হয়ে থাকে যদিও। সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে মতবাদে তফাত খানিকটা আছে, কিন্তু এই সব তত্ত্বের মধ্যে মূলগত একটি ঐক্য রয়েছেই। নানা সম্প্রদায় যে নানা রকম উত্তর দেয় তার আংশিক কারণ, প্রশ্নও করা হয় নানান ভঙ্গিতে। এমনকি যখন ভাবনাগুলো সত্যিই আলাদা তখনও মিল দেখা যায় ধর্মীয় ধারণায়। এ থেকেই বোঝা যাবে কেন শঙ্করের অদ্বৈতবাদ ('ব্রহ্মই একমাত্র সত্য') আর ভক্তিমার্গের দ্বৈতবাদ ('তোমার চরণে কখন ঠাঁই পাবো?') এর মতো আপাতবিপরীত দর্শনও কোনও ভয়ংকর সংঘাতের সৃষ্টি করে না। ঐক্যের

২. *Comperative Religion*, Penguin Books, fifth edition, 1956, p. 112.

আর-এক উৎস হল যাকে কোনও কোনও ভারতীয় দার্শনিক বলেছেন 'চরিত্র'। সদাচরণের কিছু রীতি নিয়ে একটা বোঝাপড়াতো ছিলই, ছিল ব্যবহারের ক্ষেত্রে একটা মূল্যবোধ যা ধর্মচিন্তায় বিস্তর প্রথাবিরোধিতাকেও খানিকটা প্রশ্রয় দেয়। সেই কারণেই বহু হিন্দু যে বৌদ্ধধর্মকে হিন্দুধর্মেরই শাখা বলে মনে করে এতে অবাক হবার কিছু নেই।

বইটিকে দুটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। প্রথম ভাগে আছে হিন্দু ধর্মতত্ত্ব আর সাধনার বৈশিষ্ট্যের কথা। আর দ্বিতীয় ভাগে প্রাচীনতম কাল থেকে হিন্দুধর্মের বিকাশের ইতিহাসকে সংক্ষেপে ধরার চেষ্টা। স্বভাবতই এই রকম স্বল্পপরিসর একটি গ্রন্থে হিন্দুধর্মের সর্বাঙ্গীণ পরিচয় দেয়া সম্ভব হয়নি। তার পরিবর্তে চেষ্টা করেছি আমার নিরিখে হিন্দুধর্মের প্রধান প্রবণতা আর বিশেষত্বের একটা ছবি তুলে ধরতে, আর ভারতীয় ইতিহাসের যে সব স্তর বেয়ে চলে এসেছে এই ধর্ম তারই অনুসন্ধান করতে।

হিন্দুধর্মের প্রকৃতি ও বিকাশ

হিন্দু সমাজ বহু জাতি আর বহু সংস্কৃতির মিশ্রণের ফল। কিন্তু সমাজ ও ধর্মের জটিল রূপটিকে বুঝতে গেলে এই তথ্যটিকে গুরুত্ব দিতে হয়। হিন্দু শব্দটি এসেছে সিন্ধু (নদী) থেকে, কেন না পারস্যবাসীরা ভারতের কথা বলতে গিয়ে বলতেন সিন্ধুর ওপারের দেশ। তাই শব্দটিতে জাতিগত ইঙ্গিতই ধরা পড়ে—মানে দাঁড়ায় সিন্ধুতীরের বা ভারতের মানুষের ধর্ম। অবশ্য এই ব্যুৎপত্তি যে ধারণা তৈরি করে তার চেয়ে অনেক বড় ঐক্যের পরিচয় পাই হিন্দুধর্মে। বস্তুত এই ধর্মই বহু শতাব্দী ধরে ভারতের ঐক্য বজায় রাখতে সাহায্য করেছে। এই জটিল ধর্মটির উদ্ভব হল কিভাবে সে এক কৌতূহল জাগানো কাহিনি। এই পরিচ্ছেদে আমরা সেই ইতিহাসের একটা সংক্ষিপ্ত ছবি তুলে ধরব, আর বইয়ের দ্বিতীয় ভাগে একটু সবিস্তার বর্ণনা দেব সেই প্রক্রিয়াটির।

যাকে বলা হয় সিন্ধু উপত্যকার সভ্যতা তাই হল ভারতের প্রাচীনতম পরিচিত সভ্যতা। প্রায় আড়াই হাজার খ্রিস্টপূর্বাব্দে এই নাগরিক সভ্যতা যে বেশ উন্নতই ছিল তার প্রমাণ মেলে। খ্রিস্টপূর্ব দুই হাজার বছরের মাঝামাঝি এর পতন ঘটে সম্ভবত সেই সব মানুষের আক্রমণের ফলে যারা নিজেদের আর্য বলে বর্ণনা করেছে। 'আর্য' শব্দটি আজ একটু গোলমেলে বা অস্বস্তিকর ঠেকে বিশেষ করে হিটলার আর ফ্যাসিবাদের অনুষঙ্গে। একে দুর্ভাগ্যজনকই বলব। কেননা ভারতীয় ইতিহাসে আর্য কথাটি বহুল ব্যবহৃত শব্দের মধ্যে পড়ে। একটি বিশেষ জনগোষ্ঠীর কথা ছাড়াও মহৎ বা সৎ অর্থেও ব্যবহার হয়ে থাকে শব্দটি। তাই পশ্চিমি মানুষের মনে কথাটি যেমন অবাঞ্ছিত অনুষঙ্গে জড়িয়ে আছে, ভারতীয় চিন্তার জগতে

এর অনুষঙ্গ কিন্তু চিত্তাকর্ষই। আর্যজাতি বলে কখনও কি কোনও বস্তু আদৌ ছিল এমন সন্দেহ উঠেছে। কিন্তু তা নিয়ে কোনও দুর্ভাবনা নেই আমাদের। খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় সহস্রাব্দে একদল আক্রমণকারী ভারতে এসেছিল। তারা নিজেদের বলত আর্য। তারা যে ভাষা বলত (আমরা জানি) তার থেকেই সংস্কৃতের জন্ম। আর তাদের সেই ধর্ম ছিল যার পরিচয় মেলে ঋক্‌বেদে। এই জনগোষ্ঠীকেই বোঝাতে আমরা আর্য কথাটি ব্যবহার করব।

বেদ থেকে যা বোঝা যায় এদের ধর্ম মোটামুটি ছিল বহু ঈশ্বরবাদী। আর বৈদিক কাহিনিগুলো এর ইউরোপীয় প্রতিরূপের সঙ্গে খানিকটা মিলে যায়।[১] মুক্ত আকাশের নিচে অগ্নিকুণ্ড ঘিরে যাগযজ্ঞ করাই ছিল এদের পূজার পদ্ধতি। এদের সমস্ত ভাবনা জুড়ে ছিল প্রকৃতি। কেন না অধিকাংশ বৈদিক দেবতাই হলেন প্রাকৃতিক শক্তির রূপ। যেমন সূর্য, চন্দ্র, অগ্নি, পবন এই সব। সিন্ধু সভ্যতা সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান নিতান্তই অসম্পূর্ণ। কিন্তু মনে হয় এই মানুষেরা পুরুষ আর স্ত্রীদেবতা, দুইয়েরই উপাসক ছিল যার সঙ্গে পরবর্তী হিন্দু পুরাণের যোগ রয়েছে। ধীরে ধীরে ভারতে যে একটা একীকরণের প্রক্রিয়া চলেছে তার গুরুত্বপূর্ণ এক প্রমাণ মেলে আর্য, অনার্য পুরাণের মিশে যাওয়া, আর এক সাধারণ পুরাণের জন্ম নেয়ার মধ্যে। আরও তাৎপর্যময় ঘটনা ঘটল হিন্দু দর্শনের ক্ষেত্রে, দেখা গেল জীবন সম্বন্ধে বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি পরস্পরকে কিভাবে প্রভাবিত করেছে, আর তারপর কিভাবে উঠে এসেছে এক সমন্বয়—দৃষ্টান্ত উপনিষদ, গীতা, ধম্মপদ ইত্যাদি।

আর্যরা খুব কর্মঠ জাত, কঠোর কৃচ্ছ্রসাধন, বৈরাগ্য এ সবে তাদের নিতান্তই অনীহা। যতদূর অনুমান করা যায় এই ভাবনাগুলো ছিল পূর্বতন ভারতীয় সভ্যতার স্বভাবগত। অবৈদিক জনগোষ্ঠী কখনও আর্যদের মতো

১. ইরানীয় আবেস্তা, গ্রিক ও রোমান সাহিত্য, এমনকি টিউটনিক ও নর্ডিক কাহিনির সঙ্গে বেদের তুলনা করলেই এদের মধ্যেকার পৌরাণিক বিশ্বাসের চোখে পড়ার মতো মিল ধরা পড়ে যায়। যেমন আমাদের বৈদিক আকাশের দেবতা দ্যৌঃ অথবা দ্যৌঃ পিতর গ্রিক Zeus, ল্যাটিন Jupiter, প্রাচীন নর্ডিক Tyr এবং প্রাচীন টিউনিক Zin ছাড়া কেউ নন। হিন্দু দেবতা মিত্র ইরানীয় Mithra একই। পুরাণ ছাড়াও জীবন ও মৃত্যু, মর্ত্য ও স্বর্গ সম্বন্ধে এদের দৃষ্টিভঙ্গি ও ভাবনার ক্ষেত্রেও মিল অনেকখানি।

যজ্ঞের আগুনকে ঘিরে সমবেত হত না। পুণ্যস্নানের তীর্থগুলো ছিল তাদের ঐতিহ্যময় ধর্মচর্চার মিলনক্ষেত্র। খ্রিস্টপূর্ব সহস্রাব্দের সূচনায় ধর্মীয় ঐতিহ্যের দুটি ধারা মনে হয় মিলে গেছে আর বৈরাগ্য, তপশ্চর্যা ইত্যাদিকে আত্মসাৎ করে নিয়েছে বৈদিক ধর্ম।

উপনিষদগুলো (খ্রিস্টপূর্ব ৮০০) গড়ে উঠেছে ব্রহ্ম আর আত্মার তত্ত্বকে কেন্দ্র করে। ব্রহ্ম শব্দটির অর্থ সর্বব্যাপী ঈশ্বর। এই পরিভাষাটি ইংরেজ পাঠকের কাছে একটু বিভ্রান্তিকর ঠেকবে, ব্রাহ্মণ শব্দটির ইংরেজি ব্রাহ্মিণ শব্দের ধ্বনিসাম্যে। অন্য শব্দ আত্মা অর্থে জীবাত্মা বা জীবের অস্মিতা। উপনিষদের দৃষ্টিতে ব্রহ্ম আর আত্মা অভিন্ন। সেই পরম এক প্রত্যেক জীবের মধ্যে প্রকাশ করছেন নিজেকে। আর তত্ত্বজ্ঞানলাভেচ্ছুকে একটু নাটকীয়ভাবেই বলা হয়েছে উপনিষদে—'তত্ত্বমসি'—'তুমিই তিনি'। এই ভাবনার মধ্যেই অধিকাংশ হিন্দু ধর্মচিন্তার মর্মকথাটি বলা হয়ে গেছে। পরবর্তীকালে এই ভাবনাকেই প্রতিষ্ঠা দিয়েছেন শঙ্করাচার্য তাঁর অদ্বৈতবাদে। এই তত্ত্ব ব্রহ্ম থেকে স্বতন্ত্র কোনও বিশ্বের অস্তিত্বকেই স্বীকার করে না। ভগবদ্‌গীতায় অবশ্য ঔপনিষদিক উপদেশের সামান্য একটু রূপান্তর নজরে পড়ে। গীতা রচিত হয় উপনিষদ রচনার কয়েক শতক পর (অর্থাৎ খ্রিস্টপূর্ব প্রথম সহস্রাব্দের প্রায় মাঝামাঝি)। এতে আত্মার অবিনশ্বরতার কথা তুলে ধরা হয়েছে, নিষ্কাম কর্মের আদর্শের আর প্রত্যেক জীবের কর্তব্যের উপর দেয়া হয়েছে গুরুত্ব। এই কালপর্বেই (৮০০-৫০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ) পত্তন হয় আধুনিক হিন্দুধর্মের, একেশ্বরবাদকে জায়গা ছেড়ে দেয় বহু ঈশ্বরবাদ, স্পষ্ট হয়ে দেখা দেয় নৈতিক আচরণবিধি, ধর্মের ভাবী গতিমুখগুলোর নির্ণয় হয়ে যায় অনেকটাই। এর মধ্যে আবির্ভাব ঘটে গেছে জৈনধর্ম আর বৌদ্ধধর্মের। দুটি ধর্মই প্রেম ও বৈরাগ্যের হিন্দু আদর্শকে প্রসারিত করেছে, কিন্তু ঝোঁকটা বদলেছে বেশ খানিক। কিছুকালের জন্য ভারতবর্ষ অনেকাংশে বৌদ্ধই হয়ে গিয়েছিল বিশেষ করে খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতকে মহান সম্রাট অশোকের রাজত্বকালে। পরে আবার হিন্দুধর্মের প্রাধান্য ঘটে। অবশ্য বৌদ্ধধর্ম বিস্তর প্রভাব রেখে দিয়ে যায় হিন্দুধর্মের উপর—পৌরাণিক কাহিনির বৈচিত্র্যে, সংস্কৃতির বিস্তারে, নৈতিক আচরণবিধিতে।

উত্তর-বৌদ্ধ হিন্দুধর্মে হরেক প্রবণতা চোখে পড়ে। হিন্দু শাস্ত্রগ্রন্থে ঈশ্বর প্রাপ্তির তিনটি পথের কথা আছে। জ্ঞান, কর্ম আর ভক্তি। অদ্বৈতবাদীদের মতো কিছু সম্প্রদায় জ্ঞানমার্গের কথা বলে। কোনও কোনও আন্দোলন শান্ত ঈশ্বর-উপলব্ধির চেয়ে উচ্ছ্বসিত ভক্তির পথকেই গ্রহণীয় মনে করে।

অবশ্য এটা যে একান্তই উত্তর-বৌদ্ধযুগের ব্যাপার এমন নয়। ভক্তিসাধনার ঐতিহ্য বৈদিক যুগ থেকেইতো দেখা গেছে। এটি যদিও মোটামুটি অনার্য ঐতিহ্যের অন্তর্গত। খ্রিস্টপূর্ব প্রথমে সহস্রাব্দের শেষ দিকে অবতারবাদের বিকাশ ঘটে। ভক্তির পুষ্টি এর পর থেকেই। কেননা মানুষের পক্ষে উপনিষদের সর্বব্যাপী নিরাকার ব্রহ্মের চেয়ে ব্যক্তিরূপে মূর্ত ঈশ্বরকে ভালবাসা অনেকখানি সহজ। ভক্তি-আন্দোলন প্রায়ই গড়ে উঠেছে কৃষ্ণ কিংবা রামের মতো অবতারদের ঘিরে, যদিও কখনও কখনও নিরাকার ঈশ্বরকে নিয়েও ভক্তির বিকাশ লক্ষ্য করা যায়। সেখানেও অবশ্য নিরাকারে খানিকটা রূপ আরোপ করা হয়। তিনি কখনও বিষ্ণু, কখনও শিব, কখনও কালী। শেষের কোনও অধ্যায়ে আমরা রূপাতীতকে রূপ দেয়ার এই হিন্দু ঐতিহ্যের পর্যালোচনা করব। ভক্তি-আন্দোলনের সমৃদ্ধির সময় হল ভারতের মধ্যযুগ, আর একে আরও শক্তিশালী করে তুলেছিল মুসলিম সুফি সাধনার ধারা।

আধুনিক যুগে অনেকটা খ্রিস্টান মিশনারীদের কার্যকলাপের প্রতিক্রিয়ায় উপনিষদ ইত্যাদির মতো প্রাচীন হিন্দুশাস্ত্রগ্রন্থের সম্বন্ধে সাধারণ মানুষের আগ্রহ জেগেছে। জগৎ যে ব্রহ্মেরই এক অভিব্যক্তি, ঔপনিষদিক এই তত্ত্বে শিক্ষিত সমাজের অধিকাংশ হিন্দুই বোধহয় বিশ্বাসী। অভিচারমূলক পূজার্চনায় আগ্রহ বেশ কমে গেছে এই শ্রেণির মধ্যে। অনেক সময় সামাজিক প্রথা হিসেবেই পালন করা হয় এগুলো, বিশুদ্ধ ধর্মীয় অনুষ্ঠান হিসেবে নয়। অবশ্য অধিকাংশ দরিদ্র মানুষ যারা সংখ্যায় বিপুল তাদের দেব-আরাধনা ভক্তির চিরাচরিত সোজা পথেই, আচার-অনুষ্ঠান অর্থাৎ কর্মের সঙ্গে যোগে ; বিশুদ্ধ জ্ঞানের সঙ্গে কোনও সম্বন্ধ নেই। এই পদ্ধতির ধারাবাহিকতাই পশ্চিমি মানুষের অনেকের মনে এই ভুল ধারণার সৃষ্টি করেছে যে হিন্দুধর্ম বহু ঈশ্বরবাদী। লৌকিক হিন্দুধর্মে ঈশ্বরকে নানান রূপে বা মূর্তিতে পূজা করা হয় বলেই ব্রহ্মের তত্ত্বটি না বুঝলে খুব সহজে এই

ভুলটিই হবে। হিন্দু পুরাণের দেবদেবীদের মধ্যে কোনও একজনের প্রতি বিশেষ আকর্ষণ জন্ম নেয় কোনও বিশেষ জনগোষ্ঠীর মধ্যে সামাজিক ঐতিহ্য অনুসারে। সেই জনগোষ্ঠী সেই বিশেষ রূপেই পূজা করে দেবতাকে। নাম আর রূপের অতীত যিনি তাঁকে ডাকা হয় নানান নামে, দেখা হয় বিশেষ রূপে। কিন্তু এ কথা কেউ ভোলে না যে তিনি এক।[২] শুধু শাস্ত্রে বা পণ্ডিতের পুথিতেই এ কথা বলা হয়েছে এমন নয়, অতি সহজ সরল সাধারণ ভক্তও এই সত্যকে স্বীকার করবে। এও এক দিক থেকে ভারতীয় সাধনায় বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের পরিচয় দেয়। চারশো বছর আগে রজ্জবও এ কথাই বলেছিলেন তাঁর গানে—

'নানা সম্প্রদায়ের পূজা যেন অজস্র ছোট ছোট ঝর্ণার ধারা, বয়ে চলেছে একসঙ্গে ঈশ্বরের দিকে, তিনি যেন এক মহাসাগর।'

২. পঞ্চম অধ্যায়ে এ প্রসঙ্গে আরও আলোচনা আছে।

সামাজিক আদর্শ ও মূল্যবোধ

হিন্দু মতবাদ অনুসারে আদর্শ জীবন চারটি আশ্রম বা পর্যায় নিয়ে গড়া—ব্রহ্মচর্য (সংযম ও শিক্ষার কাল), গার্হস্থ্য (সংসারধর্ম-পালন ও কর্ম সম্পাদনের কাল), বানপ্রস্থ (সংসার-বন্ধন শিথিল করে অবসর গ্রহণের কাল) এবং পরিশেষে সন্ন্যাস (নির্জন বাস ও সাধনার কাল)। ব্রহ্মচর্যের সময়টি হল বিদ্যা অর্জন, সেই সঙ্গে কঠিন কৃচ্ছ্রসাধনের সময়। হিন্দুর মূল্যবোধ অনুযায়ী জ্ঞান এবং যোগ অর্থাৎ দেহ আর মনের নিয়ন্ত্রণ—এ দুটিকেই খুব সম্মানের দৃষ্টিতে দেখা হয় চিরকাল। সংযম শিক্ষা আর জ্ঞানার্জনকে তরুণ বয়সিদের প্রাথমিক ধর্মীয় কর্তব্য হিসেবে গণ্য করা হয়ে থাকে।[১] পরবর্তী পর্যায়গুলোর চেয়ে গার্হস্থ্যকে কম গুরুত্বপূর্ণ ভাবা হয়, এমন নয়। যদিও বৈরাগ্যকে অতীব গুরুত্ব দেয়া হয়েছে হিন্দুধর্মে। এক হিসেবে গার্হস্থ্যকেই চতুরাশ্রমের প্রধান অবলম্বন ভাবা হয়ে থাকে কেননা সমগ্র সামাজিক কাঠামোকে এ ঐক্য দেয়, সংলগ্ন রাখে। আর অন্য আশ্রমগুলো এরই উপর নির্ভর করে তাদের পরিপোষণের জন্যে।

১. এমন অনুমান ঠিক নয় যে, এই জীবনবোধের দিক থেকে শিক্ষা মানেই তাত্ত্বিক আর ধর্মীয় শিক্ষা। ব্যাকরণ, তর্কশাস্ত্র, ভাষার ধ্বনিতত্ত্ব, গণিত, ত্রিকোণমিতি, বীজগণিত, সাহিত্যের কথা বলাতো বাহুল্যই—এই সব বিষয়ে মূল্যবান অবদান পাওয়া গেছে ধর্মজগতের মানুষের কাছেই। চিকিৎসা শাস্ত্র নিয়ে নিবন্ধ সম্বন্ধেও একই কথা। (দৃষ্টান্ত—ভেষজবিদ্যায় চরক, শল্য চিকিৎসায় সুশ্রুত)। এ সব খ্রিস্ট অব্দের গোড়ার শতকগুলোতেই ঘটেছে। হিন্দু তাত্ত্বিকরা জীবনাতীতের সন্ধানে ফিরলেও আধিভৌতিক জীবনের বাস্তবতাকে কখনও উপেক্ষা করেননি। বস্তুত বাস্তব জগতের সম্বন্ধে যথার্থ জ্ঞান হিন্দু শিক্ষার অঙ্গ হিসেবে গণ্য হত। 'তাই ক্রমোন্নত এই জ্ঞানের ভিত্তি হওয়া দরকার পরিচ্ছন্ন, শুদ্ধ, সংযত বুদ্ধি। এও দেখা দরকার, ভুলগুলো সংশোধন করা হবে কখনও বাস্তবসম্মত তথ্যের নিয়ন্ত্রণে, জীবনের প্রত্যক্ষ জগতে ফিরে এসে। মাটির স্পর্শ সব সময়ই মাটির সন্তানদের সঞ্জীবিত করে তোলে, এমনকি যখন সে অতিলৌকিক জ্ঞানের সন্ধান করে তখনও। এমনকি এও বলা যায় যে অতিলৌকিককে যথার্থ সম্পূর্ণভাবে আয়ত্ত করতে হলে, চূড়ান্ত মাত্রাকে ছুঁতে হলে দৃঢ়ভাবে পা রাখার দরকার মাটিতে। "তাঁর চরণ মাটিতে"—উপনিষদেও এ কথা বলা হয় এ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে প্রকাশিত পরমাত্মার রূপ কল্পনা করার সময়।' (শ্রীঅরবিন্দ, *The Life Divine*, ১৯৪৯, পৃ. ১২-১৩)।

একজন হিন্দু কর্মময় বিবাহিত জীবন যাপন করবে এই আশ্রমে এটাই প্রত্যাশিত। এই আশ্রমেইতো সমাজবদ্ধ জীবনযাপনের আদর্শগুলোকে বিশেষ জোরের সঙ্গে প্রয়োগ করার কথা। নৈষ্কর্ম্যই হিন্দুর আদর্শ এমন কথা শোনা যায় প্রায়ই, কিন্তু আসলে হিন্দুশাস্ত্রের বেশ অনেকখানি জুড়েই কর্মময় জীবনের গুরুত্বের কথা বলা হয়েছে। 'তুমি শাস্ত্রনির্দিষ্ট নিত্য কর্ম কর, কর্ম না করার চেয়ে কর্ম করাই শ্রেয়। কর্ম না করলে তোমার দেহযাত্রাও নির্বাহ হবে না।' (ভগবদ্‌গীতা, তৃতীয় অধ্যায়, অষ্টম শ্লোক)। কৃষ্ণ অর্জুনকে বলেছেন, মানুষকে কর্তব্য সম্পাদন করতে হবে, কিন্তু সে হবে নিষ্কাম কর্ম ; অর্থাৎ তা কোনও ফলের জন্য নয়, এমনকি পরম লক্ষ্য স্বর্গের জন্যও নয়।

যাই হোক, জীবনের এই দ্বিতীয় পর্যায়ের সাফল্যকে যথেষ্ট বলে বিবেচনা করা হয় না। ভর্তৃহরির সেই মোক্ষম কথায় 'যদি তোমার সব বাসনার উৎসমুখ খুলে যায়, যদি তুমি তোমার শত্রুর ঘাড়ে পা রেখে থাকো, কিংবা সৌভাগ্যবশে বন্ধু জোটাতে পারো তোমাকে ঘিরে, এমনকি যদি নশ্বর দেহকে যুগ যুগ ধরে জীবন্ত রেখে দিতে পারো, ততঃ কিম?' তাতেই বা কী? পার্থিব জগতের সাফল্যগুলো বিরাট হলেও যথেষ্ট বলে বিবেচিত হবে না। আর এখানেই মোক্ষ বা মুক্তির কথা আসে। মুক্তির আদর্শ কোনও নেতিবাচক দশা নয়, এ হল সম্পূর্ণতার, অস্তিত্বের পরিপূর্ণতার, কর্মবন্ধন থেকে অর্থাৎ পুনর্জন্ম থেকে মুক্তির অবস্থা। হিন্দুশাস্ত্রে পুনর্জন্মের তত্ত্বকে স্বীকার করা হয়েছে। এবং মোক্ষ বা মুক্তি বৌদ্ধ শাস্ত্রের নির্বাণের মতো জীবনের বন্ধন থেকে অব্যাহতি। সংসারের তৃতীয় পর্যায় অর্থাৎ বানপ্রস্থ আশ্রমে হিন্দুর করণীয় সামাজিক বন্ধনগুলোকে শিথিল করে দেয়া। আর পরবর্তী পর্যায় অর্থাৎ সন্ন্যাস আশ্রমে তপস্বীর জীবন বরণ করা। রবীন্দ্রনাথের কথায়, আমাদের ইন্দ্রিয়গুলো যখন শিথিল হয়ে আসে তখনও আমরা তাদের সক্রিয় থাকার আর্জি জানাই। মুষ্টি আলগা হলেও সম্পদ ত্যাগ করতে আমাদের অনীহা। যা অবধারিত তাকে স্বাভাবিক বলে মেনে নেয়ার শিক্ষা আমাদের হয়নি। আর তাই যা যাবেই তাকে স্বচ্ছন্দে প্রসন্নমনে ছেড়ে দিতে অক্ষম, কামনার ধনকে আঁকড়ে রাখতে চাই যতক্ষণ না তাকে কেড়ে নেয়া হয়।[২]

২. *Religion of Man,* London, 1931, P. 198 .

এই সাধারণ আচরণের বিপরীতে আদর্শ মানুষের প্রবণতা হল ধীরে ধীরে মর্ত্যজীবন থেকে নিজেকে সরিয়ে নেয়া, বৈষয়িক সাফল্যের কথা না ভেবে মুক্তি-চিন্তায় মগ্ন হওয়া। এইভাবে বৈরাগ্যসাধন হয়ে ওঠে আদর্শ মানবজীবনের গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়।

এই আলোচনা থেকে বোঝা যায় হিন্দুদের শ্রেয়োনীতির এই সুসম্বদ্ধ ব্যবস্থাটি একটু জটিল। এর মধ্যে জ্ঞানের কথা আছে, বাস্তবোচিত কর্মের প্রসঙ্গ এর অন্তর্ভুক্ত, ত্যাগ আর সেবাকে এ গুরুত্ব দেয়,আর বৈরাগ্যে এর চরম পরিণতি। এই জটিল বিমিশ্রতার জন্যই অনেক সময় বিশেষ অভিজ্ঞ বিদেশি পর্যবেক্ষকও হিন্দু নীতিশাস্ত্রের কোনও দিক ঠিক ধরতে পারে না। এমন ধারণা প্রকাশ করা হয়েছে যে ভারতে—

'... সংসারত্যাগী সন্ন্যাসীই সর্বজনের পরম শ্রদ্ধার পাত্র। তাঁর সেই বৈরাগ্যের সঙ্গে পরোপকার বা মানবকল্যাণের কোনোই সম্বন্ধ নেই। তার সবটাই আত্মসর্বস্ব আর যেহেতু প্রত্যেকেরই নিজের অক্ষয় কল্যাণটি দেখা আর পুনর্জন্মের হাত থেকে মুক্তি পাওয়ার ভাবনা ভাবা কর্তব্যের মধ্যে পড়ে, যথেচ্ছ স্বাধীনতাও আছে সেই কর্তব্য পালনে, তাই এই সব তাঁর চরিত্রকে কলঙ্কিত করে না। গাঁন্ধীজি যখন আত্মার মুক্তির জন্য তাঁর সঙ্গীদের নিঃস্বার্থভাবে সেবা করেছিলেন তখন কিন্তু তাঁর মধ্যে এক মহৎ অসংগতি দেখা গিয়েছিল, কেননা আত্মবিস্মৃত সেবা এটি হিন্দু নয়, খ্রিস্টান ভাবাদর্শে।'[৩]

হিন্দু মূল্যবোধের এ সমালোচনায় খানিকটা ন্যায্যতা অবশ্য আছে, যেহেতু ব্যক্তিগত মুক্তির জন্য বৈরাগ্যসাধন ধর্মচর্চার একটা বড় দিক। কিন্তু এ বিষয়েও সন্দেহ নেই যে ভারতীয় মূল্যবোধ বা নীতিবোধের জটিল জগতে নিঃস্বার্থ সেবার আদর্শটি বৈরাগ্যের চেয়ে কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। বহু হিন্দুশাস্ত্র গ্রন্থেই একে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। বিশেষ করে ভারতীয় নৈতিকতার মহৎ প্রবক্তা ভগবদ্‌গীতার মধ্যে। মহাত্মা গাঁন্ধী জানিয়েছেন তিনি এই গ্রন্থ থেকেই তাঁর সেবার আদর্শটি পেয়েছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ গীতায় বলেছেন, সমস্ত বাসনাকে বিসর্জন দিয়ে যে নিষ্কাম হয়ে চলে, 'আমি'

৩. Bouquet, A.C. op. cit. p. 147.

'আমার' এই চিন্তা করে না, হে পার্থ, সেই পরম শান্তি লাভ করে। একেই 'ব্রহ্মবিহার' বলে। (দ্বিতীয় অধ্যায়, শ্লোক ৭১-৭২)। অন্য প্রসঙ্গে বলেছেন, কেবলমাত্র কর্মে তোমার অধিকার আছে, ফলে নয়। কর্মফলে যেন তোমার আসক্তি না হয় ; কর্মত্যাগেও তোমার প্রবৃত্তি যেন না হয়। যোগস্থ হয়ে, আসক্তি ত্যাগ করে, হে ধনঞ্জয়, লাভালাভে নির্বিকার থেকে কাজ করে যাও। ফলাফলে চিত্তের সাম্যই যোগ (দ্বিতীয় অধ্যায়, শ্লোক ৪৭, ৪৮)।

খ্রিস্টপূর্ব প্রথম সহস্রাব্দে রচনাকালের সময় থেকেই ভগবদ্‌গীতাই হিন্দুধর্মের জীবননীতি এবং অসংখ্য প্রজন্ম মহাত্মা গাঁন্ধীর মতোই এর নৈতিক আদর্শে প্রভাবিত হয়েছে। স্বার্থলেশহীন কর্মের বৌদ্ধ ও জৈন আদর্শ— তাদের জন্মমূল হিন্দুধর্ম থেকেই উৎপন্ন হয়েছে, যদিও নিঃসন্দেহে বলা যায়, অশোকের মতো কোনও কোনও বৌদ্ধ সম্রাট হিন্দু সম্রাটের চেয়ে অনেক বেশি উদ্দীপনার সঙ্গে এর প্রয়োগ ঘটিয়েছেন। অবশ্য হিন্দু রাজাদের মধ্যেও কেউ কেউ ছিলেন, লোকসেবার জন্য যাঁদের সুখ্যাতি ছিল। কিছু প্রগতিধর্মী সমাজসেবামূলক উল্লেখযোগ্য কাজ হিন্দু রাজারা করে গেছেন, যেমন গুপ্তবংশীয়দের কয়জন। শৈবধর্মীয় নেতা বিশ্বেশ্বরের প্রতিষ্ঠা করা প্রসূতি-সেবাকেন্দ্র (প্রতিষ্ঠা ১১৮৩ খ্রিস্টাব্দ) এক দৃষ্টান্ত। কুচবিহারের পশু চিকিৎসালয় প্রকৃতই বুঝিয়ে দেয় যে অপরের সেবার অর্থ শুধু অন্য মানুষের সেবা নয়, সমস্ত জীবেরই সেবা। এই সেবাকেন্দ্রটি ইংরেজ পর্যটক রাল্ফ ফিচ্ (Ralph Fitch)[৪] দেখেছিলেন ষোড়শ শতাব্দীতে।

আবার বলি, হিন্দু নীতিশাস্ত্রটি রীতিমতো জটিল। ব্যক্তি বিশেষের স্বভাব, সেইসঙ্গে তার জীবনের পর্যায় অনুযায়ী করণীয়ের তফাত হতে পারে। কিছু সর্বজনীন নীতিবোধ অবশ্য আছে। যেমন সত্যনিষ্ঠা, দয়া, প্রেম— এগুলোকে প্রত্যেকের পালনীয় মনে করা হয়। কিন্তু মানুষের আরও নির্দিষ্ট প্রয়াসের ক্ষেত্রে

৪. 'বাংলা থেকে আমি কোচদের দেশে গেলাম। এখানে সকলেই স্নিগ্ধ স্বভাবের, তারা কাউকে হত্যা করে না। ভেড়া, ছাগল, কুকুর, বিড়াল, পাখি সব রকম জীবের জন্য তাদের হাসপাতাল আছে। বুড়ো হয়ে গেলে বা খোঁড়া হলে মৃত্যু পর্যন্ত তাদের রাখা হয় সেখানে। যদি কোনও লোক অন্য জায়গা থেকে দুর্বল কোনও জীবকে ধরে বা কিনে নিয়ে আসে সেখানে তবে তাকে টাকা বা খাবারদাবার দেয়, আর ওটিকে হাসপাতালে রেখে দেয় বা ছেড়ে দেয়।

—*Early Travels in India*. Ed. William Foster. Oxford University Press, 1921, pp. 24-5.

তার বয়স আর ধাত বা মানসিক গঠন অনুসারে অনেক কিছুই আপেক্ষিক হয়ে যায়। তাই বৈরাগ্য বা যাকে কখনও কখনও বলা হয় অন্য জগতের বা লোকাতীতের ধ্যান তাই যে একমাত্র হিন্দু শ্রেয়ো-নীতি এমন বলা যায় না। ধ্যান কিংবা অধ্যাত্মচিন্তার মতো জাগতিক বা সাংসারিক কর্মতৎপরতাও হিন্দু জীবনের অঙ্গ। এমনকি ঈশ্বর প্রাপ্তির পথ জ্ঞানের, কর্মের অথবা ভক্তির তিন রকমই হতে পারে। জীবনের সম্পূর্ণতার জন্য প্রার্থনার প্রয়োজন যারা এমন মনে করে না, তারা অনায়াসেই শুভকর্মের পথ বেছে নিতে পারে। অন্যরা ঈশ্বর সাধনায় প্রার্থনাকে গুরুত্ব দিতে পারে। তাদের কাছে ভক্তিমার্গই শ্রেষ্ঠ। হিন্দুদের এই শ্রেয়-নীতি ঠিকমতো উপলব্ধি করতে গেলে 'ঈশ্বরপ্রাপ্তির বহু পথ'—এই মূল ধারণাটিকে বুঝে নেয়া নিতান্তই জরুরি।

অবশ্য হিন্দুদের সব মহৎ আদর্শই রূপায়িত হয়েছে এমন দাবি করা যায় না। শাস্ত্রে প্রচার করা আদর্শ আর বাস্তবে তার ব্যবহার এ দুইয়ের মধ্যে ফারাকটা অন্য ধর্মের ক্ষেত্রেও অজানা নয়। হিন্দুরাও অনেক সময় এমন জীবন যাপন করে আদর্শ আচরণ-বিধির যা সম্পূর্ণ বিরোধী। অবশ্য সৌভাগ্যের কথা, (অন্য ধর্মের মতো) হিন্দুধর্ম তার গোটা ইতিহাস জুড়ে জন্ম দিয়েছে সংস্কার আন্দোলনের। তার ফলে ঠেকানো গেছে অবনতির এই প্রবণতাকে। এ গ্রন্থের দ্বিতীয় ভাগে এই আন্দোলনের কয়েকটি পর্যালোচনা করা যাবে। কিন্তু এখানে উল্লেখ করি যে, তিন-চার হাজার বছর ধরে এই আন্দোলনের প্রাণশক্তিই সামাজিক আদর্শগুলোকে উজ্জীবিত করে রেখেছে। আর এই দৃষ্টিকোণ থেকেই আমাদের দেখার বিষয় ইতিহাসের নানা সময় আদর্শের সমকালীন অবনমনের বিরুদ্ধে হিন্দু ধর্মজগতের মহান মনীষীদের প্রতিবাদ ভাবনা (বুদ্ধওতো এর বাইরে নন) আর এই প্রসঙ্গেই মহাত্মা গাঁন্ধী, বিবেকানন্দ, টিলক—এঁদের মতো আধুনিক ধর্মীয় নেতাদের সতর্কবাণী। এবং এই প্রসঙ্গেই আসবেন রবীন্দ্রনাথও যাঁর প্রতিবাদী কণ্ঠে শুনি—

ভজন পূজন সাধন আরাধনা
সমস্ত থাক পড়ে।
রুদ্ধদ্বারে দেবালয়ের কোণে
কেন আছিস ওরে।

অন্ধকারে লুকিয়ে আপন মনে
কাহারে তুই পূজিস সংগোপনে,
নয়ন মেলে দেখ দেখি তুই চেয়ে—
দেবতা নাই ঘরে।
তিনি গেছেন যেথায় মাটি ভেঙে
করছে চাষা চাষ—
পাথর ভেঙে কাটছে যেথায় পথ,
খাটছে বারোমাস।

—গীতাঞ্জলি

বর্ণভেদ বা জাতিভেদ প্রথা

হিন্দুধর্মের অন্য দিকগুলোর চেয়ে বর্ণভেদ প্রথাই অনেকখানি উত্তেজনার সৃষ্টি করেছে পক্ষে, বিপক্ষে। বৈষম্যকে তুলে ধরার জন্য এক দিকে একদলের রোষ। তারা কিন্তু ইতিহাসের দৃষ্টিতে একে দেখতে অপারগ, আর ভারতীয় সমাজের ইতিহাসে এই স্তরবিন্যাসের ভূমিকাটিকেও দেখতে অনিচ্ছুক। অন্য দিকে গোঁড়া হিন্দুর দল বুঝতে নারাজ যে, এই ব্যবস্থার শুধু সামাজিক তাৎপর্যই আছে, কোনও গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় তাৎপর্য এর নেই। সময় হলে, আয়ুষ্কাল শেষ হলে একে চলে যেতেই হবে। তারা ভুলে যায় পুরনো কিছু ধর্মগ্রন্থে বর্ণ-বিভাগকে স্বীকার করাই হয়নি। আর বেশ কিছু ধর্মগ্রন্থ আছে যাদের মতে এর কোনও মৌলিক গুরুত্ব নেই। সত্যি কথা বলতে কী, এই বর্ণ-বিভাগ আজকে যেভাবে রয়েছে তা একেবারেই হিন্দুধর্মের মূল তত্ত্বের বিরোধী, যে তত্ত্ব বলে ব্রহ্ম সর্বব্যাপী, আত্মা আর ব্রহ্ম অভিন্ন।

ভারতীয় সমাজে বহু প্রজাতির বিমিশ্রতা থেকেই মনে হয় বর্ণ-বিভাগের উদ্ভব। দেশের সীমানার মধ্যেই বিশ্বের প্রায় সব জনগোষ্ঠীর আকৃতির দেখা মেলে, আর বেশির ভাগ মানুষই বস্তুত মিশ্রজাতের।

বৈদিক সংস্কৃতভাষী আর্যদের আগমনের আগেই ভারতে বিচিত্র জনগোষ্ঠীর মিলন ঘটেছিল। এদের মধ্যে দ্রাবিড় গোষ্ঠীর গুরুত্বই মনে হয় সবচেয়ে বেশি। ভারতের অধিকাংশই জয় করে নিয়েছিল যে আর্যরা, স্থানীয় কৃষ্ণবর্ণ অধিবাসীদের প্রতি তাদের বিশেষ শ্রদ্ধা ছিল না অন্তত প্রথম দিকে।

সংস্কৃতিতে তারা নিজেদের বড় মনে করত বলে ততটা নয়, কেননা সিন্ধু উপত্যকার সভ্যতা তার লিপি, শিল্পকলা, ভাস্কর্য, নগর-পরিকল্পনার জ্ঞান, বিচিত্র কারুশিল্প এই সব নিয়ে আরও উন্নত (প্রাণশক্তিতে একটু খাটো হয়তো

বা) সংস্কৃতির ধারক ছিল নিরক্ষর, শিকারে পটু যাযাবর আর্যদের চেয়ে। বিজেতা হিসেবে আর্যরা অবশ্য নিজেদের বেশি শক্তিশালী মনে করেছিল, আর তাদের বহুবিস্তৃত দেবলোক নিয়ে বৈদিক ধর্মে দৃঢ়বিশ্বাসী মানুষগুলো বোধহয় নিজেদের সঠিক চিন্তার অধিকারী বলে মনে করত। সত্য যাই হোক, ফল হিসেবে দেখা দিল এক বহুজাতিক সমাজ, তাতে নানা গোষ্ঠী, নানা ধর্মবিশ্বাস, নানা জীবনবোধ, নানা ধরনের জীবিকা (বেশির ভাগ নতুন উচ্চশ্রেণীর উদ্‌ভব হল বিজয়ীদের হাতে)। এই সব নিয়ে তৈরি হল এক কট্টর বর্ণবেদ-ভিত্তিক সমাজ কাঠামো। খুব সম্ভব আর্যরা আসার সময়েই এক ধরনের বর্ণভেদ প্রচলিত ছিল, আর তার পুরো সুযোগ নিয়েছিল আর্যরা।[১]

তত্ত্বগতভাবে বর্ণ মাত্র চার রকমের— ব্রাহ্মণ— পুরোহিত, ধর্মজগতের গুরু, ক্ষত্রিয়—রাজা, যোদ্ধা, আর অভিজাতবর্গ, বৈশ্য—ব্যবসায়ী, বণিক, অন্যান্য কাজে যুক্ত মানুষ এবং শূদ্র— চাষি, দাস ইত্যাদি। এই ভেদ-প্রথার যে একটা জাতিগত উৎস আছে এই তত্ত্বকে সমর্থন করে জাতি আর বর্ণের (রঙের) অনুষঙ্গের যোগ। অদ্ভুত (হয়তো বা তাৎপর্যময়ও) এক শ্লোক আছে মহাভারতে (খ্রিস্টপূর্ব প্রথম সহস্রাব্দের মাঝামাঝি সময় রচিত ভারতীয় মহাকাব্য) যেখানে ভৃগু ভরদ্বাজকে জাতির বৈশিষ্ট্য বোঝাতে গিয়ে বলেছেন 'ব্রাহ্মণরা গৌরবর্ণ, ক্ষত্রিয়রা রক্তবর্ণ, বৈশ্যরা পীতবর্ণ আর শূদ্ররা কৃষ্ণবর্ণ।

(মহাভারত, শান্তিপর্ব, ১৮৮, ৫)। যাই হোক, ঐ প্রাচীন কালেও জাতিগুলো মনে হয় কোনোভাবেই বিশুদ্ধ বা অমিশ্র ছিল না। ভরদ্বাজ বললেন, "যদি বিভিন্ন বর্ণ বিভিন্ন জাতি নির্দেশ করে তবে বলতে হয় সব জাতিই মিশ্র জাতি।" (১৮৮, ৬)। মজার কথা, ভরদ্বাজ এই বিভাগ নিয়ে বেশ অস্বস্তিবোধ করেছিলেন। তিনি প্রশ্ন করলেন, "আমরা সকলেই কাম, ক্রোধ, ভয়, দুঃখ, উৎকণ্ঠা, ক্ষুধা আর শ্রম এই সবেই প্রভাবিত হই, তা হলে জাতিতে জাতিতে আমাদের তফাত কোথায়?" (১৮৮, ৭)। চার বর্ণে

১. অস্পৃশ্যতার ধারণাটা কখন জন্ম নিল সেটা খুব স্পষ্ট নয়। শাস্ত্রে এর সমর্থন খুবই সামান্য। তাই মনে হয় এর উদ্ভব খুব সাম্প্রতিক নয়। মোটামুটি অনুমান করা হয় প্রাক্ আর্য যুগেই এক ধরনের অস্পৃশ্যতা এখানে ছিল। এটা বেশ লক্ষ্য করবার যে দক্ষিণ ভারতে এই অস্পৃশ্যতা ব্যাপারটা বেশ প্রবল। শুধু উচ্চবর্ণ নিম্নবর্ণের মধ্যে নয়, কখনও কখনও বিভিন্ন নিম্নবর্ণের মধ্যেও এর তাৎপর্য রয়েছে।

সমাজের এই বিভাগ খুব সম্ভব সব সময় তত্ত্বগতভাবেই ছিল। কেননা প্রাচীনতম কাল থেকেই আমরা অনেক বেশি জটিল শ্রেণিবিভাগ দেখতে পাই। আর নৃতাত্ত্বিক দিক থেকেও ভারতের মতো প্রাচীন, বহুজাতিক সমাজে এটাই প্রত্যাশা করা যায়। জাতিগত উপাদান ছাড়া অর্থনৈতিক উপাদানও আছে যেহেতু এর মধ্যে শ্রম-বিভাগের, সামাজিক শ্রেণিবিন্যাসের কথা রয়েছে। গায়ের রং বা বর্ণ দিয়ে জাতি বিভাগ বস্তুত প্রাচীনতম সাহিত্যেও বিরল এবং ভরদ্বাজ যেমন বলেছেন, প্রত্যেক জাতির মধ্যে মিশ্রবর্ণের প্রতিনিধি রয়েছে। যাই হোক, জীবিকা বা পেশা-ভিত্তিক বিভাগের সঙ্গে জাতির সংযোগ সমাজের ক্রিয়াকলাপে জাতির ভূমিকার আরও ভাল ধারণা দেয় আমাদের। বংশানুক্রমিক জাতি কাঠামো কারুশিল্পের নৈপুণ্যের সহায়ক হয়েছে। ভারতীয় কারিগরের বেশ কয়টি শাখা এর পরিচয় দেয়। কারণ নৈপুণ্য পিতা থেকে পুত্রে বর্তায়, এমনকি তার উৎকর্ষও বাড়ে। তার ফলে ব্যবস্থার স্থায়িত্ব, সেই সঙ্গে নিরাপত্তাও সুনিশ্চিত হওয়ায় কর্মদক্ষতার একটা শক্ত ভিত তৈরি হয়ে যায়। কঠোর নীতি অনুযায়ী অসবর্ণ বিবাহ ছিল নিন্দনীয়, যদিও অনুলোম বিবাহ (যেখানে পাত্র পাত্রীর চেয়ে উচ্চবর্ণের) মনে হয় অনুমোদন পেত। অনুলোম বিবাহের সন্তানেরা তাদের বাবার গোত্র ভুক্ত হত। যদিও এমনও দেখা যায় তারা কখনও পেত মায়ের গোত্র। অবশ্য এ বিষয়ে সন্দেহ নেই গোঁড়া ধর্মীয় নেতাদের পছন্দ যাই হোক, অসবর্ণ বিবাহের চল ছিল অনেক বেশি। এমনকি ধর্মীয় সাহিত্যেও প্রতিলোম বিবাহের কিছু উল্লেখ দেখি (পাত্রীই যেখানে উচ্চবর্ণের)। দৃষ্টান্ত মহাভারত। আদিপর্বে রাজা যযাতি আর রানী ব্রাহ্মণকন্যা দেবযানীর কাহিনি আছে। দেবযানী যযাতিকে বিয়ে করতে চাইলে তিনি আপত্তি জানিয়ে যুক্তি পেশ করেছিলেন, "আমি ক্ষত্রিয় আর তুমি ব্রাহ্মণ। তোমাকে বিয়ে করার যোগ্য আমি নই।" (৮১, ১৮)। দেবযানী মানতে পারলেন না এ কথা। তিনিও যুক্তি দেখিয়ে প্রমাণ করতে চাইলেন, এ প্রস্তাব রীতিমতো সংগত। যযাতি যুক্তিজাল বিস্তার করেও তাঁর মত প্রতিষ্ঠা করতে ব্যর্থ হলেন এবং শেষ পর্যন্ত বিয়ের প্রস্তাব মেনে নিতেই বাধ্য হলেন। এমনকি দেবযানীর বাবা ব্রাহ্মণগুরু শুক্রাচার্য সম্মতি দিয়েছিলেন (৮১, ৩১)। হিন্দুসাহিত্যে প্রতিলোম বিবাহের আরও দৃষ্টান্ত আছে।

এটা বিশেষভাবে লক্ষ্য করবার যে, হিন্দু সাহিত্যের সবচেয়ে পরিচিত এবং সবচেয়ে শ্রদ্ধেয় চরিত্রগুলোই ছিলেন বর্ণসংকর। মহাভারতের প্রখ্যাত প্রাজ্ঞ পুরুষ বিদুর শূদ্রাণীর পুত্র। আর ঐ বিদুরকেই বলা হয়েছে মূর্তিমান ধর্ম (আদি পর্ব, ৬৩, ৯৫) ; বলা হয়, ধর্মই বিদুর হয়েছেন (আশ্রমপর্ব, ২৮, ২১)। রাজা ধৃতরাষ্ট্র ধর্মোপদেশের জন্য বিদুরের শরণ নিতেন (উদ্যোগপর্ব, ৩৩-৪১)। মহির্ষি বশিষ্ঠ এক গণিকার গর্ভজাত। ব্যাস এক ধীবরকন্যা আর পরাশর চণ্ডালিনীর সন্তান।

বংশানুক্রমিক জাতিবিন্যাস বহু হিন্দুশাস্ত্রেই স্বীকৃত নয়। সেটাই বুঝিয়ে দেয় যে আচরণ দিয়েই বর্ণের নির্ণয় হওয়া উচিত, জন্ম দিয়ে নয়।[২] এর দৃষ্টান্ত—যুধিষ্ঠির ব্রাহ্মণত্বের বিচার করতেন তাদের আচরণ দিয়েই (সত্যাশ্রয়ী, ক্ষমাশীল, দয়ালু ইত্যাদি ইত্যাদি) এবং জানিয়েছিলেন, ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্ম হলেই তাকে ব্রাহ্মণ বলা যাবে না, তেমনি পিতা-মাতা শূদ্র হলেই একজনকে শূদ্র বলা সংগত নয়। (মহাভারত, বনপর্ব, ১৮০)। সংস্কৃত সাহিত্যের আরও নানা গ্রন্থে এই মত ব্যক্ত হয়েছে। তাই যখন কোনও গোঁড়া

২. অন্তত তত্ত্বগতভাবে যে বর্ণকে দেখা হত চরিত্র বা স্বভাবের সূচক হিসেবে, শুধু জন্মেরই নয়, সেটা স্পষ্টভাবে দেখা যায় ছান্দোগ্য উপনিষদের এক মনোহারী গল্পে (৪, ৪)—জবালার পুত্র সত্যকাম শুধিয়েছিল মাকে—"মা, আমি ব্রহ্মচারী হতে চাই, আমার কী গোত্র?" তিনি বলেছিলেন, 'বৎস, আমিতো জানি না তুই কোন বংশের। আমার যৌবনকালে যখন আমাকে সেবিকা হয়ে আমার পিতৃগৃহে অতিথিসেবায় নিযুক্ত থেকে ঘুরে বেড়াতে হত তখন তোকে গর্ভে ধরেছি। আমিতো জানি না কী তোর গোত্র। আমার নাম জবালা। আর তোর নাম সত্যকাম। তুই বলিস, তুই সত্যকাম জবালা।" সত্যকাম গৌতম হারিদ্রুমাতার কাছে গিয়ে তাঁকে বলল, "আপনার কাছে আমি ব্রহ্মচারী হয়ে থাকতে চাই, আপনার অনুমতি কি পাব?" তিনি বললেন, "বৎস, তোমার গোত্র কী?" উত্তরে সে বলল, "মহাশয়, আমার কোন গোত্র তা তো আমি জানি না।" আমি মাকে শুধিয়েছিলাম। উত্তরে তিনি বলেছেন, "যৌবনে সেবিকা হয়ে আমাকে অনেক ঘুরতে হয়েছে। তখন আমি তোকে গর্ভে ধারণ করেছি। কী তোর গোত্র আমিতো জানি না। আমার নাম জবালা। তোর নাম সত্যকাম।" মহাশয়, আমার নাম তাই সত্যকাম জবালা।" শুনে তিনি বললেন, "যথার্থ ব্রাহ্মণ ছাড়া এমন অকপটে বলা সম্ভব নয়। যাও আগুনের জোগাড় করো। তোমাকে দীক্ষা দেব আমি।"

প্রাচীন ভারতে ব্রাহ্মণরা জাতি হিসেবে যে তাদের আদর্শ অনুযায়ী বাঁচার জন্য সচেষ্ট ছিল নানান বিদেশি পর্যটকের বিবরণে তার প্রমাণ মেলে। এমনকি ত্রয়োদশ শতকের ইতালীয় পর্যটক মার্কো পোলো মন্তব্য করেছেন—

"নিশ্চিত বলতে পারি এই ব্রাহ্মণরা বিশ্বের শ্রেষ্ঠ বণিকের মধ্যেই পড়ে, এরা সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য। এরা কখনও কোনও কিছুর জন্যই মিথ্যে বলে না, আর সত্যি নয় এমন কথা উচ্চারণ করে না। তারা মাংস বা মদ খায় না। তাদের রীতি অনুসারে পবিত্র জীবন যাপন করে। নিজের স্ত্রী ছাড়া অন্য নারীর শরীর সংসর্গে আসে না। পরের জিনিস তারা নেয় না। কোনও প্রাণীকে হত্যা করে না, কিংবা পাপ মনে হয় এমন কোনও কাজ করে না।"

(*The Travels of Marco Polo,* translated by R.E. Latham, Penguin Books, 1958. pp. 250-51)

মার্কো পোলোর বর্ণনামতো ত্রয়োদশ শতকের সব ব্রাহ্মণই ও রকম ধর্মপ্রাণ ছিল কি না সন্দেহ হয়। যাই হোক এই আচরণবিধি বুঝিয়ে দেয়, কোন ব্যবহার ব্রাহ্মণের কাছে প্রত্যাশিত এবং অন্তত বেশ বড় একটা অংশ এ ব্যাপারে সফল।

হিন্দু বলেন, বর্ণ-বিভাগ বা জাতিভেদ হিন্দুধর্মের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ তখন তিনি ভারতের ধর্মীয় সাহিত্যের একটা গুরুত্বপূর্ণ অংশকেই উপেক্ষা করে বসেন।

জাতিভেদ বিরোধী আন্দোলন হিন্দু ইতিহাসের নানান পর্বেই দেখা গেছে। জ্ঞানমার্গের লোকেরা মোটের উপর বর্ণবিভাগের সমর্থক। কারণ এই পন্থাটি তার প্রকৃতিগত কারণে উচ্চশ্রেণির মধ্যেই সীমাবদ্ধ। ভক্তিমার্গীরা অবশ্য মোটের উপর এ ব্যাপারে অনেকটা উদার। দক্ষিণ ভারতের আলোয়ার কবিরা (আনুমানিক ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শতাব্দী) খুব নিম্নবর্গ থেকে এসেছিল। তাদের রচনাকে দ্বাদশ শতকের রামানুজ বর্ণনা করেছেন বৈষ্ণবদের বেদ বলে। সারাদেশের ভক্তিমার্গের অধিকাংশ নেতাই বর্ণবেদ বা জাতিভেদের বিরুদ্ধে। বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত কথায় আসা যাবে পরবর্তী পরিচ্ছেদগুলোতে আন্দোলনগুলোর আলোচনা প্রসঙ্গে। এই বর্ণভেদ যে ইতিহাসের এক বিশেষ পর্বে বিশেষ এক সামাজিক সমঝোতা বা আপস ছাড়া আর কিছু নয় এই কথাটা বলা হয়েছে বহু প্রাচীন ভবিষ্যপুরাণে—

'যেহেতু চতুর্বর্ণের সব মানুষই ঈশ্বরের সন্তান তাই তারা এক বর্ণের। সমস্ত মানুষের জনক এক, আর একই জনকের সন্তানদের ভিন্ন জাত হতে পারে না।'

(ভবিষ্যপুরাণ, ব্রাহ্মপর্ব ৪১, ৪৫)

লোকাচার ও উৎসব-অনুষ্ঠান

হিন্দুধর্মের সৃষ্টি বহু সংস্কৃতির সমাহারে। এটা সব থেকে বেশি ধরা পড়ে হিন্দু সামাজিক লোকাচার আর উৎসব-অনুষ্ঠানের ধরনে। বৈদিক আর্যদের যাগযজ্ঞ থেকে শুরু করে সর্বপ্রাণবাদী আদিম উপজাতির আচার-অনুষ্ঠান পর্যন্ত সবই দেখা যাবে হিন্দুর ক্রিয়াকর্মে। গত দুই-তিন হাজার বছরে অধিকাংশ লোকাচারের তাৎপর্য যথেষ্টই বদলে গেছে। তাদের অনেকগুলোই এখন নিছক প্রতীকী। সে যাই হোক, এই লোকাচারগুলোকে অনুসন্ধানী মন নিয়ে বুঝতে হবে, কেননা এগুলো হিন্দুজীবনের গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। এই বিরাট দেশের সব হিন্দুধর্মীয় অনুষ্ঠানের পুরো তালিকা দেয়া সম্ভব নয়, কেননা অঞ্চলে অঞ্চলে আর গোষ্ঠীতে গোষ্ঠীতে তার তফাত ঘটে। এই আচার-অনুষ্ঠানগুলোকে অবশ্য কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায় তাদের পুনরাবৃত্তির হার আর উদ্দেশ্য অনুযায়ী। প্রাতঃকৃত্য আর সন্ধ্যার মতো কিছু আছে যা দৈনন্দিন। এই ধ্যান, প্রার্থনা আর আচার-অনুষ্ঠানগুলো উচ্চবর্ণের হিন্দুদের প্রাত্যহিক ধর্মীয় করণীয়ের মধ্যে পড়ে। এগুলো প্রায় সবই সম্পন্ন হয় নিজেদের ঘরে। কোনও কোনও হিন্দু বাড়ির ঠাকুরঘরে দেবদেবীর মূর্তি কিংবা কোনও প্রতীক পূজার জন্য রাখে। অধিকাংশ হিন্দু মন্দিরে নির্দিষ্ট উপলক্ষে বিশেষ উৎসব অনুষ্ঠান ছাড়া প্রতিদিনই পূজাআর্চা থাকে। এ পূজা অর্চনা আর নানারকম আচার অনুষ্ঠানও স্থান পায়। কোনও হিন্দু মন্দিরে যায় প্রতিদিন, কেউ মাঝে মাঝে আবার কেউ যায়ই না। যেহেতু হিন্দুধর্মে ঈশ্বর প্রাপ্তির নানান পথের কথা আছে তাই প্রত্যেকের জন্যে কোনও বিশেষ ধর্মাচরণ আবশ্যিক নয়।

কোনও হিন্দুর সাপ্তাহিক কিছু ধর্মীয় পালন থাকে, যেমন সপ্তাহের কোনও একদিন উপবাস। কোনও পূজার্চনা, প্রায়শ্চিত্ত ইত্যাদি হয় তিথি অনুযায়ী।

পূর্ণিমা, অমাবস্যায় অন্য উদ্‌যাপনগুলোকে বলা যাক পালনকর্তার ইচ্ছা অনুসারে উপলক্ষ ভিত্তিক। এর একটি ভাল দৃষ্টান্ত হল ব্রত। এগুলোর কোনও শাস্ত্রীয় বিধান নেই। সাধারণত মেয়েরা এগুলো পালন করে পরিবার বা সমাজের মঙ্গল কামনায়।[১]

সাবিত্রীব্রত স্বামীর কল্যাণ কামনায়, ষষ্ঠীব্রত সন্তানের মঙ্গলের জন্য, মাঘমণ্ডল ব্রত শীতের দিনে উজ্জ্বল রোদের প্রার্থনায়, পৌষব্রত শস্যের ভাল ফলনের জন্য ইত্যাদি ইত্যাদি।

বার্ষিক উৎসবগুলো ধর্মীয় ক্রিয়াকলাপের বেশ বড় উপলক্ষ। এর মধ্যে কিছু হিন্দু দেবদেবীর পূজা উপলক্ষে, যেমন লক্ষ্মীপূজা (ঐশ্বর্য আর সৌন্দর্যের দেবী), সরস্বতী পূজা (বিদ্যার দেবী), কার্তিক (বীরত্বের দেবতা), গণেশ (জ্ঞান আর সিদ্ধির দেবতা) পূজা, আর দেবীপূজা (বিশ্বমাতার নানা রূপ কালী, দুর্গা), মনসা (সাপের দেবী) এই রকম। কিছু উৎসব পৌরাণিক ঘটনাকে ঘিরে— যেমন ঈশ্বরের অবতার কৃষ্ণের জন্ম। কিংবা অবতার রামচন্দ্রের রক্ষরাজ রাবণ বিজয়। অনেকগুলো আত্মীস্বজনের মঙ্গলকামনায় তাদের কপালে চন্দনের ফোঁটা দেয় যমের দুয়ারে কাঁটা দেয়ার কল্পনায়। আবার অন্য কতকগুলো উৎসব অনুষ্ঠান আছে যেগুলোর সমাজের আর্থিক জীবনের

১. এটি হিন্দু মূল্যবোধে নারীর স্থানের বিচ্যুতির একটা ছবি উপস্থিত করে আমাদের সামনে। ব্যাপারটা বেশ একটু জটিল। এক দিকে ঋক্‌বেদ স্ত্রীকে সর্বোচ্চ ক্ষমতার আসনে বসায় (মণ্ডল ১০, সূক্ত ৮৫, স্তোত্র ২৬, ৪৬) এবং মহাভারতে তারা পূজার অধিকারী বলে বিবেচিত (উদ্যোগ পর্ব, ৩৮, ১১), অন্য দিকে হিন্দু আইনপ্রণেতাদের নারীর অধিকার ব্যাপারে রীতিমতো কুণ্ঠা। সম্পত্তির অধিকারের প্রশ্নে আইন মোটের উপর নারীদের অনুকূল নয়। আবার এমনও বলা হয়, যে সমাজে নারীরা অসুখী সে সমাজের কোনও ক্ষেত্রেই উন্নতি হয় না। (মহাভারত, অনুশাসন পর্ব, ৪৬)। পুরুষের বহুবিবাহে অনুমোদন আছে (স্বাধীনতা-উত্তর ভারতে এখন পরিবর্তন ঘটেছে)। নারীর বহুস্বামী গ্রহণ কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। কিন্তু রানি দ্রৌপদী পঞ্চপাণ্ডবকে বিবাহ করেছিলেন সব পণ্ডিতদের সম্মতি নিয়ে (মহা : আদিপর্ব)। মেয়েরা গৃহস্থালীর মধ্যেই আবদ্ধ থাকবে এটাই প্রত্যাশিত কিন্তু অর্জুনের স্ত্রী চিত্রাঙ্গদাকে বর্ণনা করা হয়েছে বীরনারী রূপে। এবং এ রকম আরও দৃষ্টান্ত আছে (দ্রষ্টব্য মহাভারত, সভাপর্ব, ১৪, ৫১) পরবর্তী আইনপ্রণেতারা বলেন, শুধুমাত্র পুরুষদেরই উচ্চশিক্ষার অধিকার আছে, কিন্তু উপনিষদে এমন বর্ণনা আছে যেখানে নারীরা অতি জটিল বিষয়ে আলোচনায় অগ্রণী ভূমিকা নিচ্ছে। বস্তুত গার্গী যখন বিজ্ঞ যাজ্ঞবল্ক্যের সামনে দুটি সমস্যা তুলে ধরে সমবেত ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের দিকে তাকিয়ে বললেন, "যদি উনি আমার প্রশ্নের উত্তর দেন তা হলে ব্রহ্মবিষয়ে বিতর্কে আপনারা কেউই ওঁকে পরাভূত করতে পারবেন না।" (বৃহদারণ্যক উপনিষদ্ ৩য়, ৮)। শিক্ষায় পুরুষের একচেটিয়া অধিকারের কোনও স্বীকৃতিই স্পষ্টত তাঁর বক্তব্যের মধ্যে ছিল না। মধ্যযুগে নারীদের অবস্থানের মান আরও নীচে নামে। তারা পুরোপুরি গৃহস্থালীর কাজকর্মেই ফিরে যায় আর তাদের সামাজিক মর্যাদাও চোখে পড়ার মতো নেমে যায়। এটা কতখানি মুসলমান শাসন আর মধ্যপ্রাচ্য দস্তুরের প্রভাবজাত আর কতখানি ভিতরকার বিতর্কের পরিণতি তা বলা শক্ত।

সঙ্গে সম্পর্ক। নবান্ন হল ফসলের উৎসব। কারুশিল্পীরা বিশ্বের মহান স্রষ্টা বিশ্বকর্মা পূজার আয়োজন করে পূজার বেদিতে যন্ত্রপাতি রেখে। পরিশেষে ঋতুর সঙ্গে জড়িত বার্ষিক কিছু উৎসবের উল্লেখ করি। এর মধ্যে সবচেয়ে বর্ণময় উৎসব হল হোলি বা বসন্ত-উৎসব, আবির আর রং নিয়ে পরস্পরকে রাঙিয়ে দেয়ার উৎসব। কিছু ধর্মীয় অনুষ্ঠান আছে যার সঙ্গে জীবনের নানা পর্যায়ের সম্বন্ধ। শিশুদের নাম দেয়ার জন্য নামকরণ উৎসব, অন্নপ্রাশন মায়ের দুধ ছাড়িয়ে মুখে ভাত দেয়ার উৎসব, উপনয়ন সমাজের উচ্চবর্ণের ব্রাহ্মণসন্তানদের অধিকার আর করণীয় সম্বন্ধে সচেতন করার জন্য উপবীত দেয়ার উৎসব। উপবীত নতুন জন্মের প্রতীক, তাই উপবীতধারীকে বলা হয় দ্বিজ, অর্থাৎ এ হল তার দ্বিতীয় জন্ম। এর পর বিবাহ,আর শেষে শ্রাদ্ধ—অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া। শ্রাদ্ধ শব্দের অর্থ শ্রদ্ধা নিবেদন। দেখা গেল, জীবনের প্রত্যেক পর্যায়েই রয়েছে বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠান।

গ্রহনক্ষত্রের অবস্থান বিশেষের মধ্যে কখনও ধর্মীয় তাৎপর্য দেখা হয়। প্রায়ই সে রকম দিনে লোকে জড়ো হয় মন্দির বা ধর্মস্থানে কিংবা পুণ্যস্নানের জন্য নদীতে। তীর্থস্থানে এই জাতের লোকসমাগম অনেক সময় গো-প্রদর্শনী, কিংবা কৃষিদ্রব্যের বিপণন (চাষবাসের সরঞ্জাম কেনাবেচার মতো)— এই সব অর্থকরী বা ব্যবসায়িক কাজকর্মের উপলক্ষও জুগিয়ে দেয়। এই জাতীয় সমাগমের সবচেয়ে ভাল দৃষ্টান্ত কুম্ভমেলা। এই কুম্ভ বসে বারো বছর অন্তর। ভারতের নানা অঞ্চল থেকে মানুষ এসে জমায়েত হয় চারটি জায়গায়, যার মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত হল এলাহাবাদ আর হরিদ্বার।

উপরের তালিকাটি ভারতের উৎসব অনুষ্ঠানগুলোর সম্বন্ধে খানিকটা ধারণা হয়তো তৈরি করে দেবে। অবশ্য তার থেকে সেগুলোর বিপুল সংখ্যার কোনও ধারণা করা অসম্ভব। একজন হিন্দুকে যদি এর সবগুলো পালন করতে হত তাহলে জীবনে আর কিছুই করার সময় থাকত না। ভাগ্যের কথা, সব হিন্দুই এর মাত্র কয়েকটির মধ্যেই নিজেকে আবদ্ধ রাখে। আর বাউলদের মতো কিছু হিন্দু কোনও কিছুই পালন করে না। সাংস্কৃতিক পরিবেশ অনুসারেও লোকাচার বদলায়— সামাজিক অবস্থান, বর্ণ, লিঙ্গ, বয়স,আর সম্প্রদায় এ সবের সূত্র ধরে। এই বিভিন্নতা আর স্বাধীনতার কারণগুলো পরের পরিচ্ছেদে আলোচনা করা যাবে।

এই প্রথা আর লোকাচারের প্রসঙ্গটি শেষ করার আগে সম্ভাব্য ভুল-বোঝা এড়াতে দুটি দিক গুরুত্ব দিয়ে বিচার করা দরকার। প্রথম, আমাদের মনে রাখতে হবে হিন্দু-দর্শনে সর্বব্যাপী, সর্বস্পর্শী, সর্বত্রবিরাজমান ঈশ্বরে বিশ্বাস আর হিন্দু দেবলোকের বিচিত্র দেবদেবীর পূজা— এ দুইয়ের মধ্যে কোনও বিরোধ নেই। ধর্মীয় উৎসবের দেবতার প্রতিমা ভক্তিকে একাগ্র হতে সাহায্য করতেও পারে ; কিন্তু তত্ত্বগতভাবে তাঁরা এক এবং অদ্বিতীয় সর্বব্যাপী ঈশ্বরের অসংখ্য দিকের কাল্পনিক ছবির বেশি কিছু নয়। এই প্রসঙ্গে সপ্তদশ শতকের ফরাসি পর্যটক ফ্রাঙ্কাইস্ বার্নিয়ার-এর সঙ্গে বারাণসীর কয়েকজন হিন্দু পণ্ডিতের তিনশো বছরের পুরনো সংলাপ হয়তো উদ্ধারযোগ্য, যেহেতু তা এই সব লোকাচারের সারাৎসারের দিকেই আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করবে।

বার্নিয়ার জনপ্রিয় হিন্দুধর্মের আচারসর্বস্বতা আর প্রতিমা পূজা দেখে মর্মাহত হয়েছিলেন। তিনি পণ্ডিতদের শুধিয়েছিলেন, তাঁরা এ সব সহ্য করেন কী করে। উত্তরে পণ্ডিতরা বলেছিলেন :

"সত্যি, আমাদের মন্দিরে মন্দিরে নানা রকমের প্রতিমা আছে। এইসব প্রতিমার প্রতি আমরা প্রভূত ভক্তি নিবেদন করি আভূমি প্রণত হয়ে, সাড়ম্বরে ফুল, তণ্ডুল, সুগন্ধি তেল, চন্দন ঐ রকম আরও নানান সামগ্রী দিয়ে। তুব এই প্রতিমাগুলোই ব্রহ্মা বা বিষ্ণু এমন বিশ্বাস আমাদের নেই। এগুলো শুধুই তাঁর প্রতিরূপ মাত্র, তাঁর প্রতীক মাত্র। আমরা শ্রদ্ধা নিবেদন করি শুধু এই কারণে যে, তাঁরা আমাদের উপাস্যের প্রতিনিধিত্ব করেন। আমরা প্রার্থনা জানাই প্রতিমাকে নয়, দেবতাকে। আমাদের মন্দিরে প্রতিমা রাখা হয়ে থাকে কারণ মনে হয় চোখের সামনে কিছু থাকলে ভক্তির একাগ্রতা বাড়ে পূজা নিবেদনে ; কিন্তু আসলে আমরা স্বীকার করি যে ঈশ্বর এক এবং অদ্বিতীয়, তিনিই সর্বশক্তিমান বিধাতা।"[২]

এই ব্যাখ্যা বার্নিয়ারের খুব বিশ্বাসযোগ্য মনে হয়নি। এই ভাবনাটি কিন্তু হিন্দু-দর্শনের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ।

২ Milford Humphrey, *Travels in Mogul Empire*—A.D. 1656-68. Oxford University Press. 1914, p. 342.

দ্বিতীয়ত আমাদের জোর দিয়েই বলতে হবে যে, এই সব আচার-অনুষ্ঠানের তাৎপর্য বোঝার জন্য একটু কল্পনাশক্তির সাহায্য দরকার। কেননা হিন্দু দর্শনের প্রেক্ষাপট ছাড়া এই আচারগুলো খুব বেশি তাৎপর্যময় নয়। এ থেকে হয়তো ধরতে পারা যায় কেন বিদেশ থেকে আসা বহু মানুষ ভারতে বহু বছর কাটিয়েও এই সব আচার-অনুষ্ঠানের মানে ঠিক বুঝতে পারে না। একটা দৃষ্টান্ত দেয়া যাক–– কেউ যদি মনে করে বসে সরস্বতী পূজায় যোগ দিতে আসা কোনও হিন্দু সত্যিই বিশ্বাস করে যে, স্বর্গে এক সুন্দরী তরুণী দেবী সাদা হাঁসের উপরে বসে বীণা বাজাচ্ছেন, তবে সেটা হবে নিছক ছেলেমানুষি। কোনও বিমূর্ত ভাবনা বা ধারণাকে প্রতীকী মূর্তিতে ধরা ভারতীয় সংস্কৃতি জগতেতো বহুল প্রচলিত। এ ব্যাপারটি বুঝতে হলে আরও একটু কল্পনাশক্তির দরকার। সংস্কৃত কবি কালিদাসের (চতুর্থ শতক) মেঘদূতকাব্যের রস আস্বাদন করতে যেমন দরকার হয় কল্পনাশক্তির। সে কাব্যে বিরহী প্রেমিক প্রিয়ার কাছে বিরহ বেদনার বার্তা বয়ে নিয়ে যাওয়ার অনুরোধ জানাচ্ছে মেঘকে, দিচ্ছে পথের নির্দেশ আর তার দৃশ্যের বর্ণনা। হিন্দু ধর্মীয় অনুষ্ঠানের একটা বড় অংশই হল কল্পনার কাছে আবেদন। ঈশোপনিষদে (৮) ঈশ্বরকেও বর্ণনা করা হয়েছে কবি বলে—যার ব্যুৎপত্তিগত অর্থ দ্রষ্টা, পরে যার অর্থ দাঁড়িয়েছে কাব্য-রচয়িতা।

৬

সংহতি ও স্বাধীনতা

হিন্দুধর্ম শুধু ঈশ্বরের সর্বজ্ঞতা আর সর্বশক্তিমত্তার কথাই স্বীকার করে না, তাঁকে সর্বব্যাপী হিসেবেও দেখে। তিনি একমেবাদ্বিতীয়ম্—এক এবং দ্বিতীয়রহিত। ভগবদ্‌গীতার কথায়, তিনি সকল জীবের মধ্যে বাস করেন (অধ্যায় ১৮ শ্লোক ৬১)। এক—এর লক্ষ্যে যাত্রাপথের সংখ্যাও অগণ্য। 'বহুপথ', প্রত্যেক পথের নিজস্ব সার্থকতার এবং কোনও পথই যে একক ভাবে সম্পূর্ণ নয় এই স্বীকৃতিই হিন্দুধর্মকে অসংখ্য বৈচিত্র্যে ভরিয়ে রেখেছে। নানা সম্প্রদায়ের ধর্মচিন্তায় তফাত আছে, তফাত আছে ধর্মীয় সাধনা ও আচারের মধ্যেও, এর ভিতর অদ্বৈতবাদ, দ্বৈতবাদ, একেশ্বরবাদ, বহুঈশ্বরবাদ, সর্বেশ্বরবাদ সবই আছে। সত্যি কথা বলতে কী, হিন্দুধর্ম সব রকম আধ্যাত্মিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার এক বিপুল ভাণ্ডার।[১]

বেদে পুরুষ আর প্রকৃতির মধ্যে কোনও বিরোধকে স্বীকার করা হয় না। কিন্তু এরই মধ্যে নিহিত আছে সাংখ্যদর্শনের সারাৎসার। সাংখ্যে ব্যক্তিরূপে মূর্ত ঈশ্বরের ধারণা বাতিল করে দিয়েছে। কিন্তু ভক্তি আন্দোলনের ধর্মের ভিত্তিই হল ব্যক্তিরূপী ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি। আবার এই দুইয়েরই বিপরীতে রয়েছে শঙ্করের অদ্বৈতবাদ। সেখানে ঈশ্বর ছাড়া আর কিছুর অস্তিত্বকেই

১. ভারতীয় ধর্ম সব সময়েই অতিথিপরায়ণ, সহিষ্ণু ও সমন্বয়ী। সেই কারণে আজকের এই হিন্দুধর্মের মধ্যে বিশ্বাস ও আচরণের ক্ষেত্রে দেখা যায় প্রায় অবিশ্বাস্য সহিষ্ণুতা। হিন্দুধর্মের সামাজিক কাঠামোর ভিতরে আছে মরমিয়া সাধকের দল যারা ঠাকুরদেবতা মানে না, আছে সব জড়পদার্থে প্রাণ দেখে এমন বহুত্ববাদী, লৌকিক দেবদেবী—গ্রাম বা বনজঙ্গলের দেবদেবীতে বিশ্বাসী একেবারে অসংস্কৃত মানুষ থেকে শুরু করে গ্রিক, রোমান আর মিশরীয় পুরাবৃত্তান্তের ছাত্রদের পরিচিত গোত্রের বহু দেবতার উপাসক পর্যন্ত। আর এই দুই প্রান্তের মাঝখানে আছে সুসংস্কৃত একেশ্বরবাদী। এদের ভক্তি এক ব্যক্তি-ঈশ্বরের অভিমুখী যার ধারণা বহিরঙ্গে অনেকটাই বহু খ্রিস্ট ধর্মাবলম্বীর ধারণার সঙ্গে মেলে।

—A. C. Bouquet, in 'Hinduism' *Chamber's Encyclopaedia.* 1950, p. 98.

স্বীকার করা হয় না। বিশ্ব তাঁরই প্রকাশ। তিনিই একমাত্র সত্য, বিশ্ব হল মায়া। ঈশ্বর যে অবতার হয়ে আসেন (রাম, কৃষ্ণ কিংবা বুদ্ধ) রামায়ণ, মহাভারতে (ভগবদ্‌গীতাসহ) এই ভাবনার স্বীকৃতি আছে। উপনিষদে এ ভাবনাটি নেই, আর বেদতো একে সরাসরি বাতিলই করে দেবে। কিন্তু অন্যদিকে বাউল গানে পাই, "প্রত্যেক জীবে দেখি তিনিই অবতার।" হিন্দুধর্মের অধিকাংশ সম্প্রদায়ই উপনিষদের সর্বব্যাপী পরম ব্রহ্মের ধারণাকে স্বীকার করে। কিন্তু ধর্মবিশ্বাসের খুঁটিনাটি বিষয়ে এদের মধ্যে সত্যিই বিরাট ফারাক। কাজেই তাত্ত্বিক ক্ষেত্রে মতৈক্য হিন্দুধর্মে ঐক্য এনেছে এমন নয়।

আগেই উল্লেখ করেছি, ধর্ম আর রিলিজন এক জিনিস নয়। আর হিন্দুধর্মকে নির্দিষ্ট অর্থে রিলিজন বলা যাবে না। এ ধর্মই। ভগিনী নিবেদিতা (মার্গারেট নোবল) লিখেছিলেন, "সিভিলাইজেশন" শব্দটি আমাদের 'ধর্ম' বা 'জাতীয় নীতি-নিষ্ঠা' শব্দের পশ্চিমি প্রতিশব্দ।[২] এই ধৈর্য, এই অবিচল দৃঢ়তা, এই আন্তরিকতা, হল ধর্ম—মানুষের সারাৎসার, তার আত্মতা (পৃ. ৫১)।

তাহলে দেখা যাচ্ছে ধর্মের সম্পর্ক যত মানুষের স্বভাব আর আচরণের সঙ্গে, বিশ্বাসের সঙ্গে ততটা নয়। তাই এখানে কোনও মতবাদ বা তত্ত্ব মানার ব্যাপার জড়িয়ে থাকে, এমন বলা যাবে না। অবশ্য আচরণের সঙ্গে সম্পর্ক থাকলে আলাদা কথা। অধ্যাপক রাধাকৃষ্ণনের ভাষায়, "চিন্তার রাজ্যে এ আমাদের অবাধ স্বাধীনতা দেয়, কিন্তু আচরণ-বিধিতে কঠোরতা আরোপ করে। আস্তিক, নাস্তিক, সংশয়বাদী, অজ্ঞেয়বাদী—সবাই হিন্দু হতে পারে হিন্দু সংস্কৃতি ও জীবনের সুসম্বদ্ধ ব্যবস্থাটিকে স্বীকার করে নিলেই। ... বিশ্বাস নয়, নৈতিক আচরণই শুধু বিবেচ্য।"[৩] অবশ্য ঈশ্বরলাভের সাধনাকে হিন্দু আচরণের মধ্যে গণ্য করা কেন হবে না এ রকম প্রশ্ন থেকেই যায় যার মীমাংসা হয়নি। আর এমনি ভাবেই হয়তো এ বিতর্কও উঠবে, একজন নাস্তিককে কি হিন্দু বলে গণ্য করা যাবে যদি সে অন্যদিকে হিন্দু আচরণবিধি

২. *Religion and Dharma,* London. 1915. p. 51.
৩. *The Hindu View of Life*. London 1927. pp. 77 and 38.

মেনে চলে। যাই হোক, এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই যে ধর্মীয় বিশ্বাস নয়, হিন্দুধর্ম মূলত জীবনাচরণের ব্যাপার।

ধর্মীয় রীতিনীতি পালন দুই রকমের—লোকাচার কিংবা শাস্ত্রাচার। সামাজিকভাবে স্বীকৃত আচরণবিধি হল লোকাচার, শাস্ত্রের অনুমোদনের সঙ্গে এর সম্পর্ক নেই। আর দ্বিতীয়টি হল শাস্ত্র-নির্দিষ্ট আচরণ-বিধি।

কোনও কোনও শাস্ত্রাচার এবং লোকাচার সাধারণ আচরণ-বিধির (যেমন সততা, নিঃস্বার্থ কর্ম, দয়া, প্রেম ইত্যাদি) সঙ্গেই শুধু সম্পর্কিত নয়, ব্যবহারের অনুপুঙ্খ রূপের সঙ্গেও তার সম্বন্ধ। কখনও অনুষ্ঠান ও ক্রিয়াকাণ্ডের নির্দেশও থাকে, কিন্তু লোকাচার আর শাস্ত্রাচার দুটিকেই শেষ পর্যন্ত বলা হয়েছে 'বাহ্য' বা বহিরঙ্গীয়। আর যদি কেউ মনে করে তার মানসিক গঠন বা প্রবণতার সঙ্গে এই অনুপুঙ্খ আচারের বিরোধ রয়েছে তা হলে এ ক্ষেত্রে তার কোনও বাধ্যবাধকতার প্রয়োজন নেই। এইভাবে বাউল আর ভক্তিমার্গের কিছু মানুষ অনেক সময় হিন্দুধর্মের মূলগত আদর্শকে অস্বীকার না করেও এই অভিচার বর্জনের কথা ঘোষণা করেছে। আবার কখনও গুরুরাই শিষ্যদের জানিয়েছেন, প্রচলিত আচার অনুষ্ঠান মানা জরুরি নয়। কিন্তু এ জন্য তাদের হিন্দুত্ব খাটো হয়ে যায় না, যদি তারা হিন্দুর আদর্শগুলোকে আর সেই সঙ্গে সদাচরণের বিধিগুলোকে অস্বীকার না করে। বস্তুত হিন্দুধর্মের মতবাদ আর আচার-অনুষ্ঠানের বিপুল বৈচিত্র্যের মধ্যে যোগসূত্রটি হল সেই মূল আচরণবিধিতে আস্থা—নিষ্কাম কর্ম, নিরাসক্তি, সততা, প্রেম যার অন্তর্গত। শ্রীকৃষ্ণের কথায়—"সকল জীবের প্রতি দ্বেষহীন, মিত্রভাবাপন্ন, দয়ালু, মমত্ববুদ্ধিশূন্য, সুখে-দুঃখে নির্বিকার, ধৈর্যশীল' (ভগবদ্‌গীতা অধ্যায় ১২ শ্লোক ১৩) আর এর সঙ্গে যোগ করা যায়, যে কোনও যথোচিত পথে ঈশ্বরের সামীপ্য লাভের আকাঙ্ক্ষা।"

ধর্মীয় পূজা অর্চনার ব্যাপারে হিন্দুধর্ম খুবই উদার। কর্ম অথবা ধ্যান আর জ্ঞান অথবা শুধুই ভক্তি—ঈশ্বর সাধনার নানা পথ। সবগুলোই সমান সিদ্ধ। ধর্মীয় অনুষ্ঠানের খুঁটিনাটি ব্যাপারে ব্যক্তি বিশেষে তফাত হতে পারে, যেমন হতে পারে ধারণার ক্ষেত্রে। হিন্দুধর্ম ঈশ্বর-প্রাপ্তির কোনও একটি মাত্র পথের অস্তিত্বে বিশ্বাস করে না বলেই এটা খুব স্বাভাবিক। প্রাচীন মহিম্ন স্তোত্রে আছে 'হে প্রভু! বেদ, সাংখ্য, যোগ, পাশুপত, বৈষ্ণব—এই সব পথ

তোমার কাছেই নিয়ে যায়, যেমন আঁকাবাঁকা নদীর ধারা অবশেষে সাগরে গিয়ে মেশে।'[৪] বস্তুত হিন্দুধর্মের যদি কোনও বাণী থাকে তবে তা এই— তিনি অনন্ত, সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান, সর্বত্রবিরাজমান, কিন্তু নানা জনের কাছে তিনি নানারূপে দেখা দিতে পারেন।

তাঁর কাছে পৌঁছনোর নানা পথ। সব পথই সমান সিদ্ধ। আর কিছু নয়, ঈশ্বর সম্বন্ধে আপাত বিপরীত ধারণাগুলোর মূলে রয়েছে এক পরমপুরুষের অসংখ্য অভিব্যক্তি। হিন্দুধর্ম বলে, এই সব তাত্ত্বিক মতবাদের পার্থক্য বহুস্বীকৃত মূল আচরণবিধির বিকাশে কখনও বাধা হয়ে ওঠে না। 'রিলিজন' নয়, মানুষের জীবনে গুরুত্বপূর্ণ হল তার ধর্ম।

৪. ভগবদ্‌গীতায় কৃষ্ণরূপে ঈশ্বর বলেছেন, "যে যেভাবে আমাকে আরাধনা করে আমি তাকে সেইভাবেই অনুগ্রহ করি। লোকে যে নানা পথ নেয় সে আমারই পথ।"

—চতুর্থ অধ্যায়, শ্লোক ১১

৭

সিন্ধু উপত্যকার সভ্যতা

ধর্ম সাম্প্রতিক কালের সৃষ্টি নয়। ঐতিহাসিক গবেষণা যত এগিয়ে চলেছে ধর্মের উদ্ভবের কালও ততই পিছিয়ে যাচ্ছে। ভারতে হিন্দুধর্মের সূচনা আর বিকাশের সম্বন্ধে সিদ্ধান্তে আসা কঠিন হলেও অসম্ভব নয়। বেদ আর বৈদিক ধর্ম হিন্দুধর্ম ও সংস্কৃতির ভিত্তি বা বুনিয়াদ এটিই লোকপ্রচলিত ধারণা। কিন্তু এই গ্রন্থগুলোতে আরও আগেকার ভিন্নতর সংস্কৃতি আর সুসম্বন্ধ জীবননীতির উল্লেখ আছে। দীর্ঘদিন এই বেদের মধ্যেই অবৈদিক আর বেদ-বিরোধী তথ্য সন্ধানের চেষ্টা হয়েছে। কিন্তু সম্প্রতি এক পুরাতাত্ত্বিক আবিষ্কার আমাদের সামনে প্রাক্‌বৈদিক সংস্কৃতির সম্বন্ধে একরাশ তথ্যের সন্ধান দিয়েছে।

১৯১৭ সালে এক ভারতীয় পুরাতত্ত্ববিদ সিন্ধু প্রদেশের লারকানা উপত্যকায় মহেঞ্জোদারো (সমাধিস্তূপ) নামে এক জায়গায় দেখতে পান সুপ্রাচীন একটি ছুরি। ১৯২২ সালের খনন কর্মে পাওয়া যায় কিছু পাথরের সিলমোহর। এগুলো দেখতে হরপ্পা নামে আর এক জায়গায় পাওয়া সিলমোহরের মতোই।[১] পরবর্তী খননের কাজে প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া যায় যে, অন্তত আড়াই হাজার খ্রিস্টপূর্বাব্দে সেখানে সুপরিকল্পিত নাগরিকজীবন ছিল। এ ছাড়া আরও কয়েকটি জায়গায় এই বেদ-পূর্ব সভ্যতার নিদর্শন মিলেছে প্রত্ন উদ্ধারের কাজ

১. হরপ্পার এই ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কার করেন উনিশ শতকের উইলিয়ম ব্রান্টন নামে এক ইংরেজ বাস্তুকার মূলতান থেকে লাহোর পর্যন্ত রেলপথের পরিকল্পনা ও স্থাপনের কাজে এসে। পুরাতত্ত্বে ব্রান্টনের খুব একটা উৎসাহ না-থাকায় তিনি ঐ স্তূপ থেকে পাথরগুলো দিয়ে রেলপথের কাজে লাগিয়েছিলেন। এমনকি আজও রেলগাড়ি চলে একশো মাইলের মতো সেই লেপথটিতে যা তিন হাজার খ্রিস্টপূর্বাব্দের পাথরের টুকরো দিয়ে তৈরি নিরাপদ ভিতের উপর দাঁড়িয়ে আছে। যিনি পরে উত্তর ভারতের প্রত্ন অনুসন্ধান সমিতির সর্বাধ্যক্ষ হয়েছিলেন সেই জেনারেল কানিংহাম ১৮৫৬-তে যখন হরপ্পা ঘুরে দেখে গেছেন তখন ব্রান্টন পাথর সংগ্রহে ব্যস্ত। কানিংহাম বুঝেছিলেন এই আবিষ্কারের গুরুত্ব, কিন্তু মহেঞ্জোদারোর ধ্বংসাবশেষ খুঁজে পাওয়ার আগে এর যথার্থ তাৎপর্য বোঝা যায়নি। সেটা বোঝা যায় পরে। খননের কাজ শুরু হয় ব্রান্টনের আবিষ্কারের প্রায় সত্তর বছর পর।

করতে গিয়ে। একে সিন্ধু উপত্যকার সভ্যতা নামে চিহ্নিত করা হয়।

সিন্ধু উপত্যকার মানুষ ধাতু আর খনিজ পদার্থের ব্যবহার জানত যেমন সোনা, রুপো, তামা, টিন, সিসা আর ব্রোঞ্জ। অবশ্য লোহার কথা নেই, যদিও বেদে লোহার ব্যবহারের নানান উল্লেখ আছে। খাদ্যবস্তুর মধ্যে ছিল গম, যব, ফল, মাংস আর মাছ। তুলো প্রস্তুত হত এবং কাপড় বোনা আর রং করার চল ছিল। সংস্কৃতিটি ছিল প্রধানত নগরকেন্দ্রিক। সুপরিকল্পিত রাস্তার সারি, আর অবাক-করা নিকাশি ব্যবস্থা উন্নত পৌরব্যবস্থার নিদর্শন।

এই সভ্যতাটি বহু শিল্পকলার নিদর্শন রেখে গেছে। এর লিপিগুলো সাংকেতিক, পাঠোদ্ধার হয়নি আজও। মনে হয় সে সময় দক্ষ উৎপাদনশিল্প ছিল আর ছিল বেশ শক্তিশালী ব্যবসায়ী গোষ্ঠী। কোন কোন প্রজাতি এর অন্তর্গত ছিল বলা কঠিন। তবে ধাঁচ বা ধরনে জাতিগত বিমিশ্রতার লক্ষণ দেখা যায়। সম্ভবত এটি প্রাগার্য ভারতীয় সভ্যতা ছিল বা হয়তো ধ্বংস হয়েছিল আর্যদের আক্রমণে। এই আর্যরা উন্নত যুদ্ধাস্ত্রে বলীয়ান আর যুদ্ধবিগ্রহে পারদর্শী ছিল। অথবা এমনও হতে পারে উপর্যুপরি ভয়ংকর বন্যায় ধ্বংস হয়ে গেছে এই সভ্যতা।

কোনও বিশেষ ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মন্দির বিরল হলেও সভ্যতাটি ধর্মনিরপেক্ষ ছিল না অবশ্যই। অনেক মূর্তিকেই যোগী বলে মনে হয়। যে সব মূর্তি পাওয়া গেছে তার অনেকগুলোর সঙ্গে হিন্দুধর্মের পশুপতিনাথ শিবের মূর্তির সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায়। বৃক্ষ, পশু, সর্প পূজার অভিজ্ঞানও রয়েছে মনে হয়। দেবী আরাধনা অথবা শক্তি আরাধনার যে ঐতিহ্য বর্তমান হিন্দুধর্মে রয়েছে হয়তো বা তা এসেছে এই সংস্কৃতি থেকেই। এই অনুষঙ্গযুক্ত অসংখ্য মৃন্ময় নারীমূর্তি এমনই ইঙ্গিত দেয়। বোধকরি শৈব আর শক্তি সাধনার ধারা দুটির সূচনা এই পর্বেই। আর বর্তমান হিন্দুধর্মের অপরিহার্য উপাদান যোগ এবং ধ্যান সম্বন্ধেও একই কথা বলা যায়।

হিন্দুধর্মে সিন্ধু উপত্যকার এই সভ্যতার দানের সুনির্দিষ্ট প্রকৃতি যাই হোক এ বিষয়ে সন্দেহের কোনও অবকাশ নেই যে, ঐ সুপ্রাচীন সময়েই বৈদিক আর প্রাকবৈদিক সংস্কৃতির সমন্বয় ঘটেছিল এই ভারতের মাটিতে।[২]

২. আর্য সভ্যতার আগে যারা ভারতে বাস করত অথচ সিন্ধু উপত্যকার সভ্যতার অন্তর্গত ছিল না, তাদের ধর্মীয় আচার সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই জানা যায় না। এটা অবশ্য পরিষ্কার যে কিছু হিন্দু রীতিনীতি (ধর্মীয় অনুষ্ঠানে সিঁদুর আর শাঁখার ব্যবহার এর অন্তর্গত) এই জনগোষ্ঠীর কাছ থেকে এসেছে। পরের পরিচ্ছেদগুলোতে আমরা অন্য প্রভাব নিয়ে আলোচনা করব।

৮

বৈদিক যুগ

আমরা এখন তাকাব বৈদিক যুগের দিকে। ভারতীয় সংস্কৃতির ধারায় এর প্রভাব অনেকখানি, এ কথাতো নিশ্চিতভাবেই বলা যায়। অবশ্য আধুনিক জীবনের চাহিদা পুরনো ভারতীয় রীতিনীতিকে বদলে দিয়েছে অনেক। যে যজ্ঞের বিশদ বিবরণ পাই বেদে তা বেশ গুরুত্ব হারিয়েছে বৈদিক যুগ চলে যাওয়ার পর। বেদবিরোধী জৈন ও বৌদ্ধদের অহিংসা ও মৈত্রীর বাণী প্রকৃতই শ্রদ্ধেয় হয়ে উঠেছিল পরবর্তীকালে। আজকের হিন্দুধর্মে আরও অনেক অবৈদিক ধ্যানধারণা দেখা যায়। যেমন শক্তির আরাধনা, বৈষ্ণবদের ভক্তিবাদ এবং তপশ্চর্যা, বৈরাগ্যসাধন আর সংযমের বিচিত্র আদর্শ। কিন্তু এ সব সত্ত্বেও হিন্দুরা তাদের ধর্মকে বেদের অনুসৃতি বলেই মনে করে আর বেদকে মনে করে স্বয়ং ঈশ্বরের প্রত্যাদেশ।

বেদ বলতে আমরা সাধারণত বুঝি বৈদিক সংহিতা। এগুলো স্তবস্তুতো আর শাস্ত্রাচার-সংক্রান্ত বিধানের সংকলন।[১]

দেবতারাই এ গ্রন্থগুলোর প্রধান চরিত্র। বার বার বিচিত্র ভক্তিনিবেদনের মধ্য দিয়ে তাঁদের প্রসন্ন করাই ভক্তদের একমাত্র উদ্দেশ্য। তথাকথিত 'কর্মবিধি' হল স্বর্গবাসী এই মানবভাগ্যবিধাতাদের সন্তোষ সাধনের উপায়। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে আচারগুলো বেড়ে বেড়ে বহুগুণ হয়েছে, যার মানে

১. প্রকৃত অর্থে বেদ (বেদ = জ্ঞান) তিনটি খণ্ডের সমষ্টি—সংহিতা, ব্রাহ্মণ আর উপনিষদ। সংহিতার আক্ষরিক অর্থ হল সংকলন। সংহিতায় দেবতাদের স্তবগান (ঋগ্বেদ), স্তব-সম্পৃক্ত সুরের সংকলন (সামবেদ), যজ্ঞ-সংক্রান্ত বিধির সংকলন (যজুর্বেদ) আর অপ্রাকৃতিক অনুষ্ঠান-বিধির সংকলন (অর্থববেদ)। ব্রাহ্মণ, গদ্যে রচিত যজ্ঞ ও অন্যান্য অনুষ্ঠানাদির বিবরণ যা পুরোহিতদের ব্যবহার্য। এরই সঙ্গে এগুলোর তাৎপর্য সংক্রান্ত নিবন্ধ। উপনিষদ পরমসত্যের স্বরূপ-সংক্রান্ত আলোচনা, অসামান্য তাৎপর্যময় তত্ত্বের প্রকাশ হিন্দু-দর্শনের সার কথা। দশম পরিচ্ছেদের এর আলোচনা আছে।

বোঝেন শুধুই বিশেষজ্ঞেরা। বৈদিক ধর্মের এই বহুব্যাপ্ত জটিল আচারসর্বস্বতা থেকে যে অসন্তোষের সৃষ্টি, মনে হয় তারই থেকে পরবর্তীকালে জ্ঞানমার্গ আর ভক্তিমার্গের সন্ধান শুরু হয়। জ্ঞান আর ধ্যানকে প্রাধান্য দিয়ে উপনিষদের জন্ম, প্রেম আর পূজাকে আশ্রয় করে জন্ম ভক্তি-সাহিত্যের। এ হল বৈদিক ধর্মের অতিরিক্ত আচারসর্বস্বতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ। এ প্রসঙ্গে আলোচনা করা যাবে পরবর্তী পরিচ্ছেদে।

বৈদিক আর্যরা বিভিন্ন গোষ্ঠীতে বিভক্ত ছিল। কিন্তু তাদের সঙ্ঘবদ্ধ করেছে এই দেবপূজা আর ধর্মীয় বিধি। তাদের মতে মানুষের জীবনটাই দেবতাদের হাতে—জীবনের সমাপ্তি অথবা তাঁদেরই মতো সমৃদ্ধি। যাগযজ্ঞের যথাযথ অনুষ্ঠানেই পার্থিব উন্নতি এবং স্বর্গের সুনিশ্চিত সুখ সম্ভব, বৈদিক মানুষের যা আদর্শ-প্রার্থিত। একমাত্র অথর্ববেদেই মানুষ, দেবতা, স্বর্গ সব একাকার। অর্থববেদ নিয়ে রক্ষণশীলদের বিরক্তির এটা একটা কারণ। এই বেদে বহু অবৈদিক প্রভাবের প্রসঙ্গ আছে। যেমন যজ্ঞ-বিরোধী ব্রাত্যদের প্রার্থনা।

বেদ চারটি—ঋক, যজু, সাম আর অথর্ব। এর মধ্যে সবচেয়ে প্রাচীন গুরুত্বপূর্ণও হল ঋগ্বেদ (ঋক + বেদ)। এই গ্রন্থের বিচিত্র সংশোধিত রূপের মধ্যে মাত্র একটি আমাদের কাছে এসে পৌঁছেছে। এতে আট বা দশটি খণ্ডে মোট ১,০২৮টি স্তোত্র আছে। গুরুত্ব অনুযায়ী এর পরই উল্লেখ্য অথর্ববেদ। এই বেদে জাদুবিদ্যার অনেকগুলো সূত্র আছে, যার সংখ্যা বিপুল। তারই সঙ্গে আছে প্রাকবৈদিক প্রভাবের নিশ্চিত অভিজ্ঞান। অর্থব শব্দটির আক্ষরিক অর্থ হল অগ্নি পুরোহিত।[২] এর মধ্যে অনেকগুলো স্তোত্র ঋক্ বেদেও আছে। কিছু মন্ত্রে আধ্যাত্মিক তাৎপর্যের ভার কম। বরং মাঝে মাঝেই নজরে পড়ে রীতিমতো পরিশীলনের ছাপ যা স্বভাবে আধুনিক। তার ফলে সমগ্র সংকলনের চরিত্রে অন্য মাত্রা এনে দেয়। বোঝা যায়, আপাত-প্রত্যক্ষের বাইরে স্পষ্টতই এতে আরও কিছু আছে। 'নৃ', 'মহি', 'স্কম্ভ', 'উচ্ছিষ্ট'—এই সূক্তগুলো দৃষ্টান্ত হিসেবে উল্লেখ করা যায়। নৃসূক্তে

২. অমরকোষে 'অথর্ব' শব্দটি নেই। মেদিনীকোষে আছে। অথর্ব একজন ঋষি। বলা হয় ইনি ব্রহ্মার জ্যেষ্ঠপুত্র। ব্রহ্মা এঁকে ব্রহ্মবিদ্যা উপদেশ দেন। দ্রষ্টব্য : বঙ্গীয় শব্দকোষ, প্রথম খণ্ড, হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়— অনুবাদক।

আরাধ্য দেবতা নয়, মানুষ। মহিসূক্তে স্বর্গের চেয়ে মর্ত্যের মাটিকেই ভজনীয় মনে হয়েছে। স্কম্ভসূক্তে আছে সৃষ্টির গোপন বৈভবের কথা। আর উচ্ছিষ্ট সূক্ত প্রয়োজনাতিরিক্তের স্তবগান।

ঋগ্বেদের অনেকগুলো মন্ত্র ঠাঁই পেয়েছে সামবেদে। এগুলো আসলে গান অর্থাৎ গেয়। তাই সুর সম্বন্ধে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। যজুর্বেদ প্রধানত যাগযজ্ঞে কথা বলেছে। এর দুটি ভাগ। অধিকাংশ বেদেই বহু বিভাগ, উপবিভাগ আছে। এর সবগুলো আজ আর পাওয়া যায় না। এর একটা কারণ দীর্ঘকাল আগে এগুলো মুখে মুখে রচিত আর শ্রুতিতে বাহিত হয়ে এসেছে।

বেদের রচনাকাল নিয়ে মতভেদ আছে। এতদিন অধিকাংশ ভারতীয় এ গ্রন্থকে যত প্রাচীন বলে মনে করে এসেছে আধুনিক বিশেষজ্ঞদের মতে এ অত প্রাচীন নয়। উইন্টারনিৎজ-এর ধারণা বেদের রচনাকাল খ্রিস্টপূর্ব আড়াই হাজার বছর থেকে খ্রিস্টপূর্ব সাতশো বছরের মধ্যে। কিন্তু আজকের অধিকাংশ পণ্ডিত অবশ্যই বলবেন এর জন্ম খ্রিস্টপূর্ব আড়াই হাজার বছরের পরে। আনুমানিক তেরোশো আশি (১৩৮০) খ্রিস্টপূর্বাব্দের এক নথিতে মিতান্নিয়ার রাজা মাত্তিউয়াজা (Mattiuaza)-কে দেখা যায় প্রার্থনারত। তিনি প্রার্থনা জানাচ্ছেন হিন্দু দেবলোকের মিত্র, বরুণ আর ইন্দ্রের কাছে। কাজেই বেদের মূল অবশ্যই চলে গেছে অন্তত খ্রিস্টপূর্ব দুই হাজারের মাঝামাঝি পর্যন্ত।[৩] এখানে বলে রাখি, ধর্মভাবাপন্ন মানুষ এই সব সন তারিখ, বয়স নিয়ে মাথা ঘামায় না। ইতিহাসের চেয়ে অব্যক্তের রহস্য-উদ্ঘাটনেই হিন্দুদের আগ্রহ।

হিন্দু দেবতাদের অধিকাংশই এসেছেন প্রকৃতি-জগৎ থেকে— সূর্য, চন্দ্র, অগ্নি, আকাশ, ঝঞ্ঝা, বাতাস, জল, প্রত্যূষ, বৃষ্টি ইত্যাদি ইত্যাদি। ইন্দ্র বৃষ্টি আর বজ্রের দেবতা, ইনি অন্যদের চেয়ে বেশি গুরুত্ব পেয়েছেন মনে হয়। দেবতাদের এই স্তবের মধ্যে বেশ কিছু আশ্চর্য কবিতা আছে। এমনকি এগুলোতে আকাশ আর মহাকাশ সম্বন্ধে অস্পষ্ট ধারণার পরিচয় মেলে। প্রজাপতি আর বরুণ নাম দিয়ে দেবত্ব আরোপ করা হয়েছে এদের উপর। বরুণ পরে শুভাশুভ ও ন্যায়নীতির দেবতায় রূপান্তরিত।

৩. Stuart Piggott, *Prehistoric India*. Penguin Books, 1950, p. 250.

প্রজাপতি সমগ্র সৃষ্টি-জগতের অধিদেবতা, বিশ্বকে চালনা করেন তিনিই। এমনকি বিশ্বাস বস্তুটিতেও দেবত্ব আরোপ করা হয়েছে। রাত্রি এবং অরণ্যের স্তব প্রধানত স্বল্পজনবোধ্য আধ্যাত্মিক তাৎপর্যময় রচনা হলেও এর মধ্যে প্রাকৃতিক বিশ্বসৌন্দর্যকে ঘিরে অসামান্য সংবেদী মনের পরিচয় পাওয়া যায়। ঊষা এবং বাক্-এর স্তুতিগুলোও ওই রকমই আশ্চর্য সুন্দর কাব্যের দৃষ্টান্ত। যা সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম, যা বিমূর্ত তারও গুরুত্ব সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সচেতন ছিলেন ঋষিরা। অর্থববেদে জীবন এবং কাল নিয়েও রচনা করা হয়েছে স্তবগান। কিছু আগেই উল্লেখ করেছি বাক্ প্রসঙ্গ। এখানেও ঐ একই চেতনা। একটি বৈদিক মন্ত্র হিন্দুদের দৈনন্দিন পূজার অঙ্গ হয়ে গেছে— গায়ত্রী মন্ত্র (ঋগ্বেদ, ৩, ৬২, ১০)। এর মূল ভাব হল, "যিনি আমাদের মধ্যে বোধশক্তি সঞ্চার করেছেন সেই বিশ্বস্রষ্টার জ্ঞান এবং শক্তির ধ্যান করি, পূজা করি।"

যজ্ঞই ছিল নিবেদনের শ্রেষ্ঠ পন্থা। অনুষ্ঠান হত যজ্ঞের আগুনকে ঘিরে। অর্ঘ্য নিক্ষেপ করা হত সেই অগ্নিতে। যজ্ঞকর্তার প্রিয় সামগ্রীই হত অর্ঘ্যের উপকরণ— ননী, দুধ, মাংস, দুধে সিদ্ধ করা দানাশস্য, উত্তেজক পানীয় ইত্যাদি। প্রায়ই ছাগ বলি দেয়া হত, কখনও বা অশ্ব।

যজ্ঞের উদ্দেশ্য নিয়ে মতভেদ আছে। প্রথম, নিজের সম্পদের কিছু অংশ দিয়ে এই ভাবে দেবতাদের সন্তুষ্টিবিধান। দ্বিতীয়, যজ্ঞের নৈবেদ্য দেবতাদের প্রতি আনুগত্যের এক প্রতীক। এবং শেষ, দেবতাকে বাদ দিয়েই অর্থাৎ দেবতা-নিরপেক্ষ কৃচ্ছ্রসাধন ও বৈরাগ্যসাধনের যজ্ঞ একটা পন্থা। সন্দেহ নেই, যজ্ঞের সূচনা দেবতার তুষ্টিবিধান-চেষ্টা থেকেই। তারপর সময়ের সঙ্গে তার তাৎপর্যও বদলেছে। শেষ পর্যন্ত জড়িয়ে যায় পরবর্তী হিন্দু-দর্শনের আরও নানা কথার সঙ্গে বৈরাগ্য সাধনের কথা।

ক্রমে ক্রমে প্রজাপতি ও বরুণকে ঘিরে একেশ্বরবাদের তত্ত্ব জন্ম নিল। বেদে ঘোষণা করা হল—"তিনি এক এবং অদ্বিতীয় যদিও প্রাজ্ঞেরা তাঁকে নানা নামে ডাকেন" (ঋগ্বেদ, ২১, ১৬৪, ৪৬)। মহাভারতে বলা হল, সব বেদই এক ও অভিন্ন। সত্য এক। আমাদের অজ্ঞানতাই একে বহুধা বিভক্ত করে। যিনি পরম এক তিনি শুধু একজন স্থপতি নন, তিনি স্রষ্টাও। এবং

তিনি সৃষ্টি করেন নিজেরই ভিতর থেকে।[৪] এ বিশ্বের জন্ম তাঁর আনন্দ থেকে। অসীম নিজেকে প্রকাশ করছেন বহু নামে, বহু রূপে, এই তত্ত্বের প্রথম উল্লেখ পাই সংহিতায়। পরে তা বিশদভাবে উপস্থিত হয়েছে উপনষিদে। সেই পরম এক তাঁর নিজের সৃষ্টিতে বাঁধা পড়েন না, কেন না স্বভাবে তিনি মুক্ত। এই বিশ্ব তাঁর লীলার অভিব্যক্তি, তাঁর আনন্দের প্রকাশ। আমরা তাঁরই অংশ। আত্মা আর ব্রহ্মের এই একাত্মতার কথা আছে উপনিষদে, বিশ্বের সকল মানুষের উদ্দেশে এই মহাবাণী— 'তৎ ত্বম্ অসি', 'তুমিই তিনি'। এই মত অনুযায়ী মানবজীবনের উদ্দেশ্য সেই মহা উৎসের সঙ্গে যোগ। উপনিষদে এ তত্ত্বের বিশদ বিকাশ হলেও এর প্রথম সাক্ষাৎ পাই বৈদিক সংহিতায়। শতাব্দীর ধারায় দৃষ্টি স্থাপন করলে দেখা যাবে হিন্দুধর্মের যা কিছু মহার্ঘ তার উৎস রূপে দাঁড়িয়ে আছে বেদ।

৪. সৃজনসংগীত-জাতীয় নামে এক অসাধারণ সংবেদনাময় স্তবগান আছে। রচয়িতা সৃষ্টির রহস্য নিয়ে গভীর চিন্তায় মগ্ন, সেই সঙ্গে সমস্যার বিপুলতায় সভয় বিস্ময়ে অভিভূত (দ্রষ্টব্য. তৃতীয় ভাগ 'ক' ২)।

৯

বৈদিক সংস্কৃতি ও শিক্ষা

দীর্ঘদিন পর্যন্ত বেদ লিখিত রূপ পায়নি। তখন তাই স্মৃতিশক্তিসম্পন্ন পুরোহিত আর আচার্যের প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল। ফলত সেই সুপ্রাচীনকালে একটি প্রথাই গড়ে উঠেছিল পারম্পর্যের—মুখে মুখে সাহিত্য পৌঁছে যেত গুরু থেকে শিষ্যে, আর এমনিভাবেই এক প্রজন্ম থেকে অন্য প্রজন্মে। আনুষঙ্গিক বিদ্যা বা কলার (ইতিহাস, পুরাণ-কথা, গাথা, সংগীত নাটক) উদ্ভব যজ্ঞবেদির চারপাশে জমায়েত হওয়া জনমণ্ডলীর মধ্যে থেকে। পরে এগুলো সংস্কৃতিবান মানুষের প্রথাগত শিক্ষার অঙ্গ হয়ে ওঠে। তপোবনে গুরুরা এ বিষয়ে শিক্ষা দিতেন। সম্ভবত নগর-জীবনের বিক্ষেপ থেকে দূরে আসার অভিপ্রায়েই এই বিদ্যাপীঠগুলো গড়ে তোলা হয়েছিল নির্জন অরণ্যের আশ্রয়ে। বিদ্যার্থীরা হয়ে যেত গুরুর পরিবারের সদস্য। বিদ্যাচর্চার বাইরে কৃষিকাজে, আরও নানা ব্যাপারে শিষ্যরা সহায়তা করত গুরুর। এইভাবে তপোবনে আসত আর্থিক স্বয়ংসম্পূর্ণতা। সম্ভবত ছাত্রেরা গুরুকে অর্থে কোনও দক্ষিণা দিত না। অবশ্য পরবর্তীকালে জীবনে সাফল্য আসার পর তারা নানা সামগ্রী প্রণামী হিসেবে দিত। সমাজে তখন বৈষয়িকতার বাড়াবাড়ি ছিল না, তাই শিক্ষকেরা সেখানে অধিষ্ঠিত ছিলেন পরম সম্মানের আসনে। সেটাই ছিল সবচেয়ে বড় প্রতিদান। স্থানীয় রাজারা অনেক সময় সাহায্য করতেন এই প্রতিষ্ঠানগুলোকে। তাঁরা অবশ্য এগুলোর কাজকর্মে কখনও বিশেষ হস্তক্ষেপ করতেন না। স্বাভাবিকভাবেই গুরুর সুখ্যাতির উপরেই নির্ভর করত প্রতিষ্ঠানের সুখ্যাতি। কোনও বিশেষ আচার্যের কাছে দূর দূরান্ত থেকে ছাত্ররা আসত। নানা কাহিনি আছে এ নিয়ে।

বিচিত্র জাতির বিমিশ্রতার ফলে বৈদিক যাগযজ্ঞ ছাড়াও সমাজে আরও নানা আচার-অনুষ্ঠান ক্রমশ ঢুকে পড়েছিল। তপোবনের জীবনেও এর ব্যতিক্রম ঘটেনি। তার মধ্যে একটি হল পূর্বপুরুষের ('পিতৃপুরুষ'ই বহুব্যবহৃত শব্দ) উদ্দেশে তর্পণ। পুরাণ আর মহাভারত থেকে জানা যায়, প্রয়াতদের উদ্দেশে এই শ্রদ্ধা নিবেদন আসলে পরবর্তীকালের প্রবর্তন এবং যে পুরোহিতরা এই ধরনের অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে কাজ পরিচালনা করতেন রক্ষণশীলেরা তাঁদের দেখতেন নিচু নজরে। অবশ্য পরবর্তী সময়ে অধিকাংশ হিন্দুধর্মীয় অনুষ্ঠান প্রয়াত পূর্বপুরুষের প্রতি এই শ্রদ্ধানিবেদনকে আচারের অঙ্গ করে নিয়েছে। রক্ষণশীলদের মনোভাবে বোঝা যায় এই অনুষ্ঠান মূলত শাস্ত্রের পরিশুদ্ধ রীতিপদ্ধতির বাইরে ছিল।

এই জাতি-মিশ্রণ সত্ত্বেও সংস্কৃতভাষী আর ভারতের আদি অধিবাসীদের সামাজিক আচার, সেই সঙ্গে শিক্ষাব্যবস্থাও মনে হয় ভিন্ন ছিল। বৈদিক যুগে আর্যদের মধ্যে কট্টর জাতিভেদ প্রথা দেখা যায় না। আর্য সমাজে সকলেই যাগযজ্ঞে যোগ দিতে পারত। শুধু আদি অধিবাসীদেরই প্রধানত রাখা হত এর বাইরে। বৈদিক আদর্শে গৃহস্থরা যাগযজ্ঞ, অর্ঘ্যদান এই সব কাজের মাধ্যমে স্বর্গের আনন্দ লাভের আশায় থাকত। অবৈদিক সংস্কৃতিরও হিন্দুধর্মে কিছু অবদান আছে। এদের মোক্ষ বা মুক্তি বা নির্বাণের সহায়ক বৈরাগ্যসাধন আর তপস্যা, আর্য হিন্দু মূল্যবোধ ও আচরণবিধির সঙ্গে সংগতিপূর্ণ নয়। আর্যরা ছিল আমিষাশী। আর্য অভিজাত মহলে অতিথির জন্য গো-হত্যা ছিল খুবই উচ্চপ্রশংসার কাজ। বৌদ্ধ ও জৈনধর্মে যার প্রভাব রয়েছে, হিন্দুর সেই অহিংসায় বিশ্বাস নিশ্চিতই এসেছে অবৈদিক উৎস থেকে। মূল্যবোধের এই পার্থক্যর কারণেই বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর শিক্ষায়তনগুলো স্বভাবতই পৃথক ছিল।

প্রথমে আর্যদের শিক্ষাকেন্দ্র ছিল যজ্ঞভূমি। ইতিহাস, পৌরাণিক কাহিনি, লোকগাথা, নাটক এ সব ঐ পবিত্র অঙ্গনে পাঠ করে, গল্প বলে, অভিনয় করেও কখনও শেখানো হত। গাথা কিংবা প্রেমের কাহিনিকাব্য (যেমন উর্বশীর কাহিনি) আবৃত্তি আর গান গেয়েও শেখানো হত ছাত্রদের। আরও বুদ্ধিদীপ্ত বিনোদন ছিল জটিল বা কূট প্রশ্ন তোলা যার উত্তর রয়েছে বেদের মধ্যে। তপোবনের বিদ্যায়তনগুলোর বিকাশ এই যজ্ঞভূমির মণ্ডলী থেকেই।

অনার্যদের শিক্ষাকেন্দ্র বা ভাব-বিনিময়ের কেন্দ্র ছিল তীর্থক্ষেত্র, বিশেষত পুণ্যস্নানের স্থান। ঐ সব পবিত্র সম্মেলনে নাথ, যোগ, জৈন ইত্যাদি অবৈদিক ধর্মীয় মতবাদগুলোর বিকাশ ঘটেছিল। এই ঐতিহ্যেরই চিহ্ন হল মেলাগুলো। এলাহাবাদের কাছে যে কুম্ভমেলা হয় আজও, এখন যা একটি হিন্দু উৎসব, সেও এর দৃষ্টান্ত। জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের গণনায় মাঝে মাঝেই গ্রহ-নক্ষত্রের মহাযোগ ঘটে, সেই উপলক্ষে ধর্ম সম্মেলনের আয়োজন হয় ধর্মপ্রাণ মানুষদের এইরকম নানা তীর্থে। আর্য অনার্যের মধ্যে যে ব্যবধান তা শিক্ষার ক্ষেত্রেও ব্যাপ্ত হয়েছিল। তবে আরও পরে উপনিষদের সময় আমরা দেখি এ দুই সংস্কৃতির এ দুই চিন্তাধারার মহাসমন্বয়। এই প্রসঙ্গে ঐতরেয় ব্রাহ্মণের একটি গল্পের কথা বলি। গল্পটি খুবই তাৎপর্যময়। এক ঋষির দুই স্ত্রী—একজন ব্রাহ্মণ, অন্যজন শূদ্র। বৈদিক এক যজ্ঞানুষ্ঠানে তিনি তাঁর ব্রাহ্মণী স্ত্রীর সন্তানকে বিদ্যাদান করছিলেন শূদ্রাণী স্ত্রীর সন্তানকে উপেক্ষা করে। উপেক্ষিত সন্তানটি মার কাছে গিয়ে এ কথা জানাল। মা উত্তরে বললেন, "আমরা শূদ্র মহির (অর্থাৎ মাটির) সন্তান। ধরিত্রী ছাড়া আমাদের কোনও বন্ধু নেই।" এই বলে ধরিত্রী দেবীর শরণ নিলেন। দেবী এসে সন্তানকে নিয়ে চলে গেলেন মাটির গভীরে। বারো বছর সেখানে তিনি শিক্ষা দিলেন তাকে। বারো বছর পর বিদ্বান ছেলেটি ফিরে এল। রচনা করল ঐতরেয় ব্রাহ্মণ। পবিত্র শাস্ত্রগ্রন্থগুলোর মধ্যে এটি অন্যতম। পৌরাণিক এই উপাখ্যানটি খুবই তাৎপর্যময়। কেন না গল্পটিতে হিন্দু চিন্তার জগতে অনার্য সংস্কৃতির সাঙ্গীকরণের প্রক্রিয়াটি ফুটে উঠেছে। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে অনেক নতুন ভাব, নতুন তত্ত্বের কথা আছে। এতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। এ গ্রন্থ বিশুদ্ধ নান্দনিক সৃষ্টিকে বসায় উচ্চ আসনে। ঈশ্বর এক অনন্য শিল্পী। পার্থিব শিল্পগুলোর প্রেরণার উৎস হল ঐ অপার্থিব মহাশিল্প। পূজার অর্ঘ্য হিসেবে শিল্পকলা কিংবা পূজার উপায় হিসেবে শিল্পসৃষ্টি কিছুমাত্র ন্যূন নয়। অন্যত্র প্রকাশ পেয়েছে প্রগতি-প্রেম বা প্রগতির প্রশস্তি। এর মধ্যে এক সজীব আদর্শের জঙ্গম চরিত্রই প্রকাশ পায়।

উপনিষদের যুগেও যখন সংস্কৃতির নানা ধারার সমন্বয় চলছে, তখনও আমরা দেখতে পাই তপোবনের শ্রীবৃদ্ধি। বৃহদারণ্যক এবং আরও অন্য উপনিষদেও উল্লেখ দেখি বহু তপোবন বিদ্যায়তনের। বস্তুত উপনিষদের

আর এক নাম আরণ্যক। ভারতের নানান অঞ্চল থেকে আসা শিক্ষার্থী আর শিক্ষার্থিনীর উপস্থিতিতে সমৃদ্ধ এই তপোবন-বিদ্যাপীঠগুলো হিন্দু সংস্কৃতির বিস্তারে, এমনকি এর বিবর্তন আর সমন্বয়ী প্রক্রিয়ায় যে অতীব তাৎপর্যময় ভূমিকা নিয়েছিল এ বিষয়ে সন্দেহের কোনও অবকাশই নেই।

শিক্ষা একটি জনগোষ্ঠীর ধর্মের সঙ্গে যুক্ত সম্পূরকের ভূমিকা নেয়। সেই কারণেই প্রাসঙ্গিকভাবে প্রাচীন ভারতে শিক্ষা নিয়ে এই মন্তব্য করা গেল।

এবার আমরা ফিরে যাব ধর্ম বিষয়ের আলোচনায়।

১০

উপনিষদ ও গীতা

বৈদিক ধর্ম তার বিশদ জটিল যাগযজ্ঞের বিধি নিয়ে ক্রমশ জায়গা ছেড়ে দিল ব্রহ্ম ও আত্মার ঔপনিষদিক তত্ত্বকে। উপনিষদের কাল অনিশ্চিত। তবে সম্ভবত সেগুলো বেশিরভাগ রচিত হয়েছিল আনুমানিক আটশো (৮০০) খ্রিস্টপূর্বাব্দে বা তার পরে, কিন্তু বুদ্ধের আবির্ভাবের আগেই। কেননা তিনি এ গ্রন্থগুলোর দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন প্রবলভাবে। উপনিষদের সংখ্যা অনেক। তার মধ্যে সাধারণত ঈশ, কেন, কঠ, প্রশ্ন, মুণ্ডক, মাণ্ডুক্য, শ্বেতাশ্বতর, ছান্দোগ্য এবং বৃহদারণ্যক—এগুলোই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। চারটি বেদেরই নিজস্ব উপনিষদ আছে। প্রত্যেকটি উপনিষদের আদি মন্ত্রটি বেদ বিশেষের সঙ্গে এর সম্বন্ধের পরিচয়বাহী।*

ঔপনিষদিক শিক্ষা ব্রহ্ম এবং আত্মার তত্ত্বকে কেন্দ্র করে। ব্রহ্ম শব্দের তাৎপর্য উপলব্ধি করা খুব সহজ নয়। তাঁকে বর্ণনা করা হয়েছে এক ঐশী সত্তা রূপে যিনি সর্বজীবের মধ্যে প্রচ্ছন্ন, যিনি সর্বব্যাপী, সর্বজীবের আত্মা, সর্বদর্শী, সর্বভূতে বিরাজমান, যিনি সাক্ষী, যিনি জ্ঞানস্বরূপ, এক ও অদ্বিতীয় এবং গুণাতীত। ব্রহ্ম সর্বজনের শাসনকর্তা (কর্তা হলেও বস্তুত তিনি নিষ্ক্রিয়)। তিনি একটি বীজকে বহুগুণিত করেন (শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ, ৬, ১১-১২)। উপনিষদের প্রধান বাণী হল, আত্মা ও ব্রহ্ম অভিন্ন। পরম একই নিজেকে অভিব্যক্ত করেছেন প্রত্যেক জীবের মধ্যে। জন্মচক্রের আবর্তনের

* 'উপনিষদ ও গীতা'—দশম অধ্যায়ের এই বাক্যটিতে মনে হয় কিছু অস্বচ্ছতা রয়েছে। বস্তুত কোনও উপনিষদের আদি মন্ত্রেই সংশ্লিষ্ট বেদ-এর উল্লেখ বা নির্দেশ নেই। উপনিষদের উপক্রমণিকা বা ভূমিকা হিসেবে যে 'শান্তিপাঠ' যুক্ত হত তাতে বেদ-এর উল্লেখ আছে। মনে হয় আচার্য ক্ষিতিমোহন এখানে ঐ ভূমিকা বা 'শান্তিপাঠ'-এর কথাই বলেছেন। —অনুবাদক

শেষে মানুষ তার অন্তিম পরিণামে পৌছয় তার আত্মোপলব্ধি ঘটে।

ছান্দোগ্য উপনিষদে উদ্দালক আরুণি আর তাঁর পুত্র শ্বেতকেতুর কথোপকথনে ব্রহ্ম ও আত্মার ঐক্যের কথাটি সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে। বিদ্যাপীঠে বারো বছর অধ্যয়ন শেষ করে সদ্য ফিরে এসেছে আরুণি-পুত্র শ্বেতকেতু। তবু পিতার মত, বেদসহ নানা বিদ্যা অর্জন করলেও পরম সত্যের উপলব্ধি তার হয়নি। তারপর তিনি পুত্রকে যে দীর্ঘ উপদেশাবলী শুনিয়েছিলেন তারই থেকে কিছু উদ্ধৃত করা হল—

'সেখান থেকে আমাকে ন্যগ্রোধ (বটবৃক্ষ) গাছের একটি ফল এনে দাও।'

'প্রভু, এই যে এখানে।'

'এটাকে ভেঙে ফেলো।'

'ভাঙা হয়েছে প্রভু।'

'কী দেখছ ওখানে?'

'এই বীজগুলো, প্রায় অণুর অণু।'

'ওদের একটাকে ভাঙো।'

'ভাঙা হয়েছে প্রভু।'

'ওখানে কী দেখছ?'

'প্রভু, কিছুই দেখা যাচ্ছে না।'

তখন পিতা বললেন, "বৎস, ঐ অতি সূক্ষ্ম সারাৎসার যা তোমার চোখেই পড়ছে না, ওর থেকেই ঐ বিশাল ন্যগ্রোধ বৃক্ষের আবির্ভাব। বৎস, বিশ্বাস করো, এই যে সূক্ষ্ম সত্তা এরই মধ্যে সকল অস্তিত্বের মূল। এই হল পরম সত্য, পরমাত্মা। এবং বৎস শ্বেতকেতু, তুমিও এই।'

পুত্র বলল, "প্রভু, অনুগ্রহ করে আরও কিছু উপদেশ দিন।"

পিতা উত্তরে বললেন, "তথাস্তু। এই লবণটুকু জলের মধ্যে ফেলে দাও। তারপর কাল সকালে আমার জন্য অপেক্ষা করো।"

আদেশ অনুযায়ী পুত্র তার করণীয় করল। পিতা বললেন, "গত রাত্রে যে লবণটি জলে নিক্ষেপ করেছিলে সেটি আমার কাছে আনো।" পুত্র লবণের সন্ধান করে পেল না, কেন না অবশ্যই সেটি জলে গলে গেছে।

পিতা বললেন, "জলের উপরের অংশের স্বাদ নাও। বলো, কেমন এর আস্বাদ?"

পুত্র বলল, "লবণাক্ত।"

'এখন তুমি আস্বাদ নিয়ে দেখো এর মাঝের অংশ কেমন লাগছে?'

পুত্র জানাল, "লবণাক্ত।"

'এবার তুমি নিচের অংশের আস্বাদ নাও। কেমন এর আস্বাদ?'

পুত্র বলল, "লবণাক্ত।"

পিতা বললেন, "এবার ওটা ছুড়ে ফেলে দাও। তারপর প্রতীক্ষায় থাকো আমার।"

সে আদেশ পালন করল। লবণ কিন্তু রয়েই গেল চিরকালের জন্যে।

অতঃপর পিতা বললেন, "বৎস, এখানেও, এই দেহের মধ্যে যিনি সৎ তাঁকে দেখতে পাও না তুমি, এ বিষয়ে সন্দেহমাত্র নেই। কিন্তু তিনি যথার্থই উপস্থিত। এই সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম সারাৎসার—এঁরই মধ্যে বর্তমান বিশ্বের যাবতীয় অস্তিত্ব। ইনি সৎ। ইনি পরমাত্মা। বৎস শ্বেতকেতু! তুমিও তিনিই।"

(ছান্দোগ্য উপনিষদ, ৬, ১২-১৩)

যোগসূত্র অতি ক্ষীণ, অতি সামান্য হলেও এবং বিষয় বহুদূরে সরে এলেও এই তত্ত্বটির জন্মমূল যাগযজ্ঞময় বৈদিক ধর্মের মধ্যেই। কোনও প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষায় যাগযজ্ঞ করা, এমনকি অন্য প্রাণীদের ক্ষতিসাধন করেও, শুধু মানুষের বন্ধনকেই আরও দৃঢ় করে তোলে। উপনিষদের মতে মানুষের লক্ষ্য হল নিজেকে জানা—আত্ম-উপলব্ধি। যিনি সমস্ত কিছুকে পরিব্যাপ্ত করে আছেন সেই এক এবং অদ্বিতীয় ব্রহ্মকে উপলব্ধি করলেই সব শৃঙ্খল থেকে মুক্ত হওয়া যায়। তখন সচ্চিদানন্দকে জীবনের সার বলে বোঝা যায়। এই উপলব্ধিতে যে পূর্ণতা আসে তা স্বর্গসুখের আকাঙ্ক্ষাকে অতিক্রম করে যায়। ভগবদ্গীতাতেও এ কথাই বলা হয়েছে। আমাদের অহংকারের ফলেই যত দুঃখ যত সীমাবদ্ধতা। এর মূলে আছে অবিদ্যা। তাই মানুষের কাম্য হল জ্ঞান। যার বিপরীত প্রান্তে রয়েছে ঘৃণা, অনিষ্টসাধন, লোভ। এইভাবে উপনিষদের তত্ত্ব মানুষের নৈতিক আচরণের একটি ভিত্তি রচনা করে দেয়। ঔপনিষদিক তত্ত্বের সারকথাটি বলা হয়েছে ঈশোপনিষদে—"এই বিশ্বে যা কিছুর চলাচল সবই সেই পরম আত্মায় নিহিত। সর্বস্ব সমর্পণ করলেই তুমি আনন্দ উপভোগে সমর্থ হবে। অন্যের সম্পদে লোভ কোরো না। ... যিনি সমস্ত জীবকে নিজের মধ্যে এবং

নিজেকে সমস্ত জীবের মধ্যে দেখেন তিনি কাউকে ঘৃণা করেন না। যিনি জানেন সেই পরম আত্মাই সব হয়েছেন, যিনি সেই ঐক্যকে প্রত্যক্ষ করেছেন তাঁর দুঃখ কোথায়, তাঁর সংকট কোথায়।'

এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে লক্ষ্য করার বিষয় এই যে, বেদ-পরবর্তী দর্শনগুলোতে (উপনষিদ, ভদবদ্গীতা, বৌদ্ধ এবং জৈন) মানুষই হয়েছে আকর্ষণের কেন্দ্র, দেবতারা গৌণ হয়ে গেছেন। বৌদ্ধ শিল্পে ও সাহিত্যে দেবতারা মহামানবদের মাথায় ছাতা ধরে থাকেন কিংবা ফুল ছড়ান, কখনও বা শাঁখ বাজান। মহাকাব্যগুলোতে রাম এবং কৃষ্ণ মানুষ, যদিও ঈশ্বরের অবতার হিসেবে তাঁরা দেবোপম। মাহাকব্যগুলোতে দেবতারা তাঁদের সেবক। মোটের উপর, আমরা দেখি এই যুগে যাগযজ্ঞ জায়গা ছেড়ে দিয়েছে নৈতিক আচরণ-বিধিকে, একেশ্বরবাদ স্থান নিয়েছে বহু ঈশ্বরবাদের, আর বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ডের জায়গায় দেখা দিয়েছে জ্ঞান ও ভক্তির[১] প্রতি ক্রমবর্ধমান আগ্রহ। এই পর্বে আমরা দেখি ভারত-সংস্কৃতিতে বৈদিক আর অবৈদিক উপাদানের সম্মিলন আর সমন্বয়ের প্রক্রিয়া। এই সাংস্কৃতিক সমন্বয়ের ফল সত্যিই চমকপ্রদ। শোপেনহাওয়ার (Schopenhauer) লিখলেন, "সমগ্র বিশ্বে উপনিষদের মতো এমন হিতকারী, এমন উৎকর্ষসাধক জ্ঞানসাধনার দৃষ্টান্ত আর নেই। এ গ্রন্থ আমার জীবনের আশ্বাস—আশ্বাস আমার মরণেও।"[২] এই প্রশস্তি হয়তো একটু বেশি উচ্ছ্বসিত, কিন্তু এ সম্বন্ধে কোনোই সন্দেহ নেই যে আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব অষ্টম শতাব্দীর এই সৃষ্টি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ অসাধারণ ধর্মগ্রন্থগুলোর অন্যতম।

১. বৈদিক যাগযজ্ঞে ব্রাহ্মণদেরই একচেটিয়া অধিকার ছিল। কিন্তু উপনিষদে ক্ষত্রিয়দের ক্রমবর্ধমান প্রাধান্যের পরিচয় পাওয়া যায়। বহু বিতর্কসভা ও সম্মেলনের বিবরণে দেখা যায় উপদেষ্টারা ক্ষত্রিয় শ্রেণির। বৈদিক আচার-অনুষ্ঠানে নারীর সামাজিক মর্যাদা ছিল কম। কিন্তু উপনিষদে দেখি পুরুষের সঙ্গে তাঁরা সমমর্যাদায়। অবশ্য বিশিষ্ট পুরুষদের তুলনায় বিশিষ্ট নারীর সংখ্যা কম। জীবন সম্বন্ধে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক প্রশ্নের একটি এসেছে এক নারীকণ্ঠ থেকেই। ইনি যাজ্ঞবল্ক্যের স্ত্রী মৈত্রেয়ী। তিনি প্রশ্ন করেছিলেন, "প্রভু, ঐশ্বর্যপূর্ণ সমগ্র পৃথিবী যদি আমার হত তবে কি অমরত্ব লাভ করতে পারতাম আমি?" উত্তরে যাজ্ঞবল্ক্য বলেছিলেন, "না, তোমার জীবন হত ধনীদেরই মতো। কিন্তু ঐশ্বর্য দিয়ে অমরত্ব লাভের কোনও আশা নেই।" শুনে মৈত্রেয়ী বলেছিলেন, "যা দিয়ে অমৃতলাভ হবে না তা নিয়ে কী করব আমি!" (বৃহদারণ্যক উপনিষদ্, ২, ৪, ২-৩)। এ গ্রন্থের তৃতীয় ভাগে উদ্ধৃত গার্গী–যাজ্ঞবল্ক্য সংলাপ দ্রষ্টব্য।

২. Will Durant-এর উদ্ধৃতি। *The Story of Civilization,* Volume 1, New York, 1942, p. 410.

ভগবদ্‌গীতাও এক অসাধারণ ধর্মগ্রন্থ, এক অসামন্য কীর্তি। এ গ্রন্থ পাশ্চাত্যে উপনিষদের চেয়ে বেশি পরিচিত, একটু ভিন্নভাবে। উপনষিদ থেকেই এর বিকাশ। অর্থাৎ সর্বব্যাপী ব্রহ্ম ও আত্মার অভেদ তত্ত্বটিই এর ভিত্তি। কিন্তু এখানে গুরুত্ব পেয়েছে কর্ম আর আচরণ-বিধি।

শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা, সংক্ষেপে গীতা কথাটির মানে হল ঈশ্বরের স্তবজ্ঞান। অসাধারণ মহাকাব্য মহাভারতের এটি একটি অঙ্গ। কুরুক্ষেত্রের মহাযুদ্ধে একেবারে নাটকীয়ভাবে এর সূচনা। যুদ্ধ তখনও আরম্ভ হয়নি। পাণ্ডবপক্ষের বীরশ্রেষ্ঠ অর্জুন আর তাঁর সারথি ঈশ্বরের অবতার কৃষ্ণ—এই দুই জনের মধ্যে যে কথোপকথন তারই বিবৃতির আকারে লেখা এই গীতা। যুদ্ধ আর তার ফলস্বরূপ ব্যাপক প্রাণহানির চিন্তা অর্জুনের বিবেক একেবারে বিমুখ। একই রাজবংশের দুই শাখার মধ্যে বিবাদ, তাই অর্জুন দেখছেন অপরপক্ষে শুধুই আত্মীয় আর বন্ধু। কৃষ্ণকে তাঁর উদ্‌বেগের কথা জানিয়ে বলছেন, "হে কৃষ্ণ, হে গোপাল, জয়, রাজ্য, সুখ কিছুই আমার কাম্য নয়। রাজত্ব নিয়ে কী হবে আমার? সুখ বা জীবন নিয়েই বা কী হবে? যাদের জন্য আমার রাজ্যসুখ তারা আমারই সামনে ব্যূহে দাঁড়িয়ে তাদের জীবন, ধনসম্পদ সবকিছু বলি দিবে। কেউ আচার্য, কেউ গুরুজন, উত্তরসূরি, প্রবীণের দল, খুল্লতাত, শ্বশুর, পৌত্র, শ্যালক, আরও কত আত্মীয়বর্গ। হে মধুসূদন, তারা আমাকে আঘাত করলেও আমি শুধু পৃথিবী কেন, ত্রিলোকের রাজত্বের জন্যও আঘাত করতে অনিচ্ছুক।' (প্রথম অধ্যায়, শ্লোক ৩২-৩৫)। কৃষ্ণ উত্তরে জানালেন যে, যোদ্ধা হিসেবে অর্জুনের কর্তব্য পালন করাই উচিত। অর্জুনের ব্যক্তিগত কর্মের নৈতিক সমস্যা থেকে কৃষ্ণ চলে গেলেন মানুষের ব্যক্তিগত কর্তব্য, সামাজিক আচরণের সমস্যায়, সেই সঙ্গে মানবিক আচরণবিধির সাধারণ প্রশ্নে। তিনি বললেন, কর্মহীন অবস্থায় থাকা মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়, বাঞ্ছিতও নয়। কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ কথা হল, মানুষ যেন নিজের কর্মের মধ্যে, নিজের অহংকারে, নিজের বাসনায় কিংবা নিজকর্মের ফলের প্রত্যাশায় বদ্ধ হয়ে না পড়ে। 'তোমার করণীয় কর্ম সম্পাদন করো, যেহেতু নৈষ্কর্ম্যের চেয়ে কর্ম ভাল, নৈষ্কর্ম্যে শরীর রক্ষার কাজ সম্পাদন করাও সম্ভব নয়।' 'হে পার্থ! যারা (পার্থিব) সুখ আর ক্ষমতায় প্রবলভাবে আকৃষ্ট হয়, যাদের মন অভিভূত হয় সুখ আর ক্ষমতার অভিলাষে, বিশেষ কর্ম সম্পাদনের নির্দেশের

বাগাড়ম্বরে, বিশেষ কর্মের ফলেই জন্মলাভ সম্ভব এই ফাঁপা আশ্বাসে, যাদের মন বাসনাময়, স্বর্গকামী, যারা বেদবাক্যেমুগ্ধ, তারা কখনও সুস্থিত ধ্যানের উপযোগী অবিচল ধীশক্তিসম্পন্ন মনের অধিকারী হতে পারে না। ... তোমার শুধু কর্মের সঙ্গেই সম্বন্ধ, কখনোই কর্মফলের সঙ্গে নয়। কর্মফলে লোভ যেন তোমার কর্মসম্পাদনের উদ্দেশ্য না হয়। আবার নৈষ্কর্ম্যেও যেন তোমার আসক্তি না থাকে (দ্বিতীয় ও তৃতীয় অধ্যায়)।

কৃষ্ণ আত্মার অবিনশ্বরতার কথাও বলেছেন। 'প্রাজ্ঞ ব্যক্তিরা কখনও মৃত বা জীবিত কারও জন্যই শোক করেন না। এই আত্মা কখনও জাত বা মৃত হন না। যিনি এই সব কিছুকে পরিব্যাপ্ত করে আছেন সেই অবিনাশীর কোনও ক্ষয়সাধন সম্ভব নয়।' (দ্বিতীয় অধ্যায়)।

১১

সাংস্কৃতিক সমন্বয় এবং ভারতীয় জীবনে তার প্রভাব

উপনিষদের দার্শনিক এবং দূরকল্পনাজাত যে সমন্বয় তা প্রধানত সীমাবদ্ধ ছিল সমাজের উচ্চকোটির মানুষের মধ্যেই। খুব দুঃখের বিষয়, ভারত-সংস্কৃতির এই দিকটি নিয়ে লেখা সর্বাধুনিক বইগুলোতেও অপেক্ষাকৃত শিক্ষিত সমাজের ধর্মজীবনের কথাই আছে। সাধারণ মানুষের জীবনে বিচিত্র সংস্কৃতির প্রভাব আর সেখানে নানান উপাদানের সমন্বয় সেও তো কম মনোহারী নয়। তাই প্রাচীন ভারতের লৌকিক সংস্কৃতি ও লৌকিক ধর্ম সম্বন্ধে দু-এক কথা বলা এখানে অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

ভক্তিমার্গ ব্যাপারে বেদ নিতান্তই অনুদার। হিন্দুধর্মে ভক্তিবাদের উত্থানের ব্যাখ্যা পাওয়া যাবে অবৈদিক সংস্কৃতির প্রভাবের মধ্যে। পদ্মপুরাণের মতে ভক্তিবাদের উদ্ভব দক্ষিণে, অর্থাৎ দ্রাবিড়দের দেশে। এই ভক্তিবাদ নতুন এক গুরুশ্রেণির জন্ম দিল প্রাচীন বৈদিক আচার্যদের জায়গায়। আর সেই সঙ্গে শিক্ষার কেন্দ্রও সরে এল যজ্ঞস্থল থেকে সর্বসাধারণের তীর্থক্ষেত্র আর পুণ্যস্নানের স্থানগুলোতে। যজ্ঞবেদির বদলে গড়ে উঠল তাদের বিশেষ দেবতার মন্দির। বেদে প্রতিমা-পূজার কথা বিশেষ নেই। এই সংযোজন বস্তুত অবৈদিক।

ভারতের বহু রকমের জাতির মধ্যে কেউ নদীর পূজা করে, কেউ-বা পাহাড় বা গাছের। আবার কেউ-বা প্রাণী-পূজক। এর প্রত্যেকটি ধর্মবিশ্বাসই হিন্দুধর্মকে প্রভাবিত করেছে। অন্তত এর বিপুল পরিসর দেহে স্থান করে নিয়েছে নিজের। গণেশ বা গণপতির (যিনি জনগণের দেবতা) দেহ মানুষ আর হাতির মিলিত রূপ। কখনও-বা জনগণের ভাবাবেগকে একটু প্রশ্রয় দেয়া হয়েছে বৈদিক যাগযজ্ঞের আগে এই সব জনপ্রিয় পূজার্চনাকে জায়গা করে দিয়ে। সংখ্যালঘু আর্যদের এই বিজ্ঞ ব্যবস্থার প্রশংসাই করতে হয়।

শিব হলেন আর এক অনার্য দেবতা। তাঁকেও হিন্দু দেবলোকে স্থান দেয়া হয়েছে। শবর, কিরাত এই সব অপেক্ষাকৃত আদিম উপজাতিরা শিবের উপাসক ছিল মনে হয়। তবে সিন্ধু উপত্যকার নাগরিক সমাজেও এঁর পূজার সম্ভাব্য নিদর্শন পাওয়া গেছে। সমন্বয়ের এই প্রক্রিয়ার চর্চায় বোঝা যায়, অনেক বিরুদ্ধতা, অনেক প্রতিরোধের পরেই গোঁড়া সম্প্রদায় শিবকে স্বীকার করেছিল। শিবের পূজার সঙ্গে লিঙ্গপূজার সংযোগ ঘটল পরবর্তীকালে। এতে অবশ্যই ব্যাপ্তি ঘটে গেল শৈবধর্মের। এই ধরনের পূজায় প্রথম প্রথম যতই সারল্য থাকুক পরবর্তীকালে কিন্তু নানান তত্ত্ব আরোপে তৈরি হয় এক জটিল দর্শন। একই কথা বলা যায় আর এক লৌকিক দেবী কালী সম্বন্ধে। কালীর আবির্ভাব বিশ্বের মাতৃশক্তিরূপে। সিন্ধু উপত্যকার সভ্যতায় এই রকম অনেকগুলো দেবীমূর্তি পাওয়া গেছে। কালীপূজার উদ্ভবের সঙ্গে এগুলোর সম্বন্ধ থাকতে পারে। এর কতগুলোতে কালীর ভয়ালমূর্তি দেখা যায়। প্রসঙ্গত বলি, কুখ্যাত ঠগীরাও (দস্যু) ছিল কালীর উপাসক। কিন্তু আশ্চর্য ব্যাপার, কোনও কোনও দর্শনে তিনি দয়াবতী, সর্বংসহা, পরমাশক্তি, কখনো-বা তিনি নিরাকারা, গুণাতীতা—ব্রহ্মের ধারণার সঙ্গে যা প্রায় মিলে যায়।

শিবকে প্রথমে যুক্ত করা হয়েছিল রুদ্রের সঙ্গে। রুদ্র হলেন বেদের ঝঞ্ঝার দেবতা। পরবর্তী সময় উর্বরতার অনুষঙ্গ ছাড়াও তাঁকে যোগের দেবতা (যোগেশ্বর) হিসেবে দেখা হয়েছে, আর দেখা হয়েছে সৃষ্টি আর ধ্বংসের অধিদেবতা, বিশ্বনৃত্যের নটরাজরূপে। লৌকিক দেবতাদের একজন এই শিব কালীরই মতো ক্রমশ সেই পরম একের ব্যক্তিরূপ হয়ে বিশেষ এক উপাসক সম্প্রদায়ের সামনে এসে দাঁড়ালেন কেমন করে সেটা আমরা বুঝতে পারি। মূলের অসংস্কৃত ধারণা বা কল্পনার বিষয়কে মার্জিত বা আদর্শায়িত করে এক মহিমান্বিত রূপ দেয়া, নিরাকার নির্গুণ একককে বিচিত্র ব্যক্তিরূপে ফুটিয়ে তোলা—এই ক্ষমতার মধ্যেই হিন্দুধর্মের স্বভাবগত বৈশিষ্ট্যের পরিচয় মেলে।[১]

১. পরবর্তী হিন্দু পুরাণে ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং মহেশ্বর (শিব) পরম একের তিনটি দিকের প্রতিভূ হয়ে এক ত্রয়ীর রূপ রচনা করেছেন। ব্রহ্মা সৃষ্টিকর্তা, বিষ্ণু পালনকর্তা আর শিব বিশ্বের সংহারকর্তা। আবার নতুন সৃষ্টির জন্য প্রয়োজন শেষোক্তের। এই তিন দেবতার মধ্যে সম্ভবত ব্রহ্মার পূজাই সবচেয়ে প্রাচীন। বেদে তাঁর সাক্ষাৎ পাই প্রজাপতি, পিতামহ এবং হিরণ্যগর্ভ নামে। ব্রাহ্মণগুলোতে তিনি প্রাধান্য পেয়েছেন। কিন্তু ক্রমশ তাঁর গুরুত্ব কমেছে। বর্তমানে ব্রহ্মার উপাসক নিতান্তই অল্পসংখ্যক। যদিও ত্রিমূর্তির একজন হিসেবে এখনও তিনি গ্রাহ্য। ব্রহ্মার জনপ্রিয়তা কমেছে মন্দির নির্মাণ হিন্দু ক্রিয়াকলাপে মর্যাদা পাবার আগেই। এটা লক্ষণীয়, ব্রহ্মার নামে উৎসর্গীকৃত মন্দিরের সংখ্যা নিতান্তই নগণ্য। এদিক থেকে বিষ্ণু বা শিবের অবশ্য ক্ষোভের কোনও কারণ নেই।

এই প্রসঙ্গে বলা দরকার যে, প্রতিমা-পূজা আর পৌত্তলিকতা অবধারিতভাবে এক জিনিস নয়। যদিও পশ্চিম দেশের আলোচকরা এ দুটিকে অভিন্নই ভেবে নিয়েছেন (দ্রষ্টব্য পঞ্চম অধ্যায় পাদটীকাসহ)। যিনি নিরাকার তাঁর প্রতি নিগূঢ় প্রেম আর ভক্তির আকুতিই যেন রূপ ধরে দেবতার প্রতিমায়। যদিও ধর্মীয় জীবনে এগুলোর ব্যবহার শুধু সহায়করূপে। 'প্রত্যেকটি হিন্দু আশা করে এক দিন প্রতিমার প্রয়োজন ফুরোবে।' সর্বব্যাপী ব্রহ্মের স্বরূপকে ধরা মানুষের স্বভাবত-সীমাবদ্ধ মনের পক্ষে বড় কঠিন। তাই তাঁকে বিশেষরূপে এমনকি ব্যক্তিরূপে দেখার প্রয়োজন ঘটে।

যেটা লক্ষণীয়, বেদে এত দেবতার কথা আছে, কিন্তু সেখানে প্রতিমা বা মূর্তি নেই। সিন্ধু উপত্যকার সভ্যতায় বহু মূর্তি দেখা যায়, তাই বোঝা যায় এই প্রতিমা-পূজা অবৈদিক সংস্কৃতির দান। কেউ কেউ মনে করেন এটি ভারতীয় জীবনে গ্রিক প্রভাবের ফল। আলেকজান্ডারের আক্রমণের পর সে প্রভাব বেশ প্রবল ছিল। মনে করা হয় বৌদ্ধ পৃষ্ঠপোষকতায় ও প্রেরণায় গ্রিকরাই বুদ্ধের প্রথম মূর্তিগুলো করে। এই তত্ত্ব বা সিদ্ধান্ত (ভারতে মূর্তি পূজা বা মূর্তিনির্মাণ প্রসঙ্গে) পুরোপুরি সন্তোষজনক নয়। কেন না ভারতে মূর্তি পূজার প্রচলন ছিল গ্রিক-বৌদ্ধ গান্ধার ঘরানার ভাস্কর্যের বিকাশের আগেই। বস্তুত মহেঞ্জোদারোতে মূর্তিপূজার সাক্ষ্যই বলে দেয় যে, ভারতে এর চল ছিল অন্তত খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় সহস্রাব্দ থেকেই। অবশ্য এ বিষয়ে সন্দেহ নেই যে মহাযান বৌদ্ধধর্ম হিন্দু প্রতিমা-পূজাকে সমৃদ্ধ করেছে।

হিন্দু প্রতিমার একটি বিশেষত্ব হল শাস্ত্রের বিধান অনুসারে দেব-প্রতিমাকে হতে হবে তারুণ্যময়। ভারতে কোনও প্রবীণ-বয়স্ক দেব-দেবী নেই। এ ছাড়া প্রতিমা-শিল্পীর প্রধান লক্ষ্য ছিল 'ভাব'-এর প্রকাশ, অঙ্গসংস্থানের যথার্থ্য নয়।

প্রতিমা-পূজার সঙ্গে লৌকিক হিন্দুধর্মের অন্য বিশেষত্ব হল বিশদ আচরণ-বিধি, নীতি-নির্দেশ, উদ্‌যাপন। অহিংসার আদর্শ, বিশেষ করে বৌদ্ধ ও জৈনধর্মের হিন্দু সমাজের একটা বড় অংশকে নিরামিষাশী করেছে। ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের সংখ্যা এত বিপুল যে, বিদেশি পর্যটকেরা অনেক সময় দেখে বিস্মিত হয়। এই প্রসঙ্গেই মনে পড়ে, মার্কো পোলো নামে এক ইতালীয় পর্যটক অবাক হয়েছিলেন ভারতের পূজার্চনার অনুষ্ঠান দেখে। তাঁর

মনে হয়েছিল এ সব নিছক পৌত্তলিকতা। কিন্তু তিনি একই সঙ্গে অবাক হয়েছিলেন হিন্দুধর্মের নৈতিক আচারণবিধিগুলো দেখে। মার্কো পোলো লিখেছেন, "এদের আর একটি আচার হল, নারী পুরুষ নির্বিশেষে এরা সকলেই দিনে দুই বার ঠান্ডা জলে স্নান করে—সকাল আর সন্ধ্যায়। ...এমনিভাবে তারা শুধু নিজের নিজের পাত্র থেকেই জল পান করে, অন্যের পাত্র থেকে কেউ জল পান করে না।'[২]

অনেকগুলো বিধিনিষেধই স্পষ্টত এসেছে পরিচ্ছন্নতার বোধ আর স্বাস্থ্যরক্ষার স্বার্থে। যাযাবর শ্রেণির মানুষের অবশ্য কৃষিজীবী অথবা নাগরিক সমাজের অতি প্রয়োজনীয় নিয়মকানুন মানার দরকার হয় না। বৈদিক যুগে যখন আক্রমণকারীরা প্রথম কৃষিকাজে এগিয়ে এল তখন এমন কিছু রোগের উল্লেখ পাই যা অসাবধানী যৌথজীবনের ফল। পরবর্তী 'স্মৃতি'র যুগে বিপুল সংখ্যক নিয়মকানুন তৈরি হয়েছিল। এই নাগরিক নিয়মকানুন কাজ করত ধর্মের ভিত্তিতেই। এমনকি কখনও ধর্মের অনুমোদন থাকত। এই সব স্বাস্থ্যবিধি ছাড়াও নানান উপজাতির, সম্প্রদায়ের বিচিত্র ঐতিহ্যকে আত্মসাৎ করা হয়েছে। সেগুলো হিন্দুধর্মের রীতিনীতির মূল দেহের অঙ্গীভূত হয়ে গেছে, যদিও ঐতিহাসিক উৎস আদিম বিশ্বাস, অলীক কাহিনি আর জাদুবিদ্যার জগতে।[৩]

লৌকিক আচার-অনুষ্ঠান আত্মসাৎ করে নেয়া ছাড়াও সনাতন হিন্দুধর্ম ক্রমশ বহু লৌকিক দেবদেবীকেও গ্রহণ করে নিল। বেদের যুগ থেকে হিন্দু পৌরাণিক জগতের বিবর্তন বেশ একটা উদ্দীপক গবেষণার বিষয়। এ ছাড়াও বৈদিক যজ্ঞের বদলে ধর্মানুষ্ঠানের যে সাধারণ সর্বজনীন পদ্ধতি পূজা আজ প্রায় সারা দেশে প্রচলিত, তাও সম্ভবত এসেছে দ্রাবিড়দের কাছ থেকেই। কায়াযোগ সাধনার মূল কথা হল দেহস্থিত চক্র (সংখ্যায় ছয়) বেদ করে সিদ্ধিলাভ করা। এই সবই হিন্দুধর্মের উপর লৌকিক ধর্মের প্রভাবের পরিচয় দেয়।

২. R.E. Latham. Penguin Books, 1958 p. 239 (ইংরেজি অনুবাদ গ্রন্থ থেকে)।

৩. লৌকিক হিন্দুধর্মে গো-জাতির পবিত্রতার যে ধারণা তার উৎস খুব একটা নিশ্চিত নয়। আর্যরা গোমাংস খেতে ভালবাসত। যদিও উপকারী প্রাণী হিসেবে সম্ভবত গোরুর প্রশংসাও করত সম্ভবত। ভারতের পল্লীজীবনে গোরুর গুরুত্ব হয়তো কোনোভাবে কাজ করেছে এখানে।

বৈদিক মন্ত্রগুলো সবই দেবতাদের প্রশস্তি। তাঁদের তুষ্টিসাধনই চিরদিনের অভীষ্ট। মহাকাব্যগুলোতে এই প্রশস্তি হয়ে উঠেছে সমকেন্দ্রিক অর্থাৎ সেখানে মানুষেরই প্রশস্তি। রামায়ণ, মহাভারতে তাদের মাহাত্ম্যের কথা আছে। পরবর্তী পরিচ্ছেদে আমরা এ প্রসঙ্গে আসব। দেবতা আর মানুষের মধ্যস্থ হলেন অবতার। এই অবতার-তত্ত্ব অবৈদিক এবং সম্ভবত অনার্য।[৪] এটিকে বৈদিকযুগের দৈব-নির্ভরতা কাটিয়ে জীবনের দিকে একটু অগ্রগতি বলেই মনে হয়। ছান্দোগ্য উপনিষদে এক কৌতুককর কাহিনি আছে। বৈদিক যুগের প্রতাপশালী দেবতা ইন্দ্র সেখানে ছাত্র, যাকে সূক্ষ্ম জটিল ব্রহ্মবিদ্যা অতি কষ্টে আয়ত্ত করতে হচ্ছে (ছান্দোগ্য উপনিষদ, ৮, ৭-১৫)। অনার্যদের সংস্কৃতির প্রভাব নিশ্চিতভাবেই বৈদিকধর্মকে খানিকটা মানবিক করে তুলেছে।

৪. অবতারবাদের উৎপত্তি অস্পষ্ট। বেদে এর সাক্ষাৎ পাওয়া যায় না। কিন্তু এমনও হতে পারে ইরানে বসবাসকারী আর্যদের কাছ থেকে এটি এসেছে। এই সবিরাম (বিচ্ছিন্ন) দেহধারণের ভাবনা দেখা যায় 'বহ্রাম যাস্ত' (Bahram Yasht)-এ। এটি জোরস্ত্রীয় (Zoroastrian) সংকলনের একটি অংশ। সেখানে 'বেরেত্রগ্ন' (Verethragna) নামে দেবতার অবতারদের দেখা যায়। অন্য এক মতে এর উদ্ভব মধ্য এশিয়ায়, যেহেতু 'বহ্রাম যাস্ত'-এ চৈনিক প্রভাব আর পুরাণের চিহ্ন পাওয়া যায়। অবশ্য এই বিশ্বাসের কোনোটিতেই এই ধারণার ততখানি গুরুত্ব নেই যতখানি আছে বেদোত্তর হিন্দুচিন্তায়, বিশেষত রামায়ণ আর মহাভারত এই দুই মহাকাব্যে। ভগবদ্গীতায় যিনি নিজের স্বরূপ প্রকাশ করেছেন সেই ঈশ্বরের অবতার কৃষ্ণ যেহেতু অবৈদিক অনার্য হিন্দু দেবতা, তাই অনার্য ভারতীয় চিন্তায় দীর্ঘকাল ধরেই অবতারবাদের ধারণা থাকাটা আদৌ অসম্ভব নয়।

১২

জৈনধর্ম ও বৌদ্ধধর্ম

আগের কয়েকটি অধ্যায়ে আমরা দেখেছি কিভাবে বৈদিক আর অবৈদিক সংস্কৃতির ধারা মিলিত হয়ে ভারতে নতুন সংস্কৃতির ধারা সৃষ্টি করে তুলেছিল আটশো খ্রিস্টপূর্বাব্দের কাছাকাছি সময়। সাংস্কৃতিক বিবর্তনের এই সময়টি ছিল নানান ধর্মমত আর ধারণায় আচ্ছন্ন। বিচিত্র দার্শনিক চিন্তাধারার মধ্যে লোকায়ত ধারাও বিকাশ ঘটেছিল। এর সবচেয়ে পরিচিত প্রবক্তা হলেন চার্বাক। এই সম্প্রদায়ের মতে ইন্দ্রিয়লব্ধ তথ্যই জ্ঞানের একমাত্র উৎস। স্বভাবতই চার্বাক দর্শন সমগ্র হিন্দু অধিবিদ্যাকেই প্রশ্নের সামনে দাঁড় করিয়েছিল[১] চার্বাকের একটি বচন বহুপরিচিত ভারতীয় প্রবাদে পরিণত হয়েছে—'যাবৎ জীবেৎ সুখং জীবেৎ ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ। ভস্মীভূতস্য দেহস্য পুনরাগমনং কুতঃ'—'যতদিন বাঁচো সুখে বাঁচো, ঋণ করেও ঘি খাও। আগুনে ছাই-হওয়া দেহের পুনরাগমন কোথায়?' মরণের পরবর্তী জীবন আর পুনর্জন্মের তত্ত্বকে এইভাবে বাতিল করে দেয়ার দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় মহাকাব্যগুলোতে কোনও কোনও পণ্ডিতের শিক্ষার মধ্যে। রামায়ণে জাবালি নামে এক ব্রাহ্মণের কথা পাই। তিনি মহাকাব্যের নায়ক রামচন্দ্রকে তাঁর রাজ্য ত্যাগ না করার উপদেশ দেন। তাঁর কথা—

১. দ্রষ্টব্য R. Garbe, *'Lokayata', Encyclopedia of Religion and Ethics.* Ed, Hastings, vol.VIII, 'ভারতে প্রাক্ বৌদ্ধযুগে বিশুদ্ধ বস্তুবাদের শিক্ষকদের উপস্থিতির স্পষ্ট নিদর্শন রয়েছে। এবং নিঃসন্দেহে বলা যায় এই সব বস্তুবাদী তত্ত্বের অসংখ্য অনুসারী সেই সময় থেকে বর্তমানকাল পর্যন্ত ভারতে রয়েছে। ... লোকায়তবাদ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যকেই জ্ঞানলাভের একমাত্র উপায় বলে মনে করে এবং অনুমানকে বর্জন করে। চারটি ভূত বা পদার্থকে এ মতবাদ একমাত্র বাস্তব বলে স্বীকার করে। এর শিক্ষা হল—এই উপাদানগুলোর সমন্বয়ে যখন দেহ গড়ে ওঠে তখনই আত্মা বা চৈতন্যের সৃষ্টি হয়, ঠিক যেমন বিশেষ কতকগুলো বস্তুর মিশ্রণ জন্ম দেয় উত্তেজক শক্তির। শরীর বিনষ্ট হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আত্মাও ফিরে যায় নাস্তিত্বে। ... বেদকে এরা বলেছে নির্লজ্জ নিষ্কর্মার আবোলতাবোল বকুনি, যার তিনটি মারাত্মক দোষ—অসত্যতা, স্ববিরোধ আর অনর্থক পুনরাবৃত্তি (পৃ. ১৩৮)।

'তাদের জন্য দুঃখ হয় আমার, যারা এই জাগতিক সুখ ছেড়ে মৃত্যুপারের সুখের জন্য পুণ্যার্জনের চেষ্টা করে আর অকালে মরণের কোলে ঢলে পড়ে, অন্যদের জন্যে আমার দুঃখ নেই। পরলোকগত পূর্বপুরুষদের উদ্দেশে শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য মানুষ প্রতি বছর খাদ্য আর নানান মূল্যবান সামগ্রীর অপচয় করে। হে রাম! মৃত মানুষ কখনও কি আহার গ্রহণ করেছে? যদি একজন খাদ্য গ্রহণ করলে অন্যের পুষ্টি সম্ভব হত, তাহলে আর যাত্রীদের পাথেয় সঙ্গে নেয়ার দরকারই হত না। আত্মীয়রা বাড়িতে তার নামে একজন ব্রাহ্মণকে খাইয়ে দিলেই চুকে যেত।

'হে রামচন্দ্র! এই শাস্ত্রীয় বিধিগুলো তৈরি করে সেই সব পণ্ডিত যারা অন্যকে দান করতে বাধ্য করার কাজে বেশ দক্ষ। তারা সরলমতি মানুষকে ঠকিয়ে রোজগারের বিকল্প একটা পথ তৈরি করতে পটু। তাদের উপদেশ হল—ত্যাগ করো, দান করো, নিজেকে উৎসর্গ করো, কৃচ্ছ্রসাধন করো, তপস্বী হও। হে রাম! বিবেচক হও। এই পৃথিবী ছাড়া আর কোনও জগৎ নেই, এ কথা নিশ্চিত। যা বর্তমান তাকে সম্ভোগ করো, অপ্রিয় যা তাকে ছুড়ে ফেলে দাও পিছনে। সকলের গ্রহণযোগ্য নীতি অনুসরণ করে ভরত যে-রাজ্য তোমাকে নিবেদন করতে চাইছে তা গ্রহণ করো।' (রামায়ণ, অযোধ্যা কাণ্ড)

এই সব অজ্ঞেয়বাদী বা নাস্তিকদের প্রশ্ন আর বিরোধিতার একটা সুপ্রভাব পড়েছিল হিন্দু চিন্তাধারার উপর। কারণ তার ফলে ধর্মীয় নেতারা তাঁদের মতবাদের সপক্ষে কথা বলতে অথবা তাঁদের অবস্থান পুনর্বিবেচনা করতে, এমনকি কিছু সংশয়জনক আচার পরিত্যাগ করতেও বাধ্য হয়েছিলেন। এই বাদ-প্রতিবাদের যুগেই জৈন আর বৌদ্ধধর্মের উদ্ভব হয়েছিল। বেদে দেবদেবীর প্রতি যে আগ্রহ, তার জায়গায় দেখা গেল মানুষের প্রতি আগ্রহ, আগ্রহ মানুষের মহত্ত্বের প্রতি। আর বেদের স্বর্গসুখের আদর্শকে অগ্রাহ্য করে প্রতিস্পর্ধী বৈরাগ্য, অহংশূন্যতা এবং নিঃস্বার্থ কর্মের আদর্শ এসে দাঁড়াল। আত্মার পুনর্জন্ম লাভের তত্ত্ব আর বহুজন্মের মধ্যে দিয়ে তার ক্রমবিকাশ ও চূড়ান্ত পর্যায়ে আত্মোপলব্ধির তত্ত্বের বিকাশ ঘটেছে উপনিষদে। অন্য দিকে জড়বাদীরা হয়তো উপনিষদের সমসাময়িক কাল থেকেই ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্পর্কে প্রশ্ন তুলতে শুরু করেছে। বৌদ্ধিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার এই পরিবেশে জৈন ও বৌদ্ধধর্মের উত্থান। সমকালীন

ভাবনার প্রভাব দেখা যায় এই ধর্মগুলোতে সহজেই। দুটি ধর্মেরই প্রবর্তক ছিলেন ক্ষত্রিয়, বৈদিক ব্রাহ্মণ নয় এবং দুটি ধর্মেরই উদ্ভব হয়েছিল বৈদিক সংস্কৃতির কেন্দ্র থেকে বহুদূরে পূর্বভারতের রাজ্যগুলোতে।

মহাবীর জৈনধর্মকে দৃঢ়প্রতিষ্ঠা দিয়েছিলেন। জৈনদের বিশ্বাস মহাবীরের আগে চব্বিশ জন তীর্থঙ্কর ছিলেন। মহাবীর আর বুদ্ধ ছিলেন প্রায় একই সময়ের। তাঁদের শিক্ষার মধ্যেও খানিকটা সাদৃশ্য রয়েছে। দুই জনেই ছিলেন বেদ-বিরোধী। দুই জনেই জাতিভেদ প্রথাকে স্বীকার করেননি। বৌদ্ধধর্মের মতো জৈনধর্মেরও উদ্দেশ্য জন্মচক্র থেকে অব্যাহতি। এই মোক্ষলাভের তিনটি পথ বা তিনটি প্রয়োজনীয় 'রত্ন' আছে—শুদ্ধ বিশ্বাস, শুদ্ধ জ্ঞান এবং শুদ্ধ আচরণ। জৈন-আচরণবিধির মধ্যে পাঁচটি প্রতিজ্ঞা আছে—অহিংসা, সত্যনিষ্ঠা, অচৌর্য, ইন্দ্রিয়সংযম এবং বৈরাগ্যসাধন। রাজপুতানা, গুজরাত এবং দক্ষিণ ভারতের কিছু অংশ এখনও জৈনধর্মের পাদপীঠ। একসময়ে জৈনধর্ম ভারতের আরও অনেক জায়গায় প্রচলিত ছিল, যেমন বাংলায় প্রাক্‌বৌদ্ধ যুগে। এই ধর্ম হিন্দু চিন্তা ও আচরণে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেছিল। জৈন তাপসদের সর্বজন পরিচিত কঠোর সংযমে হিন্দু ঐতিহ্য প্রভাবিত হয়েছিল। হিন্দুদের কোনও কোনও সম্প্রদায়ের নিরামিষ ভোজনের রীতি মনে হয় জৈনপ্রভাবের ফল। মধ্যযুগের মরমিয়াবাদের বিকাশে জৈনধর্মের আর একটি ভূমিকা রয়েছে। এটিকে অবশ্য প্রায়ই স্বীকার করা হয় না। জৈনধর্ম পুরোহিত সম্প্রদায়ের শাসনের বাইরে এক সরল ধর্মবিশ্বাস হিসেবে গড়ে উঠলেও পরে ক্রমশ পান্ডাপুরোহিতের শাসনের কবলে পড়ে যায়। এমনকি পরবর্তী জৈনধর্মে দেখি প্রতিমা পূজাও এসে গেছে। এরই প্রতিক্রিয়ায় ধর্মবিশ্বাসের আদি সরলরূপে ফিরে যাওয়ার জন্য বহু আন্দোলন দেখা দিয়েছে চতুর্দশ আর পঞ্চদশ শতকে। এই প্রসঙ্গে তারণ স্বামী আর লুঙ্কা শাহের নাম উল্লেখ করা যায়। রামমুনির বিখ্যাত 'পাহুড়া দোহা' সম্ভবত মধ্যযুগের সরল মরমিয়া কবিতার প্রথম দৃষ্টান্ত। মধ্যযুগের এই মরমিয়া সাধনা ভারতীয় সংস্কৃতির এক গুরুত্বপূর্ণ দিক। এ সম্বন্ধে আমরা পরবর্তী এক অধ্যায়ে আলোচনায় আসব।

বৌদ্ধধর্মের বিশদ আলোচনা এই গ্রন্থে হয়তো নিষ্প্রয়োজন। কেন না এ বিষয়ে প্রচুর সহজপ্রাপ্য ভাল বই রয়েছে। খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে পূর্ব

হিমালয়ের পাদদেশে শাক্য-রাজবংশে জন্ম হয় গৌতম সিদ্ধার্থের। মানব জীবনের বিচিত্র দুঃখ তাঁকে বিচলিত করে তুলেছিল এবং তিনি তাঁর প্রথম সন্তানের জন্মের পরেই রাজপ্রাসাদ ছেড়ে বেরিয়ে পড়েন সত্যের সন্ধানে। বুদ্ধের সুমহান তপস্যা ভারতবর্ষের অগণিত প্রজন্মের কাছে জাগতিক সুখ অগ্রাহ্য করার এক অসাধারণ জীবন্ত প্রতীকে পরিণত।

প্রথমদিকে গৌতম অধ্যাত্মজ্ঞান অর্জনের জন্য প্রচলিত পথেই খ্যাতিমান প্রাজ্ঞ ঋষিদের কাছে শাস্ত্র পাঠ করেন আর তারই সঙ্গে কৃচ্ছ্রসাধন অভ্যাস করতে থাকেন। কিন্তু এতে তাঁর সন্তোষ হল না। অবশেষে গয়ায় এক অশ্বত্থ গাছের তলায় গভীর ধ্যানে মগ্ন হয়ে আলোর দর্শন পেলেন। বৌদ্ধধর্মের মূল তত্ত্বগুলো সুপরিচিত। তার মধ্যে আছে 'মধ্যপন্থা' অর্থাৎ অতিরেক বর্জন, অহিংসা, ঘৃণাশূন্যতা, বিশ্বমৈত্রী, বৈরাগ্য, মিতাচার এবং নির্বাণ লাভের অর্থাৎ জন্মচক্র থেকে অব্যাহতি লাভের আদর্শ। বৌদ্ধধর্মের উপর উপনিষদের প্রভাব স্পষ্ট, কিন্তু বুদ্ধদেব উপনিষদের চিন্তাভাবনাকে এক নতুন মোড় দিয়ে আরও বিকশিত হতে সাহায্য করেছেন। এই প্রগতিশীল মতবাদের তীব্র আবেদন সিংহল, ব্রহ্মদেশ, চিন, জাপান এবং আরও অনেক দেশের লক্ষ লক্ষ মানুষকে বৌদ্ধধর্ম গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করে। ভারতে খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতকে বৌদ্ধধর্ম রাষ্ট্রীয় ধর্মে পরিণত হয় সম্রাট অশোকের সময়। তিনি নানান বিদ্যায়তন আর শিলালিপির সাহায্যে দেশে এই ধর্মের বিস্তার ঘটান, আর প্রথম দেশের বাইরে বৌদ্ধধর্ম প্রচারক বা বৌদ্ধ ভিক্ষুর একটি দল পাঠান। স্বয়ং অশোকের বৌদ্ধধর্ম গ্রহণের কাহিনিটিই এই ধর্মবিস্তারের এক আদর্শ দৃষ্টান্ত। পিতা, পিতামহের পদাঙ্ক অনুসরণ করে অশোক তাঁর ভারতীয় সাম্রাজ্যকে আরও সুদৃঢ় করার জন্য কলিঙ্গের রাজাকে যুদ্ধে পরাজিত করেন। কিন্তু সেই যুদ্ধের ভয়াবহতা তাঁকে এমনভাবে বিচলিত করে যে তিনি আশ্রয় নিলেন অহিংসা আর মানবতার প্রতীক বৌদ্ধধর্মে।

হিন্দু ধর্মবিশ্বাসে বৌদ্ধধর্মের প্রভাব বিপুল। তাই বৌদ্ধধর্ম পরবর্তীকালে ভারতবর্ষ থেকে মুছে গেছে, এ রকম বলা ভুলই হবে। আসলে বৌদ্ধধর্মের বেশিরভাগ নীতিকেই গ্রহণ করে নিয়েছে হিন্দুদের একটা বিরাট অংশ, আর বৌদ্ধধর্মকে নিজেরই এক অংশে পরিণত করে হিন্দুধর্ম তার আশ্চর্য স্বীকারণশক্তির পরিচয় আবার তুলে ধরেছে। এখনও হিন্দুরা মনে করে

বুদ্ধদেব তাদের এক অবতার। তিনি জ্ঞানের আলো বিতরণ করেছেন সর্বজীবে। আসলে বৌদ্ধধর্ম আর উপনিষদের মধ্যে এত মিলই এই সাঙ্গীকরণকে সহজ করে দিয়েছে।

হিন্দুধর্মীয় চিন্তায় বৌদ্ধধর্মের প্রভাব ছাড়াও বৌদ্ধধর্ম থেকে আর একটি জিনিস হিন্দুরা পেয়েছে। সে হল ধর্মশিক্ষায় বা ধর্ম-উপদেশে নীতিকথামূলক কাহিনি বা রূপকের ব্যবহার।[২] হিন্দু পুরাণ আর পরবর্তী পঞ্চতন্ত্রের গল্পগুলোতে এর পরিচয় মেলে। জ্ঞানের কথা ছেড়ে দিলেও পঞ্চতন্ত্রের কাহিনির সাহিত্যিক মূল্য অসামান্য। একইভাবে বৌদ্ধশিল্প প্রভাবিত করেছে হিন্দু শিল্পকে। হিন্দু মূর্তিশিল্পে বৌদ্ধ ভাস্কর্যের প্রভাবকে সহজেই চেনা যায়। কিন্তু ভারতীয় সংস্কৃতির বিবর্তনে বৌদ্ধদের সবচেয়ে বড় দান হল শিক্ষাক্ষেত্রে। উপনিষদের যুগে অধ্যয়ন আর গবেষণার বেশিরভাগই অনেকটা বিকেন্দ্রিক হয়ে তপোবনগুলোতে কিংবা রাজপ্রাসাদে চলত। কোনও সুসংগঠিত বিশ্ববিদ্যালয় ছিল না। বৌদ্ধধর্মের প্রভাবে ভারতের মাটিতে অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থাপনা হয়। এর মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হল পূর্ব বিহারের নালন্দা। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের মান এমন উন্নত ছিল যে, এর আকর্ষণে চিন, জাপান, তিব্বত এবং আরও অনেক দূরদেশ থেকে ছাত্র আসত। ধর্মীয় (বৌদ্ধ ও হিন্দু) বিষয় ছাড়াও চিকিৎসা, কৃষি, পশুপালন, ন্যায়শাস্ত্র বা তর্কশাস্ত্র, ব্যাকরণ, স্থাপত্য এবং শিল্পকলা বিষয়ে শিক্ষাদান করা হত। সপ্তম শতকের চিনা ছাত্র হিউয়েন সাঙ-এর লেখা এই

২. ভারতীয় মন সব সময় উপকথা ভালবেসেছে। বৌদ্ধ সাহিত্যে নীতিকথা বা রূপকথার যে গুরুত্ব তার মূলে আছে প্রধানত এদের উৎপত্তিস্থান। বহির্ভারতে ভারতীয় উপকথার প্রভাব পড়েছে আরও নানা পথে। ম্যাক্সমুলার, রলিনসন এবং আরও কেউ কেউ দেখাতে চেষ্টা করেছেন যে, ঈশপের কিছু কাহিনি ভারতের উপকথা থেকে এসেছে। এ ধারণা অসম্ভব নয়। কেননা ঈশপের গল্পে সিংহ, বাঘ, হাতি, ময়ূর, বাঁদর ইত্যাদির প্রাধান্য, আর এই জীবগুলোর সহজেই দেখা মেলে ভারতে। এ ছাড়া কাহিনির মধ্যেও মিল আছে। যদিও এটি নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত হয়নি, প্রমাণের উপায়ও জানা নেই। অবশ্য এ সম্বন্ধে সন্দেহ নেই যে, মধ্যযুগের ইউরোপ আর আরবের গল্পে ভারতীয় কাহিনির প্রবল প্রভাব পড়েছে। পঞ্চতন্ত্রের গল্পগুলো পারস্য ভাষায় অনূদিত হয়েছে ষষ্ঠ শতকে, আর আরবি ভাষায় অষ্টম শতকে 'পিলপেই-এর উপকথা' (*Fables of Pilpay*) নামে। এই আরবি অনুবাদ-গ্রন্থ সারা ইসলামি দুনিয়ায় ছড়িয়ে পড়েছিল এবং পৌঁছে গিয়েছিল ইউরোপেও। এই জীবজন্তুর কাহিনির ১৪৮১ সালে লিখিত জার্মান সংস্করণ ইউরোপের সবচেয়ে প্রাচীন মুদ্রিত বইয়ের মধ্যে একটি। আর Caxton-এর ছাপাখানা এ বইটির ইংরেজি তর্জমা প্রকাশ করে। La Fontaine তাঁর *Fables* (১৬৭৮)-এর ভূমিকায় বলেছেন, "এই নতুন উপকথাগুলোর বিষয়বস্তু কোন উৎস থেকে আমি নিয়েছি, তা এখানে বলার প্রয়োজন বোধ করছি না। আমি শুধু কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে এটুকুই বলব যে, এই সব গল্পের বেশিরভাগ নেয়া হয়েছে পিলপে (Pilpay)-এর কাছ থেকে, যিনি একজন ভারতীয় সন্ন্যাসী।"

বিশ্ববিদ্যালয়ের বিবরণ রীতিমতো চিত্তাকর্ষক। শিক্ষার এই যে উন্নতি বা বিকাশ, বৌদ্ধদের জ্ঞানের আলো ছড়িয়ে দেয়ার আকাঙ্ক্ষারই ফল। এর সুস্পষ্ট প্রভাব পড়েছে ভারতীয় সংস্কৃতির বিকাশে এবং স্বাভাবিকভাবেই হিন্দু চিন্তাধারার উপরেও গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব পড়েছিল। বৌদ্ধযুগের পর হিন্দুধর্মের পুনরুত্থান-কালের একজন পুরোধা পুরুষ শঙ্করাচার্য। তিনিও সুসংগঠিত শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তনে বিশেষ আগ্রহী ছিলেন। বৌদ্ধসংঘের অনুকরণে তিনি হিন্দু সন্ন্যাসীদের জন্য অনেকগুলো মঠ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। প্রতিবাদী ও মুক্তমনা ভারতীয় বস্তুবাদ, জৈনধর্ম, বৌদ্ধধর্ম এ সবই তাদের ছাপ রেখে গেছে হিন্দু দর্শন আর ধর্মচর্চার উপর।

১৩

অন্য কয়েকটি অবৈদিক ধারা

ভারতে বৈদিক ধারার বাইরে বৌদ্ধ ও জৈন ছাড়া আরও অনেক সম্প্রদায় ছিল। বুদ্ধেরই জীবন কাহিনিতে আমরা এই রকম অনেক উপাসনা পদ্ধতির পরিচয় পাই। সে সব সম্প্রদায়ের কথা আলোচনার সময় এখানে নেই, কিন্তু 'নাথ' 'যোগ' আর 'সিদ্ধাচার' ধর্ম সম্বন্ধে কিছু কথা বলতেই হয়, কারণ একসময় ভারতে এগুলোর ব্যাপক প্রচলন ছিল।

নাথ ধর্মের সঙ্গে যোগের সম্বন্ধ খুবই ঘনিষ্ঠ। এর সঙ্গে পশুপতি শিবের উপাসনারও যোগ আছে। শিব হলেন পশুদের অধিদেবতা। সিন্ধু সভ্যতার পুরাতাত্ত্বিক নিদর্শনের মধ্যে পাওয়া গেছে পশুপতি শিব আর যোগীদের মূর্তি। এ থেকেই মনে হয় এই ধর্ম যথেষ্ট প্রাচীন। পরে এই সব ধর্মমত বৌদ্ধ, জৈন আর লোকায়ত হিন্দুধর্মের খুবই নিকট সম্পর্কে এসেছিল।

বৌদ্ধ আর জৈনরা তাদের ব্যবহারিক নীতিশাস্ত্র অনুযায়ী মানুষকে বসিয়েছিল বৈদিক দেবদেবীর জায়গায়। নাথ, যোগী আর সিদ্ধাচার্যরা আরও এক ধাপ এগিয়ে দাবি করে বসল যে ধর্মের যত রহস্য সবই নিহিত রয়েছে মানব শরীরের মধ্যেই। তাদের মতে 'সৌর ও চান্দ্র শক্তিপ্রবাহ' রয়েছে দেহস্থ স্নায়ুতন্ত্রের মধ্যেই। ইড়া আর পিঙ্গলা এর নাম। এ দুই-এর সংযোগের সাধনায় দেহস্থিত চক্রগুলো ভেদ করা সম্ভব। এই চক্রের প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় অথর্ববেদে। তাই এই বিশ্বাসের কিছু কিছু হয়তো এ যুগের সঙ্গে জড়িত। এদের আর একটি তত্ত্ব হল শিব ও শক্তির সাম্য। পরম এক বা ঈশ্বরের দুটি দিকের প্রতীক এই পুরুষ ও স্ত্রী দেবতা। এই সব ধর্মে লিঙ্গপূজারও কিছু উপাদান পাওয়া যায়। আগে উল্লেখ করা হয়েছে শিবের উপাসনা ভূমির উর্বরতার আরাধনার সঙ্গে বিশেষভাবে যুক্ত। হিন্দু-দর্শনের

নানান দৃষ্টিকোণে শিবের এই বহুমুখিতা সত্যিই রীতিমতো উদ্দীপক। সিন্ধুসভ্যতায় তিনি পশুপতি—পশুদের অধিষ্ঠাতা দেবতা। কিছুকাল পরে তিনি বৈদিক সাধনার দেবতা রুদ্রের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন। তারও পরে তাঁর যোগ ঘটেছে লিঙ্গ উপাসনার সঙ্গে। আবার তাঁকে যোগসাধনার সঙ্গে জড়িয়ে যোগেশ্বর নাম দেয়া হয়েছে এবং সৃষ্টি ও প্রলয়ের অধিদেবতা হিসেবে দেখা হয়েছে তাঁকে। তিনি নটরাজ, বিশ্বনৃত্যের মধ্যে বিশ্বের ভাঙাগড়ার যে লীলা তারই অধীশ্বর। বহু বর্ণনায় তাঁকে চিত্রিত করা হয়েছে ভয়ংকররূপে, যিনি আমাদের বিশ্বের ধ্বংসলীলা সম্বন্ধে সচেতন করে দেন। রুদ্রের বন্দনায় ধরা পড়ে এই ভীতির ভাব, "আমাদের নিধন কোরো না, তুমিতো পরম কারুণিক।" একই সঙ্গে ভারতীয় কাব্য আর সাহিত্যে শিবকে পাওয়া যায় মঙ্গলময় ও প্রিয়দেবতারূপে আর লোককথায় শান্ত, গৃহস্থের রূপ এঁর, হয়তো এই সবই খুব স্বাভাবিক। সর্বস্পর্শী পরমেশ্বরের অনন্ত রূপ, অনন্ত প্রকাশকে এইভাবে দেখার হিন্দু দৃষ্টিভঙ্গিই এর মধ্যে অভিব্যক্ত।

ফিরে আসা যাক আলোচ্য ধর্ম সম্প্রদায়ের কথায়। এই যেগীরা দৃষ্টিভঙ্গিতে রহস্যবাদী হলেও শারীরবিদ্যা আর ভেষজবিদ্যায় গুরুত্বপূর্ণ চর্চা করেছেন। এমনকি আজও যোগব্যায়ামের বাস্তব উপযোগিতাকে স্বীকার করা হয়,আর ব্যাপকভাবে চর্চাও হয়। এই সব ধর্মের পরম্পরা থেকেই তন্ত্রের উদ্ভব।[১] তান্ত্রিকরাও যোগে বিশ্বাসী, তারা ষটচক্রভেদে আস্থাবান। শিব-শক্তি তাদের উপাস্য কিংবা দেবীই সাধারণত আরাধ্যা। কিছু কিছু তান্ত্রিক সাধনায় শারীরিক ক্রিয়াকলাপ আছে।

এগুলোর যৌন তাৎপর্য আছে আর আছে তার গুহ্য বা নিগূঢ় ব্যাখ্যা। অবশ্য তান্ত্রিক পদ্ধতির অন্যান্য দিক আছে যেগুলো ধ্যানাত্মক দৃষ্টিকোণ থেকে সহজেই বোধগম্য। তন্ত্রবিদ্যার প্রকাশিত সংকলনকে বলা হয় 'সংহিতা' বা 'আগম'। 'আগম' শব্দের তাৎপর্য এই যে, এগুলো বহুপূর্ব থেকে চলে এসেছে গুরুশিষ্য পরম্পরায়। আগমের চারটি অঙ্গ বা ভাগ। প্রথমটি হল জ্ঞান। এখানেই আগম উপনিষদের সবচেয়ে কাছাকাছি। মহানির্বাণ তন্ত্রে যে ব্রহ্ম-তত্ত্ব আমরা পাই তা হল উপনষিদের দর্শন আর সাংখ্যদর্শনের

১. দ্রষ্টব্য Arthur Avalon. *Principles of Tantra* Part 1, London, 1914 and Part II, London, 1916.

মিশ্রণ। দ্বিতীয় অঙ্গ হল যোগ। ক্রিয়া বা সাধন হল তৃতীয় অঙ্গ। আর চতুর্থটি হল চর্যা অর্থাৎ আচরণ বা চরিত্র। এর বিষয়বস্তু হল মানুষের সামাজিক আর ব্যক্তিগত ব্যবহার। মহানির্বাণতন্ত্রের কয়েকটি স্তবকে (অষ্টম অধ্যায় বিশেষভাবে দ্রষ্টব্য) এই আচরণবিধির উপরে আলোকপাত করা হয়েছে, যা রীতিমতো উদ্দীপক। এগুলো আমাদের কখনও কখনও মনে পড়িয়ে দেয় মনুসংহিতাকে, হিন্দু আইনে যে গ্রন্থের সুস্পষ্ট প্রভাব। মহানির্বাণতন্ত্রের চতুর্দশ অধ্যায়ে কয়েকটি স্তবকে জাগতিক বন্ধন থেকে মুক্ত সাধকের কথা আছে, এগুলোকে বেদান্তের জীবন্মুক্তের ধারণার সঙ্গে তুলনা করা যায়।

তন্ত্রে নারীদের ভূমিকা বেশ গুরুত্বপূর্ণ। রক্ষণশীল হিন্দুধর্মের অন্যান্য অনেক শাখার মতো তন্ত্র ধর্মীয় ব্যাপারে নারীকে মর্যাদায় নিচে ফেলে রাখেনি। সামাজিক আর জাতিগত বিধিনিষেধের ক্ষেত্রেও তন্ত্র বেশ খানিকটা উদার। তন্ত্রশাস্ত্রের কিছু গ্রন্থে সূক্ষ্ম বুদ্ধি বা পরিশীলনের ছাপ দেখা গেলেও আসলে কিন্তু তন্ত্র ছিল লৌকিক ধর্ম। অন্যান্য লৌকিক ধর্ম যেমন মধ্যযুগের মরমিয়া সাধনা, ভক্তি সাধনা, বাউলিয়া সাধনা—এই ধারাগুলো নিয়ে আলোচন করা যাবে পরবর্তী অধ্যায়গুলোতে।

১৪

রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণ

পুরাণ শব্দের আক্ষরিক অর্থ হল পুরতান। পুরাণ বলতে বোঝাত বহুকাল ধরে চলে-আসা লৌকিক গ্রন্থ (প্রায়ই কাহিনি বা উপকথার)। ধর্মীয় অনুষ্ঠানে আবৃত্তি করা হত এমন বেশ কিছু পুরাণের সামান্য উল্লেখ আছে বেদে। সেই যৎসামান্য উল্লেখমাত্র থেকে প্রাচীন পুরাণগুলো কেমন ছিল বলা খুব কঠিন। বেশির ভাগ পুরাণই পরবর্তীকালের। সেগুলোর অবশ্য প্রায়ই উৎসমূল ছিল অতীত যুগে, এমনকি অন্তত কিছু প্রাক্‌বৈদিক যুগেও।

এদের মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত হল দুটি মহাকাব্য—রামায়ণ আর মহাভারত। কবে যে এগুলো রচনা হয়েছিল বলা শক্ত কেননা কোনও একজন এমনকি কয়েকজন লেখকের সৃষ্টি নয়। এই মহাকাব্য দুটি বহু প্রজন্মের বহু কবির সমবেত প্রয়াসের ফল। কাহিনিগুলো গড়ে উঠছিল ধীরে ধীরে, ছন্দোবদ্ধ কবিতাগুলো রচিত হতে থাকছিল সম্ভবত খ্রিস্টপূর্ব প্রথম সহস্রাব্দ জুড়ে। যদিও বর্তমান চেহারায় এসেছিল খুব সম্ভব খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতক আর দ্বিতীয় শতকের মধ্যে। কিন্তু এই সময় নির্ধারণও একেবারেই নিশ্চিত নয়। কোনও কোনও পণ্ডিতের মতে এগুলোর রচনা আরও আগের। নাটক, গান আর আবৃত্তির বৈদিক ঐতিহ্য অনুসরণ করে দীর্ঘদিন এ কাব্য দুটিও ছিল সম্প্রচারের ক্ষেত্রে মৌখিক। সেগুলো সংকলিত আর লিখিত হয়েছে হয়তো খ্রিস্টজন্মের আরও কয়েক শতক পর। রামায়ণে প্রায় ২৪,০০০ আর মহাভারতে প্রায় ৯০,০০০ দ্বিপদী বা শ্লোক আছে। ইলিয়ড আর ওডিসিকে একসঙ্গে নিয়ে সাত গুণ করলে তবে শেষেরটির দৈর্ঘ্যে পৌঁছনো যাবে। কৌরব আর পাণ্ডব একই পরিবারের দুটি শাখার মধ্যে রাজ্যের উত্তরাধিকার নিয়ে দ্বন্দ্ব মহাভারতের মূল কাহিনি। পাণ্ডবদের একটু বেশি সহানুভূতি নিয়ে চিত্রিত করা হয়েছে। কিন্তু কৌরব পক্ষের কয়েকজনও

আমাদের বিশেষ শ্রদ্ধার পাত্র। অবশ্য পাণ্ডবদের কোনও কোনও বীরের চরিত্রে অসামান্য মানবিক দুর্বলতার উদ্ঘাটনও দেখা যায়। সাধু-স্বভাব যুধিষ্ঠিরের দ্যুতক্রীড়ায় বা জুয়ায় অতিরিক্ত আসক্তি এর দৃষ্টান্ত। মহাভারতের একটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হল ভারতীয় সংস্কৃতির ঐক্যের রূপায়ণ। এই বিরাট দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যগুলোকে বর্ণনা করা হয়েছে দরদী মন নিয়ে, গর্বের সঙ্গে। ভারতের সাংস্কৃতিক সংহতির ক্রমবিকশিত ধারণাটি স্পষ্ট হয়ে প্রকাশ পেয়েছে এই কাব্যে। রামায়ণ মূলত মহান, সত্যনিষ্ঠ রাজা রামচন্দ্রের কাহিনি। লঙ্কার রাজা রাবণ এঁর পত্নী সীতাকে জোর করে হরণ করে নিয়ে যান এবং পরে রামচন্দ্র রাবণের সৈন্যদের পরাস্ত করে সীতাকে উদ্ধার করেন। মহাভারতের অপরিমেয় বিপুলতা রামায়ণে নেই। কিন্তু এ মহাকাব্যেও ভারতীয় সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের অজস্র উপাদানের সমৃদ্ধ সঞ্চয় রয়েছে। মহাভারতকে যদি উত্তর ভারতে সার্বিক আধিপত্য লাভের জন্য যুদ্ধের কাহিনি বলা যায়, তবে রামায়ণ হল দাক্ষিণাত্যে আর্যাবর্তের প্রভাব বিস্তারের ইতিকথা।

মহাকাব্য দুটি যে শুধুই মূল কাহিনিটুকু বলেই ক্ষান্ত নয় তা এদের দৈর্ঘ্যেই স্পষ্ট বোঝা যায়। মূল কাহিনির চরিত্রের মুখে গল্পের আকারে বহু উপকাহিনির প্রক্ষেপ ঘটেছে এর মধ্যে। এগুলো এসেছে কখনও নিছক বিনোদনের উদ্দেশ্যে, কখনোবা কোনও তত্ত্বকে ব্যাখ্যা করার অভিপ্রায়। শকুন্তলা, নল-দময়ন্তী, সাবিত্রী-সত্যবান এবং এ রকম হাজারো মনোহারী গল্প পাওয়া যায় মহাকাব্য দুটিতে, বিশেষ করে মহাভারতে। দুঃখের বিষয়, এখানে মহাকাব্য দুটিতে প্রকাশিত ভারত-সংস্কৃতির প্রকৃতি বা চরিত্র সম্বন্ধে বিশদ আলোচনার অবকাশ নেই, আমরা শুধু এদের মূলগত ধর্মীয় উপাদান সম্বন্ধে আলোচনাতেই সীমাবদ্ধ থাকব।

সেকালের লৌকিক ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান সম্বন্ধে ধারণার প্রধান অবলম্বনই হল এ দুটি মহাকাব্য। আগের অধ্যায়ে আমরা যে সব লৌকিক বিশ্বাস আর ধর্মীয় ঐতিহ্যের কথা বলেছি সে সবই এ মহাকাব্য দুটি থেকে প্রাপ্ত। রামায়ণ মহাভারতে হিন্দু দর্শনের এক বিশেষ তত্ত্ব হল অবতারবাদ।[১]

১. খ্রিস্টান ধর্মে একজন মাত্র অবতারের (যিশু) কথা আছে। হিন্দুধর্মে কিন্তু বহু অবতারের কথা পাই। ভগবদ্গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, "যখনই ধর্মের গ্লানি উপস্থিত হয়, অধর্মের অভ্যুত্থান ঘটে, তখনই আমি দেহধারণ করি। সাধু স্বভাবের মানুষকে রক্ষা করা, দুর্জনকে বিনাশ আর ধর্মকে আবার প্রতিষ্ঠিত করার জন্য যুগে যুগে অবতীর্ণ হই।" (চতুর্থ অধ্যায়, শ্লোক ৭, ৮) কোনও হিন্দু এটিকে আক্ষরিক অর্থেই গ্রহণ করে রাম, কৃষ্ণ, বুদ্ধকে অবতার ভাবেন, আবার কেউ কেউ এটিকে হিতকর অতিকথা হিসেবেই দেখেন।

এই দুই মহাকাব্যের দুই অবতার হলেন রামায়ণে রামচন্দ্র, আর মহাভারতে পাণ্ডবদের সখা কৃষ্ণ। বৈদিক সংহিতায় আমরা সূর্য, বায়ু, অগ্নি এই সব প্রাকৃতিক শক্তির অলৌকিক অধিদেবতাদের পেয়েছি। অন্য দিকে উপনিষদে পেয়েছি সর্বব্যাপী নিরাকার ব্রহ্মকে, যিনি নানারূপে প্রকাশ করেন নিজেকে। মহাকাব্যের এই অবতারেরা হলেন পরম ঈশ্বর আর মানুষের মধ্যস্থ বা মধ্যস্থতাকারী অতিমানব। হিন্দুর ধর্মীয় জীবনে এই অবতারতত্ত্বের প্রভাব গভীর আর ব্যাপক। কেননা এখানে ঈশ্বর নিজেকে এমন রূপে প্রকাশ করেন বলে কল্পনা করা হয় যা অতি সাধারণ মানুষেরও বোধগম্য। রাম আর কৃষ্ণ— ঈশ্বরের এই দুটি রূপ বহু সহস্র বৎসর ধরে ভক্তি ভালবাসার পাত্র হয়ে আছেন। উপনিষদের সর্বব্যাপী ব্রহ্মের (যিনি আত্মার সঙ্গে অভিন্ন) তত্ত্ব অনেক পরিণত মনের (বোধের) সৃষ্টি এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। কিন্তু সাধারণ হিন্দুর মনে অবতারবাদের প্রভাব অবশ্যই অনেক বেশি। যেটা বিশেষভাবে লক্ষণীয়, মহাভারতের এই অবতার কৃষ্ণই আবার উপনিষদের ব্রহ্মের তত্ত্বকে নতুন করে উপস্থিত করেছেন। আগেই আমরা এই বহু পরিচিত ভগবদ্‌গীতার কথা আলোচনা করেছি। কৃষ্ণের ব্যক্তিত্বে হিন্দু ভাবনার দুটি তত্ত্বই খুব স্পষ্ট ধরা পড়ে। কখনও তিনি সর্বব্যাপী ব্রহ্মের হয়ে কথা বলেন, তাঁর কথায় উপনিষদের দুরূহ দার্শনিক তত্ত্বের প্রকাশ ঘটে। কিন্তু আবার কখনও তিনি কথা বলেন ঠিক মানুষের মতোই, তিনি অর্জুনের বন্ধু, সময়োপযোগী বাস্তবসম্মত পরামর্শ দেন তাঁকে।

নৈতিক আচরণবিধি গঠনেও মহাকাব্যগুলোর দান আছে। রামের সততা, আন্তরিকতা, বন্ধুবাৎসল্য, সীতার চরিত্রে পবিত্রতা, দয়া, লক্ষ্মণ আর ভরতের ভ্রাতৃপ্রেম বহু প্রজন্মের কাছে আদর্শের আদিরূপ হয়ে আছে। একইভাবে মহাভারতে ভীষ্মের আত্মত্যাগ, যুধিষ্ঠিরের সত্যনিষ্ঠা, ক্ষমা, পাণ্ডবদের ন্যায়নিষ্ঠা, বলশালীর হাত থেকে দুর্বলকে রক্ষা করার আগ্রহ, কৌরবপক্ষের কর্ণের দানশীলতা, বহু প্রজন্মের অসংখ্য ভারতীয়র কাছে আদর্শ হয়ে উঠেছে। এই সব চরিত্রেও অন্যদিক থেকে যে মানবিক দুর্বলতা প্রকাশ পেয়েছে, তারা আরও জীবন্ত হয়ে আমাদের ভালবাসা আকর্ষণ করতে পেরেছে। ন্যায়পরায়ণ রামচন্দ্র একসময় ভুলবশত তাঁর স্ত্রীর চরিত্র-শুচিতা সম্বন্ধে সন্দিহান হয়েছেন, সাধুচরিত্রের রাজপুত্র যুধিষ্ঠির পাশাখেলায়

আসক্ত, বীর অর্জুন নিজের মহত্ত্ব নিয়ে একটু গর্বিত ছিলেন। এই সবই চরিত্রগুলোকে রক্তমাংসের মানুষ করে তুলেছে। অতি বড় সাধুচরিত্রেও দুর্বলতা থাকে, এই ধারণার মধ্যে হিন্দুর সহিষ্ণুতা আর স্বীকৃতির আদর্শটিই নজরে পড়ে।

সদাচরণের এই সব দৃষ্টান্ত ছাড়াও মহাকাব্য দুটিতে নৈতিক ব্যবহারবিধি নিয়ে নানান আলোচনা আছে। গীতা আমাদের জ্ঞান আর কর্মের মাহাত্ম্যের কথা বলে। গীতায় ফলাসক্তিহীন কর্ম সম্পাদনের কথা আছে। এই উপদেশ শত শত প্রজন্মের ভারতীয়কে প্রভাবিত করেছে। আধুনিক যুগের তিলক, মহাত্মা গাঁন্ধীর মতো মানুষও তার মধ্যে আছেন। আচরণবিধির অনুপুঙ্খ, উদ্দীপক আলোচনা আছে মহাভারতের শান্তি পর্ব ও অনুশাসন পর্বে। প্রসঙ্গত উল্লেখ করি, মহাকাব্যগুলোতে জাতিভেদ প্রথার একটু কঠোর রূপ দেখা যায় যা বেদের যুগে ছিল না। কিন্তু তা সত্ত্বেও তারই মধ্যে আবার এমন অনেক গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র দেখা যায় যাঁরা নিম্নবর্ণজাত। কুরু-রাজসভার বিজ্ঞ ব্যক্তিদের অন্যতম হলেন বিদুর। ইনি শূদ্র দাসীর সন্তান। ব্রাহ্মণ কৌশিকের গর্ব খর্ব হয়েছিল মিথিলার ধর্মপ্রাণ কসাইয়ের সান্নিধ্যে। (মহাভারত, বনপর্ব, ২০৬-১৪)। বস্তুত মহাভারতের লেখক (কিংবা সংকলক) নিজেই এক জেলেনির সন্তানরূপে বর্ণিত হয়েছেন। মহাকাব্যে কয়েকজন অসামান্য নারী চরিত্রেরও রূপায়ন আছে, যেমন দ্রৌপদী, গান্ধারী। এঁরা শুধু পবিত্রতা আর পাতিব্রত্যের দৃষ্টান্ত নন, জ্ঞান, ন্যায়নিষ্ঠা, এমনকি বীরত্বেরও প্রতিমূর্তি। গান্ধারী পাণ্ডবদের শত্রু কৌরবদের মা। কিন্তু তাঁর সহানুভূতি পাণ্ডবদের দিকে, কেন না এরা নীতিনিষ্ঠ। তিনি পুত্রস্নেহে-অন্ধ স্বামীকেও ভর্ৎসনা করেন। অর্জুনের পত্নী চিত্রাঙ্গদাকে বীরাঙ্গনারূপে চিত্রিত করা হয়েছে। অবশ্য এ সব সত্ত্বেও মহাভারত আর রামায়ণে পুরুষেরই প্রাধান্য, আর এখানে যে সমাজ চিত্রিত হয়েছে তা নিশ্চিতভাবেই পিতৃতান্ত্রিক। পুরুষের বহুবিবাহ খুবই সাধারণ ব্যাপার ছিল, বিশেষত মহাভারতে। কিন্তু আশ্চর্য ব্যাপার, নারীর বহুপতিত্বেরও একটি দৃষ্টান্ত আছে। দ্রৌপদী পাণ্ডবদের সকলকেই স্বামীত্বে বরণ করেছিলেন।

হাজার হাজার বছর ধরে এই মহাকাব্য দুটি থেকে অজস্র উপাদান পেয়েছে সাহিত্য, নাটক, সংগীত আর লোককাহিনি। উত্তরকালের অধিকাংশ

সংস্কৃত-সাহিত্যিক মহাভারত থেকে লেখার বিষয়বস্তু সংগ্রহ করেছেন। এমনকি যারা খুব পরিশীলিত নন, মহাকাব্য দুটি তাঁদের কাছেও গল্প কাহিনির বিপুল ভাণ্ডার। আর লোকসাহিত্যের প্রায় সব শাখাতেই এদের প্রভাব প্রবল। ক্রমশ ভারতীয় প্রভাবের সঙ্গে সঙ্গে এ দুটি মহাকাব্য ছড়িয়ে পড়েছে ভারতের বাইরে—ইন্দোনেশিয়া, কম্বোজ, শ্যাম, দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার আরও নানা অঞ্চলে। সেখানকার শিল্প, সাহিত্য, নাটক, ধর্মে এদের প্রভাব খুঁজে পাওয়া যায়। বিদেশি সংস্করণে মহাকাব্যের কাহিনির সামান্য রূপান্তর ঘটেছে। পরিবর্তনের উৎস-সন্ধান সেও বেশ একটা চিত্তাকর্ষক চর্চা।

এই মহাকাব্য দুটিতেই পৌরাণিক কাহিনি সব নিঃশেষ হয়ে যায়নি। বস্তুত বিপুলসংখ্যক কাহিনি রয়েছে যার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় তাৎপর্য প্রচ্ছন্ন। এদের মধ্যে বোধ হয় সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষ্ণুপুরাণ আর ভাগবত। প্রথমটি গুরু (পরাশর) আর তাঁর শিষ্যের (মৈত্রেয়) মধ্যে কথোপকথনের আকারে রচিত। পুরাণের শিক্ষাকে পরাশর সংক্ষেপে উপস্থিত করেছেন এইভাবে, "এই বিশ্বের উৎপত্তি বিষ্ণু থেকে। এর স্থিতিও তাঁরই মধ্যে, এটি এক ছন্দোময় সুসম্বন্ধ ব্যবস্থা। বিষ্ণুই এর একমাত্র রক্ষাকর্তা, একমাত্র নিয়ন্তা, আর আসলে এই বিশ্বই তিনি।" (বিষ্ণুপুরাণ ১, ৯, ৩৫)। এ কথাই বলা হয়েছে যে ঈশ্বরকে নানা নামে ডাকে নানাজনে, কিন্তু তিনি অবশ্যই এক এবং কেবলমাত্র এক। এই বিশ্বজগৎ তাঁর লীলা। নির্জন একই নিজেকে আনন্দের সঙ্গে প্রকাশ করেন এই বর্ণগন্ধ শব্দ স্পর্শময় সগুণ সৃষ্টিতে।

ভাগবতের দর্শন মূলত বিষ্ণুপরাণের দর্শনের সঙ্গে এক। বিশ্ব যে বিষ্ণুরই প্রকাশ এবং শাশ্বত সত্যই যে ব্রহ্ম, পরমাত্মা, ভগবৎ সে কথা এই দর্শন স্বীকার করে। সৃষ্টিকে বোঝানোর জন্য লীলার তত্ত্বটি ব্যবহার করা হয়েছে। ভাগবতে ঈশ্বরের অবতাররূপে আসার তত্ত্বটির ভূমিকা বেশ গুরুত্বপূর্ণ। এখানে যদিও বলা হয়েছে অবতার অসংখ্য তবু কৃষ্ণকে শ্রেষ্ঠ অবতার হিসেবে একটু স্বতন্ত্র দৃষ্টিতে দেখা হয়ে থাকে। আসলে অধিকাংশ পুরাণই কৃষ্ণ আর তাঁর ভক্তদের কাহিনি।

ভাগবতের সামাজিক আর রাজনৈতিক ভাবনা বা তত্ত্বগুলো কিন্তু পণ্ডিতদের মনোযোগ তেমন আকর্ষণ করেনি, যদিও করা উচিত ছিল।

এর মধ্যে এমন কিছু ভাবনা আছে যা স্পষ্টতই আধুনিক। কিছু দৃষ্টান্ত উপস্থিত করি। বলা হয়েছে, জীবনধারণের মানুষের প্রাথমিক প্রয়োজনটুকু দাবি করার অধিকার প্রত্যেকেরই আছে। অতিরিক্ত সম্পদ জমানো চুরি করারই সমান, আর তা শাস্তিযোগ্য। (ভাগবত, ৭, ২৪, ৮)। ভাগবতের মধ্যে কোথাও কোথাও রীতিমতো যুক্তিসিদ্ধ ভাবনার প্রকাশও দেখা যায়। বৈদিক বৃষ্টির দেবতা ইন্দ্রর কাছে ভাল শস্যের জন্য প্রার্থনারত লোকদের কৃষ্ণ বলছেন, "বাষ্পের দ্বারা চালিত হয়ে মেঘ সর্বত্র বৃষ্টিপাত করে, মানুষ তাতেই বাঁচে। ইন্দ্র কী করতে পারে।" (ভাগবত, ১০, ১৪, ২৩)। ধর্মজগতের প্রামাণ্য দলিল হিসেবে ভাগবতের গুরুত্ব অপরিমেয় কারণ এর মধ্যে রীতিমতো বিশদভাবে এক চিত্তাকর্ষক জীবনদর্শনের প্রকাশ ঘটেছে।

১৫

ষড়দর্শন

ভারতীয় ধর্মচিন্তার প্রকাশ ঘটেছে বেশ কয়েকটি দর্শনের মধ্যে দিয়ে। হিন্দু ধর্মতত্ত্বের দিক থেকে সূত্র পর্বের[১] দার্শনিক মতবাদগুলোর চর্চা রীতিমতো গুরুত্বপূর্ণ। এই দার্শনিক তত্ত্বের অধিকাংশই পুরোপুরি গড়ে উঠেছিল আনুমানিক দুশো খ্রিস্টাব্দে। অবশ্য এই সব মতবাদের সূত্রপাত ঘটেছিল অনেক আগেই, আটশো খ্রিস্টাব্দের কাছাকাছি।

সূত্রপর্বের প্রধান মতবাদগুলো হল ন্যায়, বৈশেষিক, সাংখ্য, যোগ, পূর্ব-মীমাংসা এবং বেদান্ত। এদের মধ্যে ন্যায় আর বৈশেষিক এক গোত্রের, সাংখ্য আর যোগ অনেকাংশে মেলে এবং পূর্ব-মীমাংসা আর বেদান্ত পরস্পর সম্পর্কিত।

ন্যায় প্রধানত তর্কের পদ্ধতি-বিষয়ে লেখা, বৈশেষিকের উপজীব্য জগতের প্রকৃতি। এ দুটিই একে অন্যের সিদ্ধান্ত মেনে নেয়। ন্যায়শাস্ত্রের বিচারের পদ্ধতি মেনে চলে বৈশেষিক। আর ন্যায়ও স্বীকার করে নেয় বিশ্বের পরমাণুবাদী গঠনতন্ত্র বিষয়ে বৈশেষিক দর্শনের সিদ্ধান্ত। ন্যায়ের মতে জ্ঞানের চারটি উৎস—প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান, শব্দ। ন্যায়বাদীরা কার্যকারণ সম্বন্ধের তত্ত্বকে স্বীকার করে, কিন্তু কার্যকারণ-বিহীন ঘটনা কিংবা কারণের বহুত্ব ইত্যাদিকেও যথেষ্ট গুরুত্ব দেয়। যুক্তিবিচার পদ্ধতি নিয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা আছে। আর পদ্ধতির বিশ্লেষণটি লক্ষণীয়ভাবে মিলে

১. অতি সংক্ষিপ্ত পরিসরে ব্যাপক পাঠকগোষ্ঠীর জন্য লেখার কারণেই গ্রন্থকার 'সূত্রপর্ব' শব্দটি ব্যবহার করেছেন যথেষ্ট বিবেচনা করেই। তবে মনে রাখা ভাল, ভারতে দার্শনিক চিন্তার জগৎটি জটিল ও বিমিশ্র। এখানে একই সঙ্গে সংহত সূত্রে তত্ত্বের উপস্থাপন আর প্রাকৃতজনের জন্য বিশদ আলোচনা অথবা বিরোধী পক্ষের কাছে বিশেষ প্রয়োজনেই বক্তব্যের ব্যাপক বিস্তার পাশাপাশি চলেছে। কখনও বা সূত্র আর বিস্তার পালাক্রমেও আছে।—অনুবাদক

যায় অ্যারিস্টটলের ন্যায়সম্মত (অবরোহী) যুক্তিধারার সঙ্গে। ম্যাক্সমুলার প্রমুখ কয়েকজন এটিকে নিছক সন্নিপাত বা সমাপতন বলে মনে করেন। অন্যরা বিশ্বাস করেন, এর মধ্যে ভারতীয়দের কাছে গ্রিকদের কিংবা গ্রিকদের কাছে ভারতীয়দের সারস্বত ঋণের অকাট্য প্রমাণ রয়েছে। এ বিষয়ে যথেষ্ট ঐতিহাসিক গবেষণার অভাবে নিশ্চিত কোনও সিদ্ধান্তে আসা সম্ভব নয়।

ন্যায়ের প্রথম প্রধান প্রবক্তা হলেন গৌতম। খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতকের মানুষ তিনি। তাঁর 'ন্যায় সূত্র'ই এ বিষয়ে প্রথম সুসম্বদ্ধ অবতারণা। ন্যাঁয়ের ইতিহাসকে দুটি পর্বে ভাগ করা যায়। প্রাচীন ধারা শেষ হয় মিথিলার গঙ্গেশ উপাধ্যায়ে (বারোশো খ্রিস্টাব্দ) এসে। গঙ্গেশ নব্য ধারার প্রবর্তক। তাঁর 'তত্ত্বচিন্তামণি' হল দ্বিতীয় পর্বের প্রামাণ্য গ্রন্থ। বেদান্তবাদী সম্প্রদায়ের সদস্য শ্রীহর্ষের বক্তব্য ছিল, বহির্বিশ্ব বিষয়ে জ্ঞান নিয়ে ন্যায়ের বিচার পদ্ধতি কোনও কাজেরই নয়, একটি বস্তুর অস্তিত্ব আছে কি নেই কোনোকালেই তা প্রমাণ করা সম্ভব হবে না। অনেকটা শ্রীহর্ষের এই সমালোচনার পরোক্ষ প্রবর্তনায় গঙ্গেশ উপাধ্যায় আরও কঠোরভাবে সুসম্বদ্ধ করলেন তাঁর তাত্ত্বিক ভাবনাকে। ন্যায়দর্শনের সমালোচক হরেক রকমের। কিন্তু মজার কথা হল, এই দর্শনকে নস্যাৎ করার জন্য এঁরা বেশির ভাগ ন্যায়েরই যুক্তিবিচার পদ্ধতি ব্যবহার করেছেন। আর এটাই বুঝিয়ে দেয় ভারতীয় দর্শনের ইতিহাসে ন্যায়ের গুরুত্ব কতখানি।

বৈশেষিক দর্শনের বিশেষ আগ্রহ সৃষ্টিতত্ত্বে। এই দর্শনের মতে জাগতিক সমস্ত বস্তুই চার রকমের পরমাণু দিয়ে তৈরি। ক্ষিতি, অপ্, তেজ এবং মরুৎ এই চারটি উপাদানের (পরমাণুর) নানান রকম সংযোগে বিভিন্ন রকমের বস্তু তৈরি হয়। কিন্তু জগতের সব উপাদানই জড়বস্তু বা পদার্থ নয়। প্রকৃতপক্ষে বৈশেষিক মতে নয়টি উপাদান আছে। যে চারটির কথা বলা হয়েছে সেই বস্তু-পরমাণু ছাড়া আছে ব্যোম, কাল, আকাশ বা ইথার, মন এবং আত্মা। এতে ব্যক্তি-ঈশ্বরের স্বীকৃতি আছে। তিনি বিশ্ব সৃষ্টি করেছেন, কিন্তু শূন্য থেকে বা নাস্তিত্ব থেকে নয়। বিশ্বসৃষ্টির আগে এই নয়টি উপাদান ছিল। তিনি সেগুলো দিয়ে এই সুসম্বদ্ধ বিশ্বলোক রূপায়িত করলেন। এইভাবে ঈশ্বর জগতের স্রষ্টা, কিন্তু এর উপাদানগুলোর নয়। তাই বৈশেষিক দর্শন নিরীশ্বরবাদী না হলেও

অধিকাংশ ঐতিহ্যবাহী হিন্দু ধর্মতত্ত্ব থেকে আলাদা। বস্তুত এই মতবাদের জগতে এত মুক্তমনা মনস্বীপুরুষ ছিলেন যে বেদান্তের প্রখ্যাত প্রবক্তা শঙ্করাচার্য বৈশেষিক মতবাদের অনুসারীদের বলেছেন 'অর্ধবৈনাশিক' অর্থাৎ অর্ধেক নিরীশ্বরবাদী।

এই সম্প্রদায়ের প্রথম বিখ্যাত সদস্য হলেন কণাদ (খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দ)। তাঁর 'বৈশেষিক সূত্র' এই মতবাদের জগতে যে স্থান অধিকার করে আছে তার সঙ্গে তুলনা চলে ন্যায়শাস্ত্র জগতে 'ন্যায়সূত্র' গ্রন্থটির। ন্যায়-এর মতো বৈশেষিকের দুটি পর্ব। প্রকৃতপক্ষে ইতিহাস জুড়ে এই দুই মতবাদ পরস্পর নিবিড়ভাবে যুক্ত হয়েছে। এই দুটি হিন্দু-দর্শনের অপেক্ষাকৃত বিশ্লেষণাত্মক শাখার প্রতিনিধিত্ব করে।

সাংখ্যদর্শনের প্রবর্তক কপিল। সম্ভবত তিনি খ্রিস্টপূর্ব সপ্তম শতকের মানুষ। এক হিসেবে এই তত্ত্বটিকে দ্বৈতবাদীর মতোই মনে হয়। কেননা তত্ত্বটি বিশ্বে দুটি মূল বিভাগকে স্বীকৃতি দেয়—পুরুষ আর প্রকৃতি। এক দিকে পুরুষ অর্থাৎ আত্মা, চেতনাময় শাশ্বত সত্তা। অন্য দিকে প্রকৃতির প্রচ্ছন্ন শক্তি, যা সমস্ত বস্তুবিশ্বের অস্তিত্বের মূলাধার। এর মধ্যে শুধু পদার্থই নেই, আছে সমস্ত রকমের প্রাকৃতিক সম্পদ—ভৌতও তার অন্তর্গত। সাংখ্য মতে মূল বস্তু এই প্রকৃতি থেকেই বিশ্বের প্রকাশ। এই প্রকাশ সম্ভব হয়েছে পুরুষের প্রভাবেই। বিশ্বের ইতিহাস এই প্রকাশের ইতিহাস।

কার্যকারণ প্রণালীতে সাংখ্যের প্রবল বিশ্বাস। বস্তুত একেই সে ব্যবহার করে প্রকৃতির শাশ্বত অস্তিত্বের প্রয়োজন বোঝানোর জন্য। কেননা শূন্য থেকে কোনও কিছুরই উদ্ভব হয় না। যখন কারণ আর তার ফল পরস্পর মিলহীন ভিন্ন বস্তু তখনও কিন্তু ফল কারণের মধ্যেই বর্তমান, সাংখ্যের এই দাবি। প্রথমটির বিন্যাস দ্বিতীয়টির থেকে আলাদা, কিন্তু উপাদান একই। একটি পাত্র মাটির তাল নয়, যদিও মাটি থেকেই এর উৎপত্তি। কিন্তু তাদের মূল উপাদানটি এক। মূল বস্তুর অনশ্বরতার সম্পর্কে এক নিগূঢ় বিশ্বাস রয়েছে এই তত্ত্বে। ন্যায়-বৈশেষিক দর্শন এই কার্যকারণ সম্পর্ক প্রণালীর তীব্র সমালোচনা করেছে। এই ব্যবধানের বা বিরোধের অনেকখানিই বাচিক কিন্তু কার্যকারণ ; অর্থাৎ সৃষ্টি সম্পর্কেই এদের দৃষ্টিভঙ্গিতে কিছু পার্থক্য যথার্থই আছে।

হিন্দু দর্শনে সাংখ্যের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ দান হল ত্রিগুণ-তত্ত্ব। ত্রিগুণ অর্থে স্বভাবের তিনটি গুণ—সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ। প্রকৃতির এই বিরোধী তিনটি গুণ এর প্রকাশে বা বিবর্তনে নানা ভূমিকা নেয়। সত্ত্ব প্রধানত প্রকৃতির অভিব্যক্তির আর তার বিবর্তনের সচলতার দায়িত্বে। রজঃ থেকেই নানান কর্মতৎপরতার জন্ম। তমঃ থেকে জন্ম নেয় জড়িমা আর অসাড়তা। এই ত্রিগুণ পরস্পরবিরোধী হলেও সৃষ্টির বিবর্তনে এদের ভূমিকা আছে। সে বিবর্তন আসে নানান স্তর বেয়ে। প্রথমেই রয়েছে বুদ্ধির বিকাশ। একে বর্ণনা করা হয়েছে 'মহৎ' নামে। তার পর আসে অহং বোধ। ক্রমশ বিকাশ লাভ করে পাঁচটি অঙ্গ-সঞ্চালক দেহযন্ত্র, পাঁচটি চেতনা-সঞ্চারী দেহযন্ত্র, আর সুনিয়ন্ত্রিত মন।

দেহের বন্ধন থেকে মুক্তির জন্য দরকার পুরুষ ও প্রকৃতির মধ্যে, আত্মা আর অনাত্মার মধ্যে প্রভেদের জ্ঞান। আত্মা আর বুদ্ধি অভিন্ন এমন বিভ্রান্তি দেখা দেয়। এই ভেদজ্ঞান জন্ম নিলে আত্মা আর প্রকৃতির দ্বারা বদ্ধ হয় না। ব্যক্তি তখন সংসারে ঘটনাপ্রবাহের নিরাসক্ত দর্শকের ভূমিকায় থাকে। মৃত্যুতে পুরুষ আর প্রকৃতির মধ্যে বন্ধন সম্পূর্ণ ছিন্ন হয় এবং তখন অন্য আত্মাদের থেকে স্বতন্ত্র এই মুক্ত আত্মা পুনর্জন্ম থেকে অব্যাহতি লাভ করে। এই দর্শনে বলা হয়েছে, বন্ধনের জন্ম অজ্ঞান থেকে, আর জ্ঞানেই মুক্তি।

সাংখ্যকে বলা হয় নাস্তিকভাবাপন্ন দর্শন। এটা অবশ্য সম্পূর্ণ যথার্থ নয়। সাংখ্যপ্রবচন সূত্র (কপিল-রচিত) ঈশ্বরের অস্তিত্ব নিয়ে অনুমানকে নিষ্প্রয়োজন জ্ঞান করে। অস্তিত্বকে অস্বীকারও করে না অবশ্য। ঈশ্বরের অস্তিত্বকে প্রমাণ করা যায় না কোনও তথ্য দিয়ে, এই হল এর অভিমত। পরবর্তীকালের সাংখ্য দার্শনিকরা, মনে হয় এই অজ্ঞেয়বাদী অবস্থান ছেড়ে ঈশ্বরের অস্তিত্বকে স্বীকারই করে নিয়েছেন। এমনকি বিজ্ঞানভিক্ষু সাংখ্যমতের সঙ্গে বেদান্তমতের সামঞ্জস্যবিধানেরও চেষ্টা করেছেন।

যোগের দার্শনিক ভিত্তি সাংখ্যের ভিত্তির মতোই। শুধু এই দর্শনে ব্যক্তি-ঈশ্বরের কথা বলা হয়েছে। ঈশ্বর বিবর্তনের প্রক্রিয়ার নিয়ন্তা। আর প্রত্যাশিতভাবেই তিনি সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিমান। তিনি পর্যায়ক্রমে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে ধ্বংস করেন, তারপর আবার নতুন করে শুরু করেন সৃষ্টি প্রক্রিয়া।

যোগসাধনা হল যোগাভ্যাস—শরীর ও মনের ব্যায়াম, যার মধ্যে রয়েছে সবচেয়ে দুরূহ অভ্যাস—দেহমনকে সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় রাখা। এই যোগাভ্যাস দেহমনের স্বাস্থ্য বাড়ায়। কিন্তু সেই আধিভৌতিক লাভ ছাড়াও মুক্তিকে সহজসাধ্য করে বলে মনে করা হয়। জ্ঞানেই কেবল মুক্তি সম্ভব—সাংখ্যের মতো এই তত্ত্বে যোগাদর্শনের বিশ্বাস নেই। মুক্তিলাভের প্রক্রিয়ায় দেহমনের সংযম-সাধনার ভূমিকায় তার আস্থা। একাগ্রতার সাধনায় নানা উপায়ের কথা বলা হয়েছে। সেই সঙ্গে প্রকৃতির উপর আরও নির্ভরশীল করে তুলে আমাদের বন্ধনকে বাড়িয়ে দেয়, এমন মানসিক প্রবৃত্তিকে সংযত করার উপায়ের কথাও আছে। ভারতে এখনও যোগব্যায়ামের ব্যাপক প্রচলন রয়েছে। মুক্তিকামী সাধক ছাড়াও এমন অনেক মানুষ আছে যারা দেহমনের সুস্থতার জন্যই যোগব্যায়ামের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে। এ ছাড়াও এমন কিছু মানুষ অবশ্যই আছে, কিছু ইউরোপীয়ও এর অন্তর্ভুক্ত, যারা আকৃষ্ট হয় এই আশ্বাসে যে যোগব্যায়াম বা যোগাভ্যাস অলৌকিক শক্তির অধিকারী করে। আশ্চর্যের ব্যাপার, এই আশ্বাস সে যুগের মতো এ যুগেও মানুষের মনকে প্রলুব্ধ আর প্রভাবিত করে চলেছে সমানভাবে।

এবার আমরা আসব শেষ গোষ্ঠীর প্রসঙ্গে—পূর্ব-মীমাংসা আর বেদান্ত। প্রথম সাধন-ধারাটির প্রধান শাস্ত্রগ্রন্থ হল পূর্ব-মীমাংসা সূত্র। এই সূত্র জৈমিনির রচনা (খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতক)। পাণ্ডিত্যপূর্ণ রচনাটি প্রায় সবটিই হল বেদের ব্যাখ্যা। দর্শনের এই ধারাটির উৎসাহ প্রধানত ধর্মের প্রকৃতি অনুসন্ধানে। বেদকে এ অভ্রান্ত আর ধর্মের একমাত্র বিশেষজ্ঞ বলে মনে করে। তাই একে মোটামুটি সনাতনপন্থীই বলা যায়। এর আগ্রহ অনেকটাই ব্যবহারিক বা ফলিত ক্ষেত্রে, দূরকল্পনার জগতে নয়। দার্শনিক মতবাদ হিসেবে যদিও তেমন গুরুত্ব নেই, এ হল বেদকে ব্যাখ্যা করার এক কার্যকর পদ্ধতি।

আজ পর্যন্ত দার্শনিক মতবাদগুলোর মধ্যে সবচেয়ে প্রভাবশালী হল বেদান্ত। এর উৎপত্তি উপনিষদ থেকে আর মূল তত্ত্ব হল ঔপনিষদিক ব্রহ্মবাদ। বাদরায়ণ এর প্রবর্তক। তাঁর ব্রহ্মসূত্র (অন্য নাম উত্তর-মীমাংসা) উপনিষদ এবং ভগবদ্গীতার সঙ্গে একযোগে বেদান্ত দর্শনের ভিত্তি রচনা করেছে। বেদান্তের সবচেয়ে খ্যাতিমান ব্যাখ্যাতা নিঃসন্দেহে শঙ্করাচার্য।

খ্রিস্টীয় অষ্টম শতকে দক্ষিণ ভারতে তাঁর আবির্ভাব। বেদান্ত দর্শনের দুটি প্রধান ভাগ––কট্টর অদ্বৈতবাদ আর নানান মাত্রার দ্বৈতবাদ। শঙ্কর ছিলেন প্রথম ধারার তাত্ত্বিক।

শঙ্করের পূর্বসূরি গৌড়পাদ কট্টর অদ্বৈতবাদে বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি দ্ব্যর্থহীনভাবে ঘোষণা করেছিলেন যে, এই জগৎ মিথ্যা ব্রহ্মাই একমাত্র সত্য। বস্তুজগৎ সবই কাল্পনিক এবং আমাদের জাগ্রত অবস্থার অভিজ্ঞতা আর স্বপ্নের মধ্যে কোনোই পার্থক্য নেই। সমগ্র বিশ্বই এক বিপুল মায়া, ব্রহ্ম ছাড়া আর কোথাও কিছু নেই। আধ্যাত্মিক নির্বিকল্পবাদী বৌদ্ধ নাগার্জুনের মতোই গৌড়পাদ পরিবর্তনের সম্ভাবনা কিংবা কার্যকারণ সম্বন্ধের যথার্থ্যকে অস্বীকার করেন। 'কোনও ধ্বংস নেই, সৃষ্টি নেই, কেউ বদ্ধ নয়, কেউ মুক্তির জন্য সচেষ্ট নয়, কেউ মোক্ষপ্রার্থী নয়, মোক্ষপ্রাপ্তও নয়,এই হল একমাত্র সত্য।'

শঙ্করের অবস্থান অতটা প্রান্তিক নয়। ব্রহ্ম আর আত্মার অভিজ্ঞতা বা অদ্বয়ের কথা বললেও, জগৎ সেই পরমসত্যের বাইরে এ কথা অস্বীকার করলেও, তিনি জগৎকে বিশুদ্ধ মায়া বলে স্বীকার করেননি। জাগ্রত অবস্থার অভিজ্ঞতা স্বপ্ন থেকে স্বতন্ত্র, বাইরের বস্তুজগৎ ব্যক্তিগত চেতনারই রূপমাত্র নয়,এই তাঁর অভিমত। শঙ্কর জগতের অস্তিত্বকে বুঝিয়েছেন একটি উপমা দিয়ে। দড়িকে দেখে কেউ সাপ বলে ভুল করতে পারে। দড়িটাকে ভালভাবে পরীক্ষা না করা পর্যন্ত সাপের উপস্থিতি। জগৎকে ঐ সাপের সঙ্গে তুলনা করা যাক, আর ব্রহ্মকে দড়ির সঙ্গে। সত্যের বোধ হলে আমরা বুঝতে পারি, এই জগৎ আসলে ব্রহ্মেরই প্রকাশ। এই জগৎ সত্য নয়, আবার ঠিক মিথ্যাও নয়। ব্রহ্মর অস্তিত্বের উপরই এই রূপের অধিষ্ঠান। ব্রহ্ম আর জগতের মধ্যে সঠিক সম্পর্ক মুখে বলা যায় না, একেই কখনও বলা হয় মায়া।

ব্রহ্ম সম্বন্ধে মন্তব্যকে বোধগম্য করে তুলতে হলে অভিজ্ঞতালব্ধ প্রকাশভঙ্গির আশ্রয় নিতে হবে। যাঁরা বিজ্ঞ তাঁরা জানেন, ভাবনাকে সাকার করার প্রয়োজনেই প্রকাশের এই ভঙ্গিমা। আর মূঢ়দের ধারণা এই বুঝি বাস্তব সত্য। এটাও বোঝা দরকার যে, ব্রহ্ম আর জগতের সম্বন্ধটি প্রতিবর্তনযোগ্য নয়। ব্রহ্ম ছাড়া জগৎ সম্ভব নয়, কিন্তু ব্রহ্মের অস্তিত্ব

জগতের অস্তিত্বের উপর নির্ভর করে না। যেমন সাপের অস্তিত্ব দড়ির অস্তিত্বের উপর নির্ভরশীল, কিন্তু উলটোটা নয়।

জীবাত্মা ব্রহ্মের বিশিষ্ট প্রকাশ। সমস্ত আপদের মূল অবিদ্যার কারণে আমিত্ববোধ বা অহংকারের উদ্ভব। পরিণামে আসে মুক্তি এবং সে মুক্তি আসে পরম একের সঙ্গে জীবাত্মার ঐক্যের বাস্তব উপলব্ধিতে (নিছক তাত্ত্বিক স্বীকৃতিতে নয়)। ব্যক্তি এই অবস্থায় উত্তীর্ণ হলে জীবন্মুক্ত হয়। তখন সে সমস্তকে সেই ঐক্যে আচ্ছন্ন দেখে। তার সব কাজই তখন হয় নিঃস্বার্থ, নিষ্কাম। তারপর মৃত্যুতে সব বন্ধন থেকে মুক্তিলাভ সম্পূর্ণতায় পৌঁছায়। নশ্বর দেহ ত্যাগ করে আত্মা হয় সম্পূর্ণ স্বাধীন।

পরবর্তী কিছু বৈদান্তিক উপনিষদের একটু ভিন্ন ব্যাখ্যা দিয়েছেন। রামানুজ ও মধ্বাচার্য নামে দুই বৈষ্ণব পণ্ডিত দ্বৈতবাদী শাখায় বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বস্তুত রামানুজ-দর্শন অদ্বৈতবাদের এক ভিন্ন ভাষ্য। সংক্ষেপে তাঁর বক্তব্য হল, এই জগৎ, আত্মা এবং ঈশ্বর আপাত পৃথক হলেও বস্তুত স্বতন্ত্র নয়। ব্যক্তিক আত্মা এবং এই প্রত্যক্ষ জগৎ ঈশ্বরের দেহের মতো, এবং এ দুয়ের যোগে ঈশ্বর হলেন ব্রহ্ম। এইভাবে ব্রহ্মের মধ্যেই সবকিছুর অবস্থান, কিন্তু ব্যক্তি-আত্মা আর ঈশ্বর পৃথক। পরে আমরা দেখব, এই তত্ত্বই বৌদ্ধিক স্তরে ভক্তি-আন্দোলনকে স্বীকৃতি দিতে সাহায্য করেছে। ভক্তি-আন্দোলনের মূল কথা, জ্ঞান নয় ভক্তির পথে ঈশ্বরলাভ।

রামানুজ একাদশ শতকের মানুষ। মধ্বাচার্যের আবির্ভাব ত্রয়োদশ শতকে। ব্রহ্ম আর জীবাত্মা দ্বৈততত্ত্বে বিশ্বাসী ছিলেন তিনি। তাই তাঁর দর্শনের নাম দ্বৈতবাদ। বস্তুত তিনি বস্তুজগতের অস্তিত্বকেও স্বীকার করেছেন। এইভাবে তিনি নিয়ে এসেছেন তৃতীয় সত্তার কথা। ব্রহ্ম বা ঈশ্বর (বিষ্ণু) হলেন সর্বোচ্চ সত্য, তিনি সর্ব, তিনি সম্পূর্ণ। কিন্তু জগৎও বাস্তব। শঙ্কর আর মধ্বের দর্শনের মধ্যে তফাতটি সহজেই নজরে পড়বে। বোঝা যায়, বৈষ্ণব ধর্মান্দোলন মধ্বের এই দর্শনের কাছে কতখানি ঋণী।

আমরা সংক্ষেপে এবং স্বভাবতই নিতান্ত অসম্পূর্ণভাবে হিন্দু-দর্শনের প্রধান তত্ত্বগুলোর পরিচয় দিলাম। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের তত্ত্বভাবনায় ব্যাপক ভিন্নতা সহজেই ধরা পড়বে। এর মধ্যে রয়েছে অদ্বৈতবাদ, দ্বৈতবাদ, সর্বেশ্বরবাদ, এমনকি বিশুদ্ধ অজ্ঞেয়বাদ। কেউ বলেন, ঈশ্বর বিশ্ব সৃষ্টি

করেছেন শূন্য থেকে। অন্যদের মত বস্তু বা পদার্থ চিরদিনই ছিল, ঈশ্বর শুধু সুশৃঙ্খল বিশ্ব সৃষ্টির উদ্দেশ্যে তাকে নতুন রূপ দিয়েছেন মাত্র। আবার কেউ বিশ্ব এবং প্রাণের বিকাশকে পুরুষের প্রভাবে প্রাকৃতিক বিবর্তনের প্রক্রিয়া হিসেবেই দেখেছেন, যে ক্ষেত্রে ঈশ্বরের উপস্থিতি জরুরি নয়। আবার অন্যরা ভাবেন, এই জগৎ ঠিক সত্য নয়, ঈশ্বরেরই একটি দিকমাত্র এবং আসলে আদৌ কোনও সৃষ্টিই নেই। নানান ধর্মীয় নেতারা নানান সম্প্রদায়ের অন্তর্গত এবং অধিকাংশ হিন্দুই গর্ব অনুভব করেন এই ভেবে যে, এ নিয়ে কখনও কোনও তীব্র সংঘাত কিংবা অত্যাচার হয়নি। পারস্পরিক সহিষ্ণুতার তারিফ করতে হয়। এ হল এমন একটা ক্ষেত্র যেখানে কোনও একটি তত্ত্ব সব রহস্যের ব্যাখ্যা করার দাবি করতে পারে না এবং সহিষ্ণুতাই আমাদের নিয়ে যায় বিভ্রান্তি নয়, প্রজ্ঞার জগতে।

১৬

বহির্ভারতে হিন্দুধর্ম

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় হিন্দু ধর্ম আর সংস্কৃতির বিস্তার ঘটে আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব প্রথম সহস্রাব্দের মাঝামাঝি সময়। বহু প্রাচীন কাল থেকেই ভারতবর্ষ জাভা, সুমাত্রা, কম্বোজ, বর্মা, মালয়, থাইল্যান্ড এবং আরও নানা দেশের সঙ্গে ব্যাপক বাণিজ্যিক সম্পর্ক গড়ে তুলেছিল। খানিকটা এই বাণিজ্যিক সম্পর্ক, খানিকটা রাজনৈতিক বিজয় এবং খানিকটা ভারতীয় ঔপনিবেশিকদের প্রবাসনের ফলেও হিন্দু সংস্কৃতি বিশ্বের এই সব অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে।

রামায়ণে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সুবর্ণদ্বীপ এবং যবদ্বীপের উল্লেখ আছে। এই সব নামে যে ভৌগোলিক অঞ্চলগুলোর কথা বলা হয়েছে তা শনাক্ত করা খুব কঠিন। তবে মনে হয় শেষেরটি জাভা আর প্রথমটি সুমাত্রা আর মালয় উপদ্বীপ। পুরাণেও মালদ্বীপের উল্লেখ আছে। চৈনিক রাজবংশের কালানুক্রমিক ইতিহাসে উল্লেখ করা হয়েছে, খ্রিস্টীয় প্রথম শতকে কম্বোজে কৌণ্ডিন্য নামে এক ব্রাহ্মণ হিন্দু রাজত্ব স্থাপন করেন ('ফুনান' এই নামে)। দ্বিতীয় শতক থেকে মালয় উপদ্বীপে হিন্দু রাজত্বের অস্তিত্ব ছিল, এ কথাও চৈনিক ইতিবৃত্তে আছে। এই শতকে অবস্থিত কম্বোজের উপরে ভারত-চিন উপকূলে চম্পারাজ্য (লিন-য়ির রাজত্ব) ছিল, এ কথা চিনা ইতিবৃত্তে রয়েছে। খ্রিস্টীয় চারশো অব্দের আগেকার সংস্কৃত লিপিতে জানানো হয়েছে, এক হিন্দু সম্রাটের দ্বারা চম্পারাজ্যটির ভারতীয়করণ হয়েছিল। থাইল্যান্ডে এ পর্যন্ত খননের সাহায্যে পাওয়া প্রাচীনতম ভারতীয় সামগ্রীর মধ্যে রয়েছে ছোট আকারের ধাতু (ব্রঞ্জ) নির্মিত বুদ্ধমূর্তি। ভারতে দ্বিতীয় আর চতুর্থ শতাব্দীর মধ্যে বিকাশ ঘটেছিল যে শিল্পরীতির সেই অমরাবতী-রীতিতে এগুলো তৈরি। ব্রহ্মদেশের ইতিহাসে দেখা যায় খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতকে

ভারত-সম্রাট অশোক সে দেশে বৌদ্ধ ধর্মপ্রচারক ভিক্ষু পাঠিয়েছিলেন। কোনও কোনও ঐতিহাসিক এই তথ্যের সত্যতা নিয়ে সন্দিহান। তবে এ সম্বন্ধে কোনও সন্দেহ নেই যে ব্রহ্মদেশের সঙ্গে ভারতের যোগাযোগ শুরু হয়েছে বহু প্রাচীনকাল থেকেই। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলের রাজনৈতিক গুরুত্ব কালের সঙ্গে বদলাতে থাকে। খ্রিস্টীয় বর্ষের প্রথম কয়েক শতক ফুনানের (কম্বোজ) ভারতীয়কৃত রাজ্য ছিল এই অঞ্চলের সবচেয়ে শক্তিশালী রাজ্য। এর পতনের পর সুমাত্রার শ্রীবিজয় রাজ্য সমৃদ্ধি লাভ করে। খ্রিস্টীয় অষ্টম শতকে সঞ্জয় নামে এক হিন্দু রাজা জাভায় এক শক্তিশালী রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। পরবর্তীকালে এই শতকেই এ রাজ্য বৌদ্ধ রাজবংশের অধিকারে আসে। এই শৈলেন্দ্র রাজবংশীয়রা শ্রীবিজয়ের সিংহাসনে বসে এক বিশাল সাম্রাজ্য শাসন করেন। অবশ্য খ্রিস্টীয় নবম শতক থেকে আবার জাভায় হিন্দু রাজত্বের পুনঃপ্রতিষ্ঠা ঘটে। একাদশ শতকের প্রথমেই মতরমের রাজত্ব শ্রীবিজয়ের কাছে পরাজিত হয়। কিন্তু আবার এই শতকেরই শেষ দিকে এর পুনরুত্থান ঘটে। চতুর্দশ শতকের মধ্যে পূর্বজাভায় মজপাহিত-এর হিন্দু সাম্রাজ্য বেশ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে।

ষষ্ঠ শতকে কম্বোজের খেমর রাজ্য ফুনান জয় করে। কিছুকাল খেমররা খানিকটা শৈলেন্দ্রবংশের প্রভাবে ছিল। কিন্তু নবম শতকে দ্বিতীয় জয়বর্মণের নেতৃত্বে আবার তাদের পুনঃপ্রতিষ্ঠা ঘটে। এই রাজাই আঙ্কোর রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা। এঁরা প্রধানত হিন্দু হলেও মহাযান বৌদ্ধধর্মেরও সমর্থক ছিলেন।

ব্রহ্মদেশে মূলত দক্ষিণাঞ্চলের মন-জনগোষ্ঠীর মাধ্যমে ভারতীয় প্রভাবের বিস্তার ঘটেছিল। বিধর্মীদের অর্থাৎ বৌদ্ধদের সাম্রাজ্যই ছিল ধর্মীয় সাম্রাজ্যের মধ্যে সবচেয়ে শক্তিমান। এই রাজবংশের বিখ্যাত সম্রাট অনুরথ ছিলেন একাদশ শতকের মানুষ। চতুর্দশ শতকে মোঙ্গল আক্রমণে ধ্বংস হয় এই রাজত্ব।

ত্রয়োদশ শতকের পর থেকে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ইসলামের প্রভাব দেখা যায়। আর অবিলম্বে জাভা, সুমাত্রা এবং আরও কয়েকটি দেশের মানুষ এই নতুন ধর্ম গ্রহণ করে। হিন্দু আর বৌদ্ধ ধর্মের মতো ইসলাম ধর্মও এই অঞ্চলে এসেছে ভারতবর্ষ থেকেই, এটা বিশেষভাবে লক্ষণীয়। অধ্যাপক ব্রায়েন হ্যারিসন (Brian Harrison) মন্তব্য করেছেন—

'পারস্য ও আরবের ব্যবসায়ীরা ঐ সময়টা জুড়েই (ইসলামের প্রবর্তনকাল থেকে সাতশো বছর) এর বন্দরগুলোতে নিয়মিত আসত। ইসলাম ধর্মের সঙ্গে পরিচয় এদেরই সূত্র ধরে। কিন্তু এই ধর্ম গ্রহণযোগ্য হয়ে ওঠে ভারতীয় মুসলমানদের সহায়তাতেই। পারস্য বা আরব নয়, ভারতের কাছেই দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া সব সময় বাণিজ্যিক কৌলীন্যর সঙ্গে সাংস্কৃতিক অনুপ্রেরণার সন্ধান আর প্রত্যাশা করেছে। এই দ্বীপপুঞ্জ আর মালয় উপদ্বীপে ইসলামের স্বীকৃতিকে অপেক্ষা করতে হয়েছে ভারত ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় আন্তর্দেশীয় বাণিজ্যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় নিরত ভারতীয়দের ইসলাম-স্বীকৃতির জন্য। ত্রয়োদশ শতকের আগে এ শর্ত পূরণ হয়নি।'[১]

প্রধানত গুজরাতি বণিক গোষ্ঠীর মাধ্যমেই এ অঞ্চলে ইসলামের প্রভাব ছড়িয়ে পড়েছিল। অবশ্য এই এলাকার কোনও কোনও অংশের মানুষ হিন্দুই রয়ে গেল (যেমন বালি)। আর বর্মা, ইন্দো-চিন, থাইল্যান্ডে বৌদ্ধধর্মের বিকাশ অব্যাহত রইল। এমনকি ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত অঞ্চলেও হিন্দু আর বৌদ্ধ সংস্কৃতি অক্ষুণ্ন থেকে গেল শিল্প, সাহিত্য, পুরাণ আর কিছু পরিমাণে জীবনযাত্রা প্রণালীর মধ্য দিয়ে।

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় হিন্দুধর্মের যে অবদান তার পর্যালোচনা করতে হলে, শুধুমাত্র হিন্দুদের প্রবর্তিত ধর্মীয় বিশ্বাস আর আচারের কথা ভাবলে চলবে না, সেই সঙ্গে এই অঞ্চলের সংস্কৃতির উপর হিন্দু সাহিত্য, ভাস্কর্য, স্থাপত্য এবং সংস্কৃত ভাষার প্রভাবের কথা ভাবতে হবে। এ অঞ্চলের অধিকাংশ দেশেই লেখন-শৈলী এসেছে হিন্দুদের সঙ্গেই, প্রধানত উত্তর ভারত বা দক্ষিণ ভারতের লিপির উপর ভিত্তি করেই এদের অক্ষর বা বর্ণের উদ্ভব। এদের ভাষাগুলোর শব্দভাণ্ডার বিপুলভাবে সমৃদ্ধ হয়েছে সংস্কৃত বা পালিভাষার শব্দ নিয়ে। এদের ভাষাতত্ত্বের আলোচনায় এটা স্পষ্টভাবে ধরা পড়ে। এই সংস্কৃত ভাষার প্রভাব অবশ্যই ধর্মের সঙ্গে নিবিড় সম্পর্কে বাঁধা। কেননা সংস্কৃত বা পালি ভাষা শিক্ষার একটা বড় কারণ হল, হিন্দু আর বৌদ্ধ শাস্ত্রগ্রন্থ পাঠ করার আগ্রহ। ধর্ম-অসম্পৃক্ত সৃষ্টি বহুলাংশে আছে এমন

১. *South-east Asia*—London, 1954, p. 43.

যে সংস্কৃতসাহিত্য তার পঠনপাঠন ঐ আগ্রহেরই একটি ফল বা উপজাত দিক।

এই সব দেশের শিল্পে ভারতীয় হিন্দু ও বৌদ্ধ স্থাপত্য এবং ভাস্কর্যের প্রভাবতো বহু পরিচিত। বরবুদর, লারাজংরং, আঙ্কোরভাট আর অনন্দর জমকালো সুদৃশ্য মন্দিরগুলো এর দৃষ্টান্ত, কারণ এর ভাস্কর্যগুলো ভারতীয় পুরাণের দেবতাদের মূর্তি।

এবার আমি হিন্দুধর্মের রীতিপদ্ধতির প্রসঙ্গে আসব। এখানে বহু অঞ্চলেই সর্বশক্তিমান শিবের পূজা প্রচলিত। যদিও কোনও সময়ে কোনও কোনও রাজবংশে বিষ্ণুরই বেশি গুরুত্ব ছিল। জাভায় লারাজংরং-এর প্রধান মন্দির শিবের নামে উৎসর্গ করা। কিন্তু ঐশ্বর্যময় আঙ্কোরভাট বৈষ্ণবীয় কীর্তি। এখানে বৌদ্ধ আর হিন্দুধর্মে কোনও সংঘাত দেখা দেয়নি। এবং বেশ কিছু মন্দিরে বুদ্ধমূর্তির সঙ্গে হিন্দু পৌরাণিক মূর্তি দেখা যায়। এর পর্বে ভারতেও হিন্দুধর্ম আর বৌদ্ধধর্ম সংঘাত ছাড়াই সহাবস্থান করেছে। সাঙ্গীকরণ আর সমন্বয়ের এই পদ্ধতি দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াতেও লক্ষ্য করা যায়।

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ভারতীয় প্রভাবের আলোচনা করতে গিয়ে কখনও ভোলা উচিত নয় (যদিও দুভার্গ্যজনকভাবে কখনও কখনও ভোলা হয়) যে এই অঞ্চলের প্রকৃতিগত প্রতিভার গুণেই এই অসামান্য সংস্কৃতির বিকাশ সম্ভব হয়েছে। প্রেরণা অবশ্যই হিন্দু এবং বৌদ্ধ, করণকৌশলও প্রাথমিকভাবে ভারতীয়, কিন্তু এই সমগ্র অঞ্চলের অধিবাসীদের প্রতিভাই সেখানে সংস্কৃতিকে এমন সমৃদ্ধ করে তুলেছে। একটি দৃষ্টান্ত দেয়া যাক। প্রাচীন খেমর শিল্প ভারতীয় শিল্পের ঐতিহ্যকে অনুসরণ করেছে পুরোপুরি, কিন্তু আঙ্কোর-পর্বে এমন একটা রীতির উদ্ভাবন ঘটল যা ভারতে উদ্ভূত রীতি থেকে আলাদা। একইভাবে, এই অঞ্চলের হিন্দুধর্মীয় বিশ্বাস মূল ভারতীয় হিন্দু চিন্তাধারা থেকে আলাদা। উদাহরণত, মধ্য জাভায় অগস্ত্য-পূজার প্রাবল্য রীতিমতো লক্ষ্য করার। অগস্ত্য একজন ভারতীয় চরিত্র, হিন্দুপুরাণে তাঁকে এক মহান ঋষি বলে বর্ণনা করা হয়েছে। কিন্তু জাভায় তাঁর উপর এমন দেবত্ব আরোপ করা হয়েছে যা ভারতে কখনও ঘটেনি। এ প্রসঙ্গে এটাও উল্লেখযোগ্য যে, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার কিছু হিন্দুরাজা নিজের উপর অনেকখানি ঐশ্বরিক মহিমা আরোপ করতে পেরেছিলেন, যা তাঁদের

ভারতীয় প্রতিরূপেরা পারেননি। একইভাবে জাভার ত্রয়োদশ শতাব্দীর শিব-বুদ্ধ পূজাপদ্ধতি ও ধর্মীয় মতবাদ ভারতের তান্ত্রিক বৌদ্ধ মতবাদের খানিকটা সমগোত্রীয় হলেও বস্তুত একটি স্বতন্ত্র ধর্মীয় মত।

বিদ্যাবত্তার ক্ষেত্রে, সারস্বত সাধনায় দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অনেকখানি দান আছে। এখানকার বহু পণ্ডিত ভারতে (বিশেষত পূর্ব-বিহারের নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে) গিয়েছিলেন বিদ্যার্জনের উদ্দেশ্যে, বিশেষ করে গোড়ার দিকে, কিন্তু একই সময় দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াতে কোনও কোনও বিদ্যাচর্চা-কেন্দ্র এত ভাল ছিল যে ভারত এবং বিদেশের আরও নানা অঞ্চল থেকে ছাত্ররা আসত সেখানে লেখাপড়ার জন্য। বিখ্যাত চৈনিক বৌদ্ধ পরিব্রাজক আইৎসিং সুমাত্রায় শ্রীবিজয়ে গিয়েছিলেন খ্রিস্টীয় ৬৭১ অব্দে তাঁর ভারত-যাত্রার পথে। তিনি শ্রীবিজয়ে সংস্কৃত ব্যাকরণ শিক্ষা করেছিলেন ছয়টি মাস। বিখ্যাত ভারতীয় বৌদ্ধ পণ্ডিত দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান (অন্য নাম অতীশ) যিনি তিব্বতীয় বৌদ্ধধর্মের সংস্কার করেছিলেন, তিনিও শ্রীবিজয়ে ১০১১ থেকে ১০২৩ পর্যন্ত সুমাত্রার ভিক্ষু-প্রধান ধর্মকীর্তির কাছে পাঠ নিয়েছিলেন। তাই দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় হিন্দু ও বৌদ্ধ সাধনা ও সিদ্ধিকে শুধুমাত্র ভারতের দান হিসেবে দেখা সংগত নয়। এ হল মূলত দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার আপন সাধনায় অর্জিত সাফল্য, হিন্দু ও বৌদ্ধ প্রেরণায় উজ্জীবিত সার্থকতা।

এই প্রসঙ্গে দূর প্রাচ্যের বৌদ্ধধর্মে হিন্দুধর্মের দান আর দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সংস্কৃতিতে এর প্রভাব—এ দুইয়ের তুলনা বেশ ঔৎসুক্যজনক। চিন আর জাপানের বৌদ্ধধর্মের ক্ষেত্রে হিন্দুদের ভূমিকা খ্রিস্ট ধর্মের প্রসঙ্গে ইহুদিদের ভূমিকার সঙ্গে বেশ মিলে যায়—তারাই জন্মের মূলে, অথচ স্বীকৃতি দেয়ার ব্যাপারে (ভারতের ক্ষেত্রে পরবর্তী পর্যায়ে) তারা নেই। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ক্ষেত্রে অবশ্য ভারতের ভূমিকা অনেকটা পশ্চিমি সংস্কৃতির ক্ষেত্রে গ্রিস ও রোমের ভূমিকার সঙ্গে তুলনীয়। ভারতের হিন্দু জুগিয়েছে করণ কৌশল, জুগিয়েছে প্রেরণার উৎস, আর তারই উপর দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার স্থানীয় প্রতিভা গড়ে তুলেছে এক ক্রমবিকাশমান সমৃদ্ধ সংস্কৃতি।

১৭

ভক্তি-ধর্মান্দোলন

হিন্দু ধর্মসাধনার তিনটি পথের মধ্যে জ্ঞানের পথটির একটু শুষ্ক আর কঠিন হবার প্রবণতা আছে। দ্বিতীয় পথ কর্মের অর্থাৎ ধর্মীয় কর্মসম্পাদনের। এটি যেন অনেকটাই সংরক্ষিত, যেন সকলের জন্য নয়। তাই তৃতীয় পথ বা ভক্তির পথটিই যে সবচেয়ে জনপ্রিয় হবে, এতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। এই মত বা বিশ্বাসের প্রকাশ প্রেম আর পূজা বা বন্দনার পথে। আর এর উদ্দিষ্ট এক পরমপুরুষ বা ব্যক্তি-ঈশ্বর। নির্গুণ, নিরাকার পরম ব্রহ্ম নন। স্বভাবতই এই সাধনমার্গ ধর্মের তাত্ত্বিক জটিলতায় আগ্রহী নয় আদৌ, আর এর শিক্ষা বা উপদেশ উপনিষদ, সাংখ্য কিংবা অদ্বৈত বেদান্তের তুলনায় কম জটিল। ঈশ্বরকে এখানে দেখা হয়েছে এমন এক সৃষ্টিকর্তা হিসেবে যিনি পরম প্রেমের পাত্র। এবং এই ভক্তি-আন্দোলনের অভিমুখিতা ধর্মীয় আবেগের উচ্ছ্বাসের দিকে, সর্বব্যাপী ব্রহ্মের স্বরূপ বিষয়ে শান্ত মননের দিকে নয়।

ভক্তি-আন্দোলন প্রধানত বিষ্ণু আর শিবকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছে। শিব হয়তো অনার্য দেবতা।[১] বেদে অপেক্ষাকৃত কম হলেও বিষ্ণুর কিছু সংখ্যক স্তব আছে। কিন্তু মনে করা হয়, তাঁর লোকপ্রিয়তাও কোনও অনার্য দেবতার সঙ্গে একাত্মতার ফলেই ঘটেছে। সুতরাং ভক্তি-আন্দোলন অনার্য উৎস থেকেই এসেছে মনে হয়। পদ্মপুরাণতো ভক্তিকে দ্রাবিড় ভূমির

১. প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস বিষয়ে অনেক বিবৃতির মতো এটিও বোধহয় প্রশ্নাতীত নয়। দ্রষ্টব্য, 'An Historical Sketch of Saivism' by K. A. Nilakanta Sastri, in *The Cultural Heritage of India.* Ramakrishna Centenary Committee, Volume II. Calcutta. pp. 20-23. শৈবধর্ম প্রাক্-বৈদিক এবং অনার্য এই মতবাদে শাস্ত্রীজির সন্দেহ আছে। তিনি অবশ্য স্বীকার করেন, শৈবধর্মে যথেষ্ট পরিমাণে অনার্য উপাদান রয়েছে।

ফসল বলেই ঘোষণা করেছে। এ বিষয়ে সন্দেহ নেই যে, ব্রাহ্মণরা বহু দিন ধরেই এই আন্দোলনের বিরুদ্ধে, কারণ ঐতিহ্যময় ধর্মীয় অনুষ্ঠানের প্রতি এর আগ্রহ নেই আর জাতিভেদের ব্যাপারে এর উদাসীনতা ব্রাহ্মণদের কাছে রীতিমতো পীড়াদায়ক। পরে অবশ্য এই আন্দোলনই যখন বেশি কট্টর হয়ে ওঠে তখন ব্রাহ্মণরাই দলে দলে এসে যোগ দেয় এতে।

মহাভারতে বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের প্রসঙ্গ আছে। কাজেই বৈষ্ণব ধর্মান্দোলন যথেষ্ট প্রাচীন। খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকের হেলিওডোরাস (Heliodorus) নামে এক গ্রিক বিষ্ণুভক্তের কথাও আমরা শুনতে পাই। ভগবদ্গীতায় কৃষ্ণকে বিষ্ণুর অবতার বলেই মনে করা হয়। কৃষ্ণের পূজা প্রথমদিকে সম্ভবত আভীর নামে আদিম জনগোষ্ঠীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। এই আভীররা মথুরা আর দ্বারকার মাঝখানে যাযাবরের মতো দিন কাটাত।

কৃষ্ণকে নিয়ে বহু লৌকিক উপকথা আছে। তাই মনে হয় খুব সম্ভব এঁর জন্মমূলে রয়েছে কোনও লৌকিক দেবতা। পরবর্তীকালে কৃষ্ণ, বিষ্ণু, নারায়ণ সবাই এক দেবতায় মিলে গেছেন। আরও পরে এক ভক্ত সম্প্রদায়ের কাছে বিষ্ণু ব্রহ্মর সামর্থক হয়ে দাঁড়িয়েছেন, শিব যেমন হয়েছেন শিবভক্তদের কাছে। বৈষ্ণব ধর্মেরই এক শাখা পঞ্চরাত্র-র ভক্তিরস-প্রধান তত্ত্বে বিষ্ণুর বহু অবতারে কথা স্বীকার করা হয়েছে। কৃষ্ণ অবশ্যই এই অবতারদের মধ্যে সবচেয়ে পরিচিত। কিন্তু রামায়ণের রামকেও একজন অবতার হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে। পুরাণে দশ জন অবতারের কথা আছে। বুদ্ধও এর অন্তর্ভুক্ত। গ্রহণের অযোগ্য এক অনার্য দেবতা থেকে পরম ব্রহ্মের আসনে রাম, কৃষ্ণ এমনকি বুদ্ধকেও নিজের অবতার বানিয়ে বিষ্ণুর এই উ্থান, পৌরাণিক বিবর্তনের এক চিত্তাকর্ষক কাহিনি।

দক্ষিণ ভারতে তামিলদের মধ্যে আলোয়ার সম্প্রদায়ের সন্তদের রচনায় এক দীর্ঘদিনের ভক্তিসাধনার প্রাচীন ঐতিহ্য আছে। এর মধ্যে প্রাচীনতম রচনাগুলো প্রাক্‌বৈদিক যুগের, এমন দাবিও করা হয়। এ সম্বন্ধে অবশ্য সন্দেহ আছে। যদিও ঐতিহ্যটি নিশ্চিতই বেশ প্রাচীন। শেষের দিকেরগুলো পাওয়া গেছে আনুমানিক অষ্টম বা নবম শতকে। এই আলোয়ার সন্তদের অধিকাংশই এসেছেন নিম্নবর্ণের থেকে। এই আন্দোলন কিছুকাল হয়তো সমাজের নিম্নস্তরেই সীমাবদ্ধ ছিল, গোঁড়া ব্রাহ্মণ্যধর্মের কাছে যাঁরা বিশেষ

কিছুই পাননি। পরবর্তীকালে এমনকি উচ্চবর্ণের বৈষ্ণবরাও এদের সাহিত্যকে গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছেন। যেমন তিরু বায়মোলি নামে গ্রন্থটি ধর্মগ্রন্থ হিসেবে বেশ তাৎপর্যপূর্ণ বলে স্বীকৃত। আর রামানুজ এঁদের কাজকে বৈষ্ণবদের বেদ বলে স্বীকৃতি দিয়েছেন। অন্ডাল নামে এক আলোয়ার ছিলেন নিম্নবর্গের মহিলা। পরবর্তীকালে তাঁকে ধর্মীয় নেতার স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে। এই জাতিভেদ-দীর্ণ, পুরুষশাসিত সমাজে এটা সম্ভব হয়েছে বস্তুত ভক্তি-আন্দোলনের ফলেই। আলোয়ারদের এই ঐতিহ্য থেকে, নাথমুনি, অলবন্দর-যমুনাচার্য এবং পিল্লে লোকাচার্য (অর্থপঞ্চক গ্রন্থের লেখক, ১২১৩) প্রভৃতি অনুগামীদের মধ্যে দিয়ে ভক্তি-আন্দোলন ক্রমশ বিকাশ লাভ করেছে। আর রামানুজের রচনার মধ্যেই তার উজ্জ্বল প্রকাশ।

আলোয়ার ভক্তিগীতিগুলো খুবই সরল আর আবেগময়, ভক্তি-ধর্মান্দোলনের ঐতিহ্যবাহী। একটু দৃষ্টান্ত উপস্থিত করা যাক—

'হে প্রভু, তোমাকে জানতে পারি, এমন শক্তি আমাদের নেই। আমাদের জীবন যেন কখনও তোমার থেকে বিচ্যুত না হয়।'

নাথমুনি, যমুনাচার্যের মতো উত্তরকালের ভক্তিধর্মের তাত্ত্বিকরা এই সারল্যকে যেন অনেকখানিই হারিয়ে ফেলেছিলেন। তাঁদের মধ্যে আলোয়ারদের এই অকৃত্রিমতাকে খুঁজে পাওয়া যায় না। রামানুজ অবশ্য খুব বড় পণ্ডিত। তিনি ভক্তি-আন্দোলনের একটা বৌদ্ধিক বা মননঋদ্ধ ভিত্তিভূমি তৈরি করে দিয়েছিলেন। রামানুজ জীবাত্মা আর পরমাত্মার মধ্যে ভেদকে স্বীকার করেন। এখানেই শঙ্করের বেদান্ত-মতের সঙ্গে তাঁর তফাত। আমরা আগেও বলেছি, তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি বিশুদ্ধ অদ্বৈতবাদী দৃষ্টিভঙ্গি থেকে আলাদা। আর জ্ঞান নিয়ে বিশেষ ভাবনাচিন্তা রামানুজের ছিল না, তাঁর কাছে ভক্তিই আসল। তাঁর মতে 'অজ্ঞান' নয়, 'অবিশ্বাস'ই প্রধান সমস্যা।

দক্ষিণ ভারত ছাড়া দেশের অন্যান্য অঞ্চলেও বৈষ্ণব ভক্তি-আন্দোলনের প্রসার ঘটেছিল। রাজপুত রমণী ভক্ত মীরাবাইরে (১৫০৪) ভজনতো সর্বজনপরিচিত। সাড়ে চারশো বছর পরেও তার জনপ্রিয়তা একটুও কমেনি। আজও প্রায়ই শোনা যায় সে গান। মহারাষ্ট্রে আমরা পেয়েছি নামদেব এবং তুকারামকে। এঁদের বলা হত বিথল, এঁরা বিষ্ণুর উপাসক। নামদেবের জন্ম সম্ভবত চতুর্দশ শতকে। ইনি ছিলেন দর্জি। এঁর গুরুর কথাও

শোনা যায়। তিনি নামদেবকে বলতেন, "পাথরের মূর্তি কথা বলে না, ঈশ্বরকে দেখো অন্তরে।" বলতেন, "তীর্থস্থান পাপস্খালন করতে পারে না, তুমি তোমার হৃদয়কে পরিচ্ছন্ন করো। উপবাস আর ধর্মীয় আচার সবই বৃথা যদি তুমি নিজেকে নির্মল না করতে পারো। যদি তোমার অন্তরে প্রেম না জাগে তবে অভিচারে কী ফল!" ঈশ্বরকে পাওয়ার জন্য ভক্তিবাদের সরল আর সহজ পথেই নামদেব বিশ্বাসী ছিলেন। তাঁর গানে বলেছেন, "সেই এক ও অদ্বিতীয় ঈশ্বর সমস্তকে ধারণ করে আছেন। হে প্রভু, তুমিতো সর্বত্রই আছ, তবে কেন বৃথা তোমাকে খুঁজে বেড়ানো!"

তুকারাম সম্ভবত সপ্তদশ শতকের ছিলেন। এক দরিদ্র চাষি পরিবারে তাঁর জন্ম। তিনি বলেছেন, "প্রভু, তুমি সব বর্ণনার অতীত। কিভাবে তোমার বন্দনা-গান করি? তোমার করুণা আমাদের রক্ষা করুক।" 'আমার শত্রুরা কেউ বাইরের জগতে নেই। আমারই ভিতরে যে বাসনা আছে সেগুলোই সংকট আর সমস্যা নিয়ে নিয়ে আসে। তুমি ছাড়া আর কে আমাদের রক্ষা করবে এদের আক্রমণ থেকে?'

মথুরা বৈষ্ণব ভক্তি-আন্দোলনের আর একটি কেন্দ্র। এখানেই বল্লভাচার্য প্রবর্তিত সম্প্রদায়ের বিকাশ। এখান থেকে এই ধর্মান্দোলন ছড়িয়ে পড়েছিল রাজপুতানা, পাঞ্জাব ইত্যাদি দেশের অন্য অঞ্চলে। বল্লভাচার্যের অনুসারীদের মধ্যে ছিলেন কর্ণাটকের বিল্বমঙ্গল। এঁর জন্ম সম্ভবত পঞ্চদশ শতকে। এঁর গ্রন্থ কৃষ্ণকথামৃত ভক্তিসাহিত্যের একটি শ্রেষ্ঠ রচনা।

বাংলায় ভক্তি-আন্দোলনের সর্বাধিক পরিচিত ব্যক্তি হলেন চৈতন্য (১৪৮৫-১৫৩৩)। তাঁর আগে বাংলার মানুষকে প্রভাবিত করেছিলেন বৈষ্ণব কবি জয়দেব, বিদ্যাপতি আর চণ্ডীদাস। কিন্তু চৈতন্যই ভক্তিধর্মকে এক শক্তিশালী ধর্মীয় আন্দোলনে পরিণত করেছিলেন। তার ফলে ভক্তিধর্মের ঐতিহ্যকে অনুসরণ করে এক সমৃদ্ধ ভক্তিকাব্যসংগীতের ধারা জন্ম নেয়। অসম প্রদেশে শঙ্করদেবের অধিনায়কত্বে ষোড়শ শতকে বৈষ্ণব ভক্তি-আন্দোলন গড়ে ওঠে। দেশের আরও নানান অঞ্চলে এই আন্দোলন হয়। সে সবের আলোচনা এখানে সম্ভব নয়। কিন্তু এতক্ষণে নিশ্চয় স্পষ্ট হয়েছে যে বৈষ্ণব ভক্তি-আন্দোলনের কতখানি ব্যাপ্তি ঘটেছিল আমাদের দেশে। এখানে অবশ্য উল্লেখ করতে হয়, এই আন্দোলনের উদার প্রকৃতি

সত্ত্বেও জাতিভেদের বেড়া ভেঙে দেয়া সব সময় সম্ভব হয়নি এর পক্ষে। এটা ঠিক যে এই ধর্মমতের অনেক নেতাই এসেছেন নিম্নবর্ণ থেকে, বিশেষ করে ভক্তি-আন্দোলনের আদিপর্বে এবং বৈষ্ণব ভক্তি-ধর্মাশ্রিত সাহিত্যের অধিকাংশের মধ্যেই মানব-সাম্যে বিশ্বাসের কথাই বলা হয়েছে, তবু এ সম্বন্ধে সন্দেহ নেই যে এই আন্দোলনের মধ্যেও বেশ কিছু পরিমাণে জাতিভেদের উপাদান থেকেই গেছে। রামানুজ খানিকটা সীমাবদ্ধ আকারে জাতিভেদ মেনে নিয়েছিলেন এবং চৈতন্যও সম্পূর্ণ নির্মূল করতে পারেননি। উদারতার দিকে প্রবণতা সত্ত্বেও এই আন্দোলন মানুষকে সমান মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করার ব্যাপারে যতখানি কৃতিত্ব দাবি করে, বাস্তবে ততখানি সাফল্য অর্জন করতে পারেনি। এটাও স্বীকার করতে হয় যে, এই আন্দোলনের কোনও কোনও শাখার ভক্তরা প্রেম আর ভক্তিকে একটু বেশি আক্ষরিক আর মানবিক অর্থেই গ্রহণ করেছেন। এ ক্ষেত্রে তাঁদের নৈতিক আচরণে ঊনতাও ঘটেছে।

বৈষ্ণব ধর্মের চেয়ে শৈবধর্মান্দোলনের ব্যাপ্তি কমই ছিল। এর অনুগামীর সংখ্যা অবশ্য উপেক্ষণীয় নয় কখনোই। আমরা আগেই বলেছি, শিব প্রথমে ছিলেন অনার্য দেবতা, ব্রাহ্মণরা ছিলেন শিবপূজার বিরোধী। যাই হোক, ক্রমশ শিব স্বীকৃতি লাভ করেন। ষষ্ঠ খ্রিস্টাব্দের শেষের দিকে দেখা যায়, বরাহমিহির এক নিষেধাজ্ঞা জারি করছেন এই মর্মে যে, শৈব মন্দিরে একমাত্র ব্রাহ্মণরাই পৌরোহিত্য করার অধিকারী, অন্যরা নয়। এটাই এই দেবতার স্বীকৃতির প্রমাণ। তবে শৈব মন্দিরের ব্রাহ্মণ পুরোহিতরা সামাজিক মর্যাদায় একটু খাটো ছিলেন। 'শিবজ্ঞান-বোধম্' গ্রন্থ (১২২৩) থেকে জানা যায় অধিকাংশ শৈব ভক্ত ছিলেন অব্রাহ্মণ। এরপর দীর্ঘ সারি দেখা যায় ভক্তের। সপ্তদশ শতকে দেখি শিববাক্য প্রশ্ন করছেন, 'এই বানানো দেবতাদের দিয়ে কী হবে? এঁদের সম্মান এমনকি অস্তিত্বওতো মানুষের নিয়ন্ত্রণে! এঁরা কী করে আমার মুক্তি ঘটাবেন? এক পাথরখণ্ডের কাছে ফুল সাজিয়ে কী হবে? কী লাভ এই বিগ্রহের কাছে ধূপ ধুনো পুড়িয়ে, ঘণ্টা বাজিয়ে? কী লাভ একে প্রদক্ষিণ করে কিংবা আরও নানান আচার পালন করে? এ রকমই বৃথা হবে যোগীদের ছিয়ানব্বই রকমের বিধি ইন্দ্রিয় নিগ্রহ, মন্ত্রোচ্চারণ, তীর্থভ্রমণ, গঙ্গাস্নান। অতএব আসক্তি ত্যাগ করো, মনকে শান্ত

করো, তখন তোমার অন্তরেই পবিত্র বারাণসী ধামের উদয় হবে। কৃত্রিম বিগ্রহ নয়, অন্তরের দেবত্বই তোমার আরাধ্য।" ভদির-গিরিয়র এই ভক্তিভাবনাকে সরল এক কবিতায় প্রকাশ করেছেন "হে প্রভু, কখন সংযত হবে আমার ইন্দ্রিয়গুলো, চূর্ণ হবে আমার অহংকার, আমার সব দ্বন্দ্বের অবসান ঘটবে পরম প্রশান্তিতে?" জালে বন্দি মাছের মতো এই আমার মুক্তি হবে কবে? কখন আমি ঈশ্বরের চরণে আশ্রয় পাব আর আমার সত্তাকে মিলিয়ে দিতে পারব তাঁর সঙ্গে?

কাশ্মীরেও শৈব ভক্তি-আন্দোলন প্রবল ছিল। শৈব-দর্শনের সবচেয়ে খ্যাতিমান কাশ্মীরি ব্যাখ্যাতা হলেন অভিনবগুপ্ত। ইনি একাদশ শতকের মানুষ। তাঁর পূর্বসূরিদের মধ্যে সিদ্ধ সোমানন্দ বহু পরিচিত। তাঁদের রচনাগুলো কখনও কখনও অতিমাত্রায় মননধর্মী আর সেই কারণেই সাধারণ ভক্তের কাছে দুরূহ। অনেক শৈবভক্তের সরল ভক্তিগীতি আছে, যা তাত্ত্বিক জটিলতা থেকে মুক্ত। শৈব সম্প্রদায়েরই আর এক চিত্তাকর্ষক শাখা হল বীরশৈব বা লিঙ্গায়ত। কর্ণাটকে দ্বাদশ শতকে এর উৎপত্তি। এরও দৃষ্টিভঙ্গি বেশ উদার যদিও গুরুরা ছিলেন ব্রাহ্মণ। ভক্তি আর বিশ্বাসের উপরই এঁরা জোর দেন, পুরোহিত-প্রধান আচার সর্বস্বতার এঁরা বিরোধী।

ভক্তি আন্দোলনের সব রূপবৈচিত্র্যকে আমরা এ আলোচনায় আনতে পারিনি। এই আন্দোলন এর স্বভাব বৈশিষ্ট্যেই নানান অঞ্চলে এবং নানা সময় ধর্মপ্রাণ মানুষের মনে গভীর আবেদনের সৃষ্টি করেছে। বিষ্ণু এবং শিবকে কেন্দ্র করে যে ভক্তি আন্দোলন গড়ে ওঠে তার বাইরেও অন্য দেবতাদের ভক্ত গোষ্ঠী আছেন। কোনও গোষ্ঠী পরম এককে দেবীরূপে আরাধনা করেছেন, যা প্রাগার্য যুগের মাতৃ-পূজারই বিবর্তন। দেবী, কালী বা দুর্গার অন্য নাম শক্তি। এই নামানুযায়ী উপাসকদের বলা হয় শাক্ত। ভক্তি আন্দোলনের এই শাখাটি আবার তন্ত্রের সঙ্গে যুক্ত। আমরা এ সম্বন্ধে ত্রয়োদশ অধ্যায়ে আলোচনা করেছি। যাই হোক এ সম্পর্কে সন্দেহ নেই যে বিভিন্ন ভক্তি আন্দোলনের মধ্যে বৈষ্ণব এবং শৈব ধর্মান্দোলনই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। হিন্দু ভক্তদের ভক্তির আবেগ প্রধানত প্রবাহিত হয়ে এসেছে এই দুটি ধারাকে অবলম্বন করেই।

১৮

উত্তর ভারতের মধ্যযুগীয় মরমিয়া সাধনা

ভারতীয় সংস্কৃতি বহু জাতি, বহু গোষ্ঠীর সম্মিলিত কৃতির মূর্ত প্রতীক। ভারতে ইসলামের আগমন তৈরি করেছিল চমকপ্রদ প্রতিক্রিয়ার ধারা। বর্তমান সম্পর্কে এদের আবেগতাড়িত আগ্রহ বহু ভারতীয়কেই এই প্রভাবকে অস্বীকার করতে হয়তো খানিকটা সাহায্য করেছে, কিন্তু হিন্দু ঐতিহ্যের বিবর্তনের বস্তুনিষ্ঠ অনুসন্ধান করতে গেলে এই মহান ধর্মের সৃষ্টিপ্রবণ প্রভাবের কথা ভাবতেই হয়।

পরস্পরকে প্রভাবিত না করে দুটি সংস্কৃতির পাশাপাশি অবস্থান বস্তুত অসম্ভব। এবং ভারতে হিন্দু মুসলিম সংস্কৃতির দুই ছাঁদ বা রূপের মধ্যে প্রভূত আদান প্রদান ঘটেছে। এর প্রমাণ মিলবে শুধুমাত্র চিত্রকলার নতুন ধারায় (মুঘল, রাজপুত, কাংড়া, গাড়োয়াল), ভাস্কর্য আর স্থাপত্যে (দৃষ্টান্ত তাজমহল) এবং সংগীতে (ভারতীয় মার্গ সংগীতের উপর প্রভাব) নয়, ধর্মান্দোলনের মধ্যেও দেখা যাবে এই প্রভাব। বস্তুত ভারতের ভক্তি আন্দোলন আর ইসলামের সূফি ধর্মের ধারার মধ্যে এতখানিই মিল আছে যে, এখানে আদান প্রদান হয়ে গেছে খুবই সহজ। এ দুই ধারার মিশ্রণ আর সমন্বয়ের বিচিত্র, আকর্ষণীয় মূর্তি আমরা দেখি উত্তর ভারতের মধ্যযুগীয় মরমিয়া সাধনার মধ্যে। 'মধ্যযুগীয়' এই শব্দটি হয়তো একটু ভুল সংকেত দিতে পারে। কেননা অনেকেরই মনে ইউরোপীয় মধ্যযুগের ভাবনা আর আচারের অনুষঙ্গ কাজ করবে। কিন্তু এখানে আমরা যে আন্দোলনের কথা বলছি তা প্রায় পুরোটাই এর বিপরীত। ভারতীয় মধ্যযুগের মরমিয়াবাদের এক অসামান্য প্রকৃতি হল এ উগ্র উপদলীয় সংস্কার এবং গোঁড়া শাস্ত্রীয় জগতের প্রভাব থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত।

ঐশ্লামিক প্রভাবের ইতিবৃত্ত শুরু হয়েছে বোধকরি মখ্‌দুম্‌ সৈয়দ আলি অল্‌ হুজইউরি থেকে, যাঁর মৃত্যু ১০৭২ খ্রিস্টাব্দে। কিন্তু যে সুফি গুরু প্রথম ভারতে আসেন তাঁর নাম খাজা মৈনুদ্দিন চিস্তি, যাঁর জন্ম ১১৪২ সালে সিস্তানে। ১১৯৩ সালে তিনি দিল্লি এসে পৌঁছন এবং আজমীরের হিন্দু-তীর্থ পুষ্করে বসবাস শুরু করেন। মুসলমান, হিন্দু দুই সম্প্রদায়েরই তাঁর বহু শিষ্য ছিলেন। বর্তমান লেখক পুষ্করে চিস্তির অনুগামী একদল লোকের সাক্ষাৎ পেয়ে কৌতুকবোধ করেছিলেন যাঁরা নিজেদের বলতেন 'হুসেনি ব্রাহ্মণ'। পরবর্তী শতকগুলোতে ভারতে বহুসংখ্যক সুফি গুরু ছিলেন। এখানে কিন্তু এই আন্দোলন সম্পর্কে আলোচনায় আসা সম্ভব হচ্ছে না। শুধু হিন্দু চিন্তাধারায়[১] এর প্রভাবের কথাই এখানে বলা হবে।

হিন্দুদের তরফে যে মানুষটি মধ্যযুগের মরমিয়াবাদকে প্রাণবেগে সঞ্জীবিত করেছিলেন তিনি হলেন রামানন্দ (১৩৭০-১৪৪০ খ্রি.)। রামানুজের শিষ্য হিসেবেই তাঁর যাত্রা শুরু, কিন্তু ঐ ধর্মান্দোলনের গোঁড়ামি থেকে পরে সরে গিয়েছিলেন। তিনি জাতিভেদের বিরোধী ছিলেন, চিরাচরিত ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান সম্পর্কে প্রশ্ন তুলেছিলেন। আর উচ্চকোটির মধ্যে প্রচলিত সংস্কৃতভাষার বদলে হিন্দিভাষায় প্রচারের কাজ করে লৌকিক সাহিত্যে প্রাণসঞ্চার করেছিলেন। হিন্দুধর্মে যা কিছু ভাল তা তিনি গ্রহণ করেছিলেন যেমন—জ্ঞানমার্গ, যোগ, ভক্তিমার্গের ঐতিহ্য। কিন্তু প্রাচীনপন্থী হিন্দুদের চিরাচরিত প্রথাকে মেনে নেননি। তাই তাঁর ধর্মান্দোলন অনেক বেশি জনগ্রাহ্য হয়েছিল। তাঁর ভাবনার চরিত্রটি প্রতিফলিত হয়েছে তাঁর একটি কবিতায়। কবিতাটি পাওয়া যাবে শিখ রচনাসংকলন 'গ্রন্থ সাহেব'-এর মধ্যে—

'যেখানেই যাই দেখি জল আর পাথর (পূজায় এগুলোই মাধ্যম); কিন্তু তুমিই তো এগুলোকে তোমার উপস্থিতি দিয়ে ভরিয়ে রেখেছ। বৃথাই লোকে তোমার সন্ধান করে বেদের মধ্যে। .... আমার প্রকৃত গুরুতো তুমিই, আমার সব ব্যর্থতার অবসান ঘটিয়েছ তুমি, সব মোহের বিনাশ। ধন্য তুমি। রামানন্দ মগ্ন হয়ে আছে তার প্রভুর মধ্যে, ব্রহ্মের মধ্যে। গুরুবাক্যেই ছিন্ন হয় সব বন্ধন।'

১. উৎসাহী পাঠক এ বিষয়ে কিছু তথ্য পাবেন আমার *Medieval Mysticism of India* (London, 1936, pp 14-41) গ্রন্থে। এই অধ্যায় এবং পূর্ববর্তী অধ্যায়ে উদ্ধৃত পদগুলোর অধিকাংশই ঐ গ্রন্থের অন্তর্গত।

রামানন্দর বারো জন প্রধান শিষ্য ছিলেন বলে অনুমান করা হয়। এঁদের অধিকাংশ এসেছিলেন নিম্নবর্গ থেকে। এঁদের একজন রবিদাস ছিলেন চর্মকার। তাঁর রচিত ত্রিশটির বেশি ভক্তিগীতি গ্রন্থসাহেবে স্থান পেয়েছে। তাঁর গানে আছে "লক্ষ লক্ষ বার বৈদিক মন্ত্র আবৃত্তি করেও আকুল আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি ঘটবে না। সর্বক্ষণ তুমি আছো, আছো প্রত্যেক বস্তুর অন্তরে। নিজের চোখে আমি তা দেখতে শিখলাম না, সে তো আমারই দোষ।"

রামানন্দের শিষ্যদের মধ্যে নিঃসন্দেহে সবচেয়ে খ্যাতিমান হলেন কবীর নামে এক মুসলমান তন্তুবায়। তাঁর জন্ম আর মৃত্যুর দিন নিশ্চিত জানা যায় না। এ সম্বন্ধে নানা মতান্তর আছে। সে যাই হোক, খুব সম্ভব তিনি পঞ্চদশ শতকে জীবিত ছিলেন, এমনকি তিনি রামানন্দের প্রত্যক্ষ শিষ্যও হতে পারেন। এক মুসলমান তন্তুবায়ের পুত্র,এই আন্দোলনে দীক্ষিত হয়ে ধর্মীয় আচারসর্বস্বতা আর গোঁড়ামির প্রায় প্রত্যেকটির মূলে আঘাত করেছিলেন। তিনি তাঁর মধ্যে সমন্বিত করেছিলেন ইসলাম ধর্মের সুফি আর হিন্দুধর্মের ভক্তিসাধনার ঐতিহ্যকে। কবীর তাঁর গানে বলেছেন, "আল্লাই বলি কিংবা রাম তোমার নাম নিয়েই আমি বেঁচে আছি। ধর্মবিশ্বাসের ক্ষেত্রে তফাতটা শুধু নামে। এক ঈশ্বরের জন্যই সকলের আর্তি।" কবীর গান রচনা করেছেন সাধারণ মানুষের জন্য। স্বভাবতই মাধ্যম হিসেবে তাঁর নির্বাচন সংস্কৃতর পরিবর্তে হিন্দি। 'সংস্কৃত হল কুপজল', কবীর বলেছেন, "আর জনসাধারণের ভাষা হল বহতা নদী"। কঠিন কৃচ্ছ্রসাধন বা ব্রহ্মচর্য ব্রতে তিনি বিশ্বাসী ছিলেন না। তিনি বিবাহ করেছিলেন, তাঁর একটি পুত্র ও একটি কন্যা ছিল। কবীর কারুশিল্পীর জীবনযাপন করেছিলেন। এই নিরক্ষর তন্তুবায়ের জীবনে যথার্থই এক বিরল ভারসাম্য ঘটেছিল আধিভৌতিক আর আধ্যাত্মিক মূল্যবোধের। তিনি বলেছেন, "পরম সত্যের অধিষ্ঠান শুধু অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে, এ কথা বললে বাইরের বস্তুজগৎকে লজ্জা দেয়া হয়, আবার তিনি বহির্জগতেই রয়েছেন, এমন কথা যদি বলি তবে সেটা সত্যভাষণ হয় না।"

হিন্দু মুসলমান উভয় সমাজেই কবীরের বহু অনুগামী ছিলেন। একটি মনোহর কাহিনি আছে তাঁর মৃত্যুর পর হিন্দু আর মুসলমানের বিবাদ নিয়ে। দুই সম্প্রদায়ের লোকই নিজেদের মতো করে দেহসৎকারে উৎসুক। কাহিনিটি এই রকম—যখন শবদেহের আচ্ছাদন সরিয়ে নেয়া হল, দেখা গেল কবীরের

দেহ নেই, তার জায়গায় রয়েছে গুচ্ছ গুচ্ছ ফুল। তখন সেই ফুল সমানভাবে ভাগ করে দেয়া হল প্রতিযোগী দুই দলের মধ্যে। কবীরের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র কমালকে কেউ কেউ অনুরোধ করেছিল পিতার অনুগামীদের নিয়ে একটি সম্প্রদায় গড়ে তুলতে। কমাল এই ভাবনাকে একেবারেই বাতিল করে দেন এই কথা বলে যে, তাঁর পিতা সারাজীবন সব রকমের সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধেই লড়াই করেছেন। আর এই রকম সম্প্রদায় সৃষ্টি হবে কবীরের ধর্মীয় বিশ্বাসের বিরোধিতা করা। অবশ্য কবীরের কিছু সংখ্যক শিষ্য—প্রধানত মুসলমান—মগহরে কবীরের সমাধির উপর গড়ে তুলেছিলেন এক মঠ। ওদিকে হিন্দু শিষ্যরা বারাণসী আর ছত্তিশগড়ে একটি করে কেন্দ্র গড়েছিলেন। এর মধ্যে দ্বিতীয় গোষ্ঠীটি বেশ বড় এবং বলা হয় এদের সদস্যসংখ্যা প্রায় চল্লিশ লক্ষ। মহান শিখধর্মের প্রবক্তা নানক (১৪৬৯—১৫৩৮) কবীরের শিক্ষার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। এর নাম হয়েছিল 'কবীরপন্থ'। শিখধর্মের কিছু আকর্ষণীয় সারল্য এসেছে কবীর থেকেই। আর শিখ ধর্মগ্রন্থ 'গ্রন্থসাহেব' মধ্যযুগীয় মরমিয়া কবিতার গুরুত্বপূর্ণ আকরগ্রন্থ।

কবীরের অনুগামীদের মধ্যে বিশিষ্ট একজন হরেন দাদূ (১৫৪৪–১৬০৩), একজন ধুনুরি, মুসলমান পরিবারে জন্ম। তাঁর পরবর্তী অনুগামীদের কেউ কেউ দেখাতে চেষ্টা করেছেন যে, তিনি ব্রাহ্মণ পরিবার থেকে এসেছেন, যেমন 'ভক্তমাল' নামে ষোড়শ শতকের ভক্তি-আন্দোলন বিষয়ক হিন্দুগ্রন্থে কবীরের মুসলমান পারিবারিক পরিচয় গোপন করা হয়েছে। কবীর আর দাদূর গোঁড়া ভক্তদের এই ঘোষণা যে শুধু ভুল তাই নয়, এর মধ্যে দিয়ে প্রতিফলিত হয় গুরুদের শিক্ষা সম্বন্ধে বিচিত্র মনোভঙ্গি। দাদূর একটি স্বপ্ন ছিল বিশ্বাসের একীকরণ। আর এই উদ্দেশ্য নিয়েই তিনি 'ব্রহ্ম-সম্প্রদায়' প্রতিষ্ঠা করেন ঈশ্বর আরাধনার জন্য যেখানে কোনও ধর্মীয় আচার বা গোঁড়ামি থাকবে না। ব্রহ্ম সমাজের সার বর্ণনায় দাদূ বলেছেন, আত্মাভিমান ত্যাগ, ঈশ্বরের উপাসনা, দেহমনের অবক্ষয় প্রতিরোধ, সর্বজীবে মৈত্রীর সাধনা। ভগবদ্গীতার উপদেশ থেকে এ যে খুব ভিন্ন, এমন নয়। কিন্তু এখানে দৃষ্টিভঙ্গি আর কর্মপ্রণালী হয়তো অনেকটাই সহজ, প্রত্যক্ষ। সেই সঙ্গে গীতার অধিবিদ্যামূলক তত্ত্বকথা থেকে মুক্ত। দাদূ একবার তাঁর বংশপরিচয় দিতে গিয়ে বলেছিলেন "ঈশ্বর আমার পূর্বপুরুষ, সৃষ্টিকর্তা

আমার আত্মীয়, বিশ্ব-গুরু আমারই জাতের লোক, সর্বশক্তিমানের সন্তানদের মধ্যে আমি একজন।" বিশ্বাসের এই সারল্য, ঈশ্বরকে জানার ব্যাপারে এই প্রত্যয়, এরই সঙ্গে তাঁর উদার দৃষ্টিভঙ্গি আকৃষ্ট করেছিল মহান মুঘলসম্রাট আকবরকে। ধর্মীয় প্রসঙ্গে দাদূর সঙ্গে তাঁর দীর্ঘ আলোচনা হয়েছিল। প্রায় চল্লিশ দিনের বেশি চলেছিল এই আলাপ। দাদূর এই শিক্ষা আকবরকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল, এমনই অনুমান করা হয়। পরবর্তীকালে আকবর নিজে চেষ্টা করেছিলেন সমস্ত ধর্মবিশ্বাসকে একত্র করতে তাঁর 'দিন-ই-ইলাহি' গ্রন্থে। খুব সম্ভব দাদূর 'ব্রহ্ম সম্প্রদায়' তাঁর এই উদার দৃষ্টিভঙ্গি গঠনে সহায়ক হয়েছিল। দাদূর অনেক কবিতার বিষয়বস্তু হল জগতের সৌন্দর্য। তিনি কৃচ্ছ্রসাধনে বিশ্বাসী ছিলেন না। তিনি বলেছেন, ঈশ্বর এই যে ইন্দ্রিয়গুলো সৃষ্টি করেছেন, এগুলো উপবাসে ক্লিষ্ট হোক, নিশ্চয় তিনি তা চান না। তাঁর উক্তি—"বর্ণ আমাদের দৃষ্টিকে তৃপ্ত করে, সংগীত শ্রবণেন্দ্রিয়কে, অপূর্বভাবে জোগান-দেয়া আহার্যের স্বাদ আমরা গ্রহণ করি রসনায়।"

গানে তিনি বলেছেন, "এই বিশ্বের সৌন্দর্যকে যখন দেখি, আমার প্রশ্ন করতে ইচ্ছা হয়, হে ঈশ্বর কিভাবে তুমি সৃষ্টি করেছ একে? আকস্মিক কোন আনন্দের আবেগ তোমার সত্তার মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হয়ে নিজেকে প্রকাশ করতে বাধ্য হল? এ কি শুধু নিজেকে প্রকাশের আকাঙ্ক্ষা? অথবা শুধু আবেগের তাড়না? না কি রূপের খেলায় মেতে ওঠার খেয়াল? এ খেলা তোমার কাছে কি এতই আনন্দের? নাকি তুমি দেখতে চাও তোমার আন্তর আনন্দ কিভাবে রূপ পায়? হায়! কথায় এ প্রশ্নের উত্তর কে দেবে? শুধু যারা জানে তারা উপলব্ধি করবে।"

'সেইজন্যইতো তোমার বিশ্ব, তোমার সৃষ্টি এত মুগ্ধ করেছে আমাকে—তোমার জল, তোমার বাতাস, আর এই পৃথিবী যা ধারণ করে আছে এগুলোকে, এর পর্বতমালা, মহাসমুদ্র, তুষারাবৃত মেরুদেশ, এর জ্বলন্ত সূর্য, পৃথিবী, আকাশ আর স্বর্গলোক—এ ত্রিদেশের মধ্যে দিয়ে, এদের জীবন-বিচিত্রার মধ্যে তোমার সম্পাদনায় আমি বিমোহিত। হে অদৃশ্য, অগম্য, অতলস্পর্শ কে তোমাকে জানতে পারে? জানার কোনও আকাঙ্ক্ষাও নেই দাদূর। তোমার এই সৌন্দর্যে আনন্দবিহ্বল থাকাতেই তার সন্তোষ, তোমার সঙ্গে আনন্দোৎসব করাতেই তার তৃপ্তি।'

এ হল ভক্তির শুদ্ধতম রূপ। মনন-নির্ভর জ্ঞানমার্গ থেকে একেবারেই

আলাদা। জটিল কর্মসাধনার থেকেও। দাদূর মৃত্যুর পর তাঁর অনুগামীরা এই ঐতিহ্যকে ধরে রেখেছিলেন। রজ্জব এঁদের মধ্যে সবচেয়ে প্রখ্যাত। তিনি বলেছেন, "এই বিশ্বই হল বেদ, সমস্ত সৃষ্টিই হল কোরাণ। পণ্ডিত আর কাজি যারা শুকনো কাগজের স্তুপকে তাদের সম্পূর্ণ জগৎ বলে মনে করে তাদের সব চেষ্টাই পণ্ডশ্রম।" 'জগতে যত লোক আছে, ততগুলোই গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়। বৈচিত্র্যসৃষ্টির ব্যবস্থায় এমনই বিধান। নানান গোষ্ঠীর এই পূজা অনেকগুলো জলের ধারার মতো—এক সঙ্গে বয়ে চলেছে হরির দিকে, তিনি যেন এক মহাসমুদ্র।'

মধ্যযুগে বহু মরমিয়া সাধক ছিলেন, যাঁদের ভক্তিগীতির জগতে দান আছে। এই ক্ষুদ্রাকার গ্রন্থে সকলের আলোচনা সম্ভব নয়। ষোড়শ শতকের হিন্দি কবি তুলসীদাস সংস্কৃত রামায়ণ অনুবাদ করেছিলেন হিন্দি ভাষায়। এঁদের মতো কয়েকজন বহুজনপরিচিত। অন্যরা, যেমন ধরণীদাস কিছু কিছু অঞ্চল ছাড়া তেমন পরিচিত নন। এঁদের সকলের সাধারাণ বৈশিষ্ট্য এই যে, এরা সকলেই ঈশ্বরকে প্রেমিক এবং প্রেমের পাত্র হিসেবেই পূজা করেছেন।

ভারতের একটি অঞ্চলের—সিন্ধু প্রদেশের—মধ্যযুগীয় মরমিয়া সাধনা অবশ্য বিশেষ চর্চার দাবি রাখে। কেননা সেখানে মুসলমান সুফি সাধনার ঐতিহ্যের প্রভাব অনেক প্রবল, ভক্তি-সাধনার এতিহ্যের চেয়ে। পার্থক্যটা যে খুব বেশি এমন নয়, কেননা এই দুটি ঐতিহ্যে মিল আছে অনেকখানি। শুধু কোনও শব্দ, কোনও প্রতীকের ব্যবহার হয়তো আলাদা। ভারতের অন্যত্র যেমন ভক্তি সাধনার ঐতিহ্য সুফি ভাবনার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে, তেমনি এখানে সুফি ঐতিহ্য ভক্তি-সাধনার প্রভাব থেকে মুক্ত থাকতে পারেনি। সপ্তদশ শতকে শা করিম ও শা ইনায়েৎ এই আন্দোলনের সৃষ্টি করেন। শা লতিফ-এর জন্ম হয় ১৬৮৯ খ্রিস্টাব্দে এবং এই ধারা আজও অব্যাহত।

দিল্লির নব্যসুফি এ ধারার সঙ্গে নিবিড়ভাবেই যুক্ত। সপ্তদশ শতকে দিল্লিতে বাউরি সাহেব নামে একজন সুফি ছিলেন। তাঁর শিষ্য বিরু সাহেব ছিলেন হিন্দু। এঁর শিষ্য ছিলেন যারি শা, তিনি মুসলমান। যারি শা'র লেখায় পরমপুরুষকে কখনও বলা হয়েছে আল্লাহ্, আবার কখনও রাম কিংবা হরি। এই সমস্তই হয়তো বুঝিয়ে দেয় হিন্দু আর মুসলমান মরমিয়া সাধনা পরস্পরকে কতখানি প্রভাবিত করেছিল।

বাউল

ভারতের ধর্মজীবনে বাংলার বাউলের মতো চমকপ্রদ অভাবনীয় ব্যাপার বোধহয় আর নেই। এই প্রদেশের বাইরে এঁরা প্রায় অপরিচিত। প্রদেশের মধ্যেও যেন অনেকটাই উপেক্ষিত। কিন্তু এঁদের 'সহজ' সাধনা আর 'মনের মানুষ'-এর সন্ধান (পরম এককে এঁরা এই নামেই ডাকেন) যেন মন কেড়ে নেয়। বাউল শব্দটির অর্থ হল পাগল। সম্ভবত সংস্কৃত 'বায়ু' শব্দ থেকে এর উৎপত্তি। বায়ু অর্থে স্নায়ু-প্রবাহ। অন্য আর একটি ব্যুৎপত্তি একে শ্বাস-নিয়ন্ত্রণ-ক্রিয়া বা প্রাণায়ামের সঙ্গে যুক্ত করে, সম্প্রদায়বিশেষে এর অভ্যাস আছে। এই ধর্মীয় ঐতিহ্য গড়ে উঠেছে বৌদ্ধধর্ম, তন্ত্র আর বৈষ্ণব ধর্মের অপভ্রংশ থেকে। নামের উৎপত্তি যেখান থেকেই হোক, বাউল তার নামের সঙ্গে সংগতি রেখেই চলেছে। সতত ভ্রাম্যমাণ, সমস্ত পরম্পরার বন্ধন থেকে মুক্ত বাউলরা বায়ুর মতোই মুক্ত।

নরহরি বাউলের একটি গানে বাউল ধর্মান্দোলনের মূল বৈশিষ্ট্যগুলোর চমৎকার প্রকাশ ঘটেছে। তার বক্তব্য হল—

'তাই বাউল হলাম ভাই। কোনও প্রভুর হুকুমে চলি না আমি, মানি না কোনও ধর্মীয় নির্দেশ, কোনও আচার, কোনও প্রথা। মানুষের তৈরি ভেদাভেদ এখন আর গ্রাহ্যই করি না। আমার ভেতরে উথলে-ওঠা প্রেমানন্দে মাতোয়ারা হয়ে উঠি। প্রেমের মধ্যেতো বিচ্ছেদ নেই কোনও, সে অন্তরে অন্তর মেলায় চিরদিন। তাই সকলের সঙ্গে মেতে উঠি গানে আর নাচে। তাই বাউল হলাম ভাই।'

এই পঙ্‌ক্তিগুলো বাউলধর্মের প্রধান কয়েকটি তত্ত্বেরও পরিচয় দিয়েছে। বাউল যে মুক্তির সন্ধান করে তাহল সবরকমের বাইরের বাধ্যবাধকতা

থেকে মুক্তি। মুক্তি পেতে গেলে মানুষকে মরতে হবে বেঁচে থেকেও। একে বলা হয় 'ফনা'। এ শব্দটি প্রায়ই উচ্চারণ করেন সুফি মরমিয়া সাধকরা। এই ধর্মান্দোলনের সদস্যরা কেউ সংসারী গৃহী, কেউবা ভ্রাম্যমাণ যাযাবর। বাউলরা সামাজিক কোনও বিভেদ, যেমন জাতি বা শ্রেণিগত ভেদাভেদ মানেন না। তাঁদের কোনও বিশেষ দেবতা নেই, মন্দির মসজিদও নেই। তাঁরা কখনও কখনও ধর্মীয় উৎসবের সময়, বিশেষ করে বৈষ্ণব ধর্মের উৎসবে একসঙ্গে মিলিত হন। কিন্তু তাঁরা পূজাদিতে যোগ দেন না। তাঁদের আদর্শ হল 'সহজ' হওয়া। পূজা ইত্যাদি ধর্মের বাহ্য আচার বাউলরা এড়িয়ে চলেন, এর সমালোচনাও করেন। সাধারণত বাউলভক্তরা হিন্দু ও মুসলমান সমাজের নিম্নবর্গ থেকেই আসেন। আর উভয় সম্প্রদায়ের গোঁড়া মানুষগুলোর এঁদের প্রতি অবজ্ঞার এটাও একটা কারণ। মন্দির, মসজিদ আর অন্যান্য ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের প্রতি বাউলদের এই দৃষ্টিভঙ্গিরও কারণ হয়তো এইসব প্রতিষ্ঠানে নিম্নবর্গের মানুষের প্রতি নানা বিধিনিষেধ। বাউলের প্রশ্ন—"দেহের মতো মন্দির থাকতে অন্য মন্দিরের কী প্রয়োজন?" 'ভক্তর নিজেরই মধ্যে সেই পত্র আছে যাতে জীবনের লিপি দিয়ে শাস্ত্র লেখা হয়। কিন্তু হায় ক'জন তা পড়ে? হৃদয়ের বাণী ক'জনই বা শোনে!' ভারতীয় সাধু-সন্ন্যাসীদের গেরুয়া বসনও বাউলরা পরেন না। এই বাহ্য আচার সম্বন্ধে তাঁদের মত হল—

'অন্তরে যদি রং না লাগে তবে রং কি প্রকাশ পায় বাইরে? ফলের গায়ে রং লাগালে কি তাতে পাক ধরে, মাধুর্য আসে?'

বাউল সম্প্রদায়ের উৎপত্তির উৎস সন্ধান একটু কঠিন, কেননা এখানে কোনও লিখিত তথ্য প্রমাণ নেই। না থাকার একটা বড় কারণ বাউলরা এসেছেন সমাজের নিম্নতম স্তর থেকে, যাঁরা বেশিরভাগই নিরক্ষর। আর একটি কারণ অবশ্য ইতিহাস রক্ষায় তাঁদের মজ্জাগত অনীহা বা অনাগ্রহ। মনে আছে, পূর্ব বাংলার একটি গ্রামে নদীর তীরে বসে-থাকা এক বাউলের সঙ্গে কথা হচ্ছিল। তাঁকে শুধিয়েছিলাম, 'পরের প্রজন্মের জন্য আপনার নিজের জীবনের কথা কিছু লিখে রেখে যান না কেন?' তিনি উত্তর দিয়েছিলেন, "আমরা সহজপন্থী, তাই পিছনে কোনও চিহ্ন রেখে যেতে চাই না।" নদীর স্রোতে তখন ভাটা পড়েছে, জল ছিল সামান্যই। শুধু

কয়জন মাল্লাকে দেখা যাচ্ছিল, তারা কাদার উপর তাদের নৌকোগুলো ঠেলা দিয়ে এগিয়ে নিয়ে চলছিল লম্বা আঁচড়ের দাগ কেটে কেটে। বাউল বলল, "ভরা নদীতে যে নৌকো চলে সে কি কোনও দাগ রেখে যায়? যারা শুধু ক্ষুদে প্রয়োজনে কাদার উপর নৌকো নিয়ে টানাটানি করে তারাই লম্বা আঁচড় রেখে যায় পিছনে। এটা 'সহজ' পথ নয়। ভক্তদের জীবনের মধ্যে দিয়ে যে ভক্তিরসের স্রোত বয়ে চলেছে তাতে নিজের ভক্তিরসের ধারাকে মিশিয়ে দিয়ে ভেসে চলাই আসল কাজ। বাউলদের মধ্যে অনেক শ্রেণির লোক আছে। কিন্তু তারা সবাই শুধুই বাউল। তাদের আর কোনও কৃতি নেই বা ইতিহাস নেই। যে সব ধারা গঙ্গায় এসে পড়ে তারা গঙ্গাই হয়ে যায়।" আমি যখন শুধোলাম ওরা শাস্ত্র মানে না কেন। অন্য এক বাউল এ প্রশ্নে খানিকটা যেন বিরক্ত হয়েই বললেন, "আমরা কি কুকুর যে অন্যের এঁটো চেটে খাব? যারা সাহসী তারা নিজেদের সৃষ্টি নিয়ে আনন্দ করে। শুধু কাপুরুষই পূর্বপুরুষের কৃতির মহিমা কীর্তন করে বেড়ায়, কেননা তারা জানে না নিজের মধ্যে সৃষ্টি করা যায় কেমনভাবে।" বাউলরা তাদের ধর্মের ইতিহাস নিয়ে কখনও মাথা ঘামায়নি। অতীতে কে কী ভেবেছে, করেছে তা নিয়েও ভাবনা নেই তাদের। তাদের ভাবনা শুধুই আজকের ভক্তির আবেগ নিয়ে। তীর্থ নিয়ে তাদের যে বিরূপতা তারও মূলে এই দৃষ্টিভঙ্গি। তাদের গানে আছে—

"ও মন, আমি মক্কাও যাব না মদিনাও নয়। কেননা আমিতো বন্ধুর কাছেই আছি চিরদিন। তাকে না জেনে দূরে থাকলেইতো উন্মাদ হতাম আমি। মসজিদে, মন্দিরে কিংবা পুণ্যদিনে আমার পূজা নয়। আমার মক্কা কাশী প্রতিপদে, পবিত্র আমার প্রত্যেকটি মুহূর্ত।"

বাউল পদাবলীর সঙ্গে অনেক মিল পাওয়া যাবে উত্তর ভারতের মরমিয়া সাধকদের পদাবলীর। আগের অধ্যায়ে এদের প্রসঙ্গে আলোচনা করেছি। অবশ্য বাউলরা তেমন সংগঠিত নয়। এদের ভাবনাগুলোও সুস্পষ্ট বিধির চেহারা নিয়ে দানা বাঁধেনি। সম্ভবত এরা উত্তর ভারতের মধ্যযুগের সাধকদের দ্বারা প্রভাবিত। তবে সরল ভক্তির ঐতিহ্য এ দেশের মাটিতে এমনভাবে প্রোথিত আছে যার উৎসার প্রত্যেক যুগে দেশের নানান অঞ্চলে যে, এই আন্দোলনের উৎস-সন্ধান সত্যিই কঠিন কাজ। বাউলের বিশ্বাস

আর অথর্ব বেদে উল্লিখিত কিছু কিছু ধর্মবিশ্বাসের মধ্যে কিছু মিল দেখতে পাওয়া যায়। তাতে মনে হয় এই ধরনের আন্দোলন ভারতের ইতিহাস জুড়েই হয়ে এসেছে।

বাউলের রীতিনীতি শিক্ষা সবই গুরুর কাছে। বস্তুত এইভাবেই তাদের ঐতিহ্যর সংরক্ষণ ঘটে। এই গুরুই অতীতের শিক্ষার ধারা ভাবীকালের বাউলের কাছে পৌঁছে দেন। বাউল কাব্যে কখনও কখনও মানব-গুরুর অস্তিত্ব অস্বীকার করা হয়। গুরু কথাটির ব্যবহার হয় রূপক অর্থে— বাউলের ভাবনা বা উপলব্ধিতে যিনি ঈশ্বর তাঁরই রূপকে।

গুরু ব'লে কারে প্রণাম করবি মন?
তোর অধিক গুরু, পথিক গুরু, গুরু অগণন।
গুরু যে তোর বরণডালা, গুরু যে তোর মরণ জ্বালা,
গুরু যে তোর হৃদয়-ব্যথা, (যে) ঝরায় দু'নয়ন।
কারে প্রণাম করবি মন?

কখনও কখনও বাউল গুরুকে 'শূন্য' বলেও সম্বোধন করে। শূন্য অর্থে গুরুর অনস্তিত্ব নয়। (কেননা পরম এককেও শূন্য বলে অভিহিত করা হয়েছে।) বরং তাঁকে বলা হয় নিয়ত বর্তমান। অবশ্য আচরণে অন্যান্য ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মতো বাউলও গুরুর প্রতি গভীর শ্রদ্ধা পোষণ করে।

প্রচলিত অর্থে বাউল ত্যাগী তপস্বী নয়। তারা কৌমার্যব্রতেও বিশ্বাসী নয়। বস্তুত তারা জোর দিয়েই বলে যে, জাগতিক প্রেম অধ্যাত্ম প্রেম উপলব্ধির সহায়ক। এই বিশ্বাসকে তন্ত্রের তত্ত্ব আর আচারের মতো নানাভাবে ব্যাখ্যা করা যায়। কখনও কখনও বাউলের যৌনাচার নিয়ে সাধারণ মানুষের কৌতূহল, বাউল-আন্দোলনের অন্তর্নিহিত প্রেমের তত্ত্ব থেকে মনোযোগ সরিয়ে নিয়ে গেছে।

বাউলের আর এক তত্ত্ব হল ত্রিকালযোগ— অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যতের সংগতি সাধন। এই তত্ত্ব বলে, কালের প্রত্যেকটি মাত্রাকে যথাযোগ্য গুরুত্ব দিতে ব্যর্থ হলে আমাদের জীবনের ধারাবাহিকতা বিধ্বংস হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা। 'তোমার জীবন এক মহার্ঘ মর্মর সেতু, কিন্তু হায়,

নদীর দুই তীরে সংযোগ-সাধনে এ ব্যর্থ।” আধিভৌতিক আর আধ্যাত্মিক চাহিদার মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানের প্রয়োজনের উপরেই বিশেষ জোর দেয় বাউল।

কিন্তু এ সব তত্ত্বের জন্য তত নয়, বাউলের পরিচিতি তার সরল মর্মস্পর্শী গানের জন্য। বস্তুত এদের আন্দোলনের সারকথা হল শাস্ত্রটাস্ত্র এড়িয়ে ঈশ্বরের সঙ্গে সরাসরি সম্বন্ধ স্থাপন। একবার এক বৈষ্ণব এক বাউলের কাছে তার শাস্ত্রগ্রন্থ থেকে দীর্ঘ অংশ পড়ে শুনিয়েছিল এই কথা বোঝানোর জন্য যে, ধর্মীয় আচার-আচরণ এই সব উপদেশ নির্দেশ অনুযায়ী নিয়ন্ত্রিত হওয়া উচিত। বাউলের স্বভাবসিদ্ধ উত্তর ছিল তাৎক্ষণিক রচিত গানে :

ওরে ফুলের বনে কে ঢুকেছে সোনার জহুরি
নিকষে ঘষয়ে কমল আ মরি মরি।

ধর্মীয় বিশ্বাস যার যাই হোক, বাউল গানের আবেদনকে অস্বীকার করা কঠিন। এ গান সরল, সংবেদনাময় আর প্রত্যক্ষ। সেই কারণেই অবাক হই না যখন দেখি রবীন্দ্রনাথের মতো বিদগ্ধ পরিশীলিত রুচির কবিরা ভারতীয় সমাজের নিম্নতম বর্গের এই কবিদের রচনায় গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন।

আমি কোথায় পাব তারে
আমার মনের মানুষ যে রে
হারায়ে সেই মানুষে তার উদ্দেশে
দেশ বিদেশে বেড়াই ঘুরে![১]

১. এই অধ্যায়টি আমার *Visvabharati Quarterly*-তে প্রকাশিত এবং রবীন্দ্রনাথের *The Religion of Man* (London 1931) গ্রন্থের পরিশিষ্টে পুনর্মুদ্রিত বাউল সম্বন্ধীয় প্রবন্ধের সঙ্গে অনেকটাই এক।

২০

আধুনিক ধারা

গত দুইশো বছরে হিন্দুধর্ম প্রতীচ্যের অভিঘাতে প্রভাবিত হয়েছে অনেকখানি। তার ফলে যে নতুন কোনও মতবাদের জন্ম হয়েছে এমন নয়। কিন্তু পুরনো চিন্তাগুলো নতুন আলোকে উপস্থাপিত হয়েছে। এই অভিনব ক্রমবিকাশ আংশিকভাবে খ্রিস্টধর্মের প্রভাবের ফল, কিন্তু পুরোপুরি নয়। আধুনিক যুগের আবির্ভাবের ফলে ভারতীয় সমাজে বিস্তর পরিবর্তন ঘটে গেছে। স্বভাবতই সেজন্য চিন্তাজগতেও এসে গেছে নানান পরিবর্তন। নতুন মধ্যবিত্ত শ্রেণির উদ্ভব ও উত্থানও এই বিবর্তনের মূলে।

পাশ্চাত্য প্রভাবের প্রথম পর্ব অর্থাৎ অষ্টাদশ-উনবিংশ শতকের প্রথম ভাগের একটা বিশেষত্ব হল হিন্দু থেকে খ্রিস্টান হয়ে যাওয়ার ঝোঁক—রীতিমতো যথেষ্ট সংখ্যক ধর্মান্তর। হিন্দু ধর্মীয় নেতারা এই সমস্যায় একেবারে কিংকর্তব্যবিমূঢ়। এই ধর্মান্তর রোধ করার উদ্যোগ ছিল সামান্যই। তবে এই পর্বটা দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। আর ভারতে পশ্চিমি অভিঘাতের প্রবলতার তুলনায় ধর্মান্তরের সংখ্যাটা শেষ পর্যন্ত বস্তুত সামান্যই ছিল। অবশ্য এর অর্থ এই নয় যে, খ্রিস্টান ধর্মের কোনও প্রভাবই পড়েনি। খ্রিস্টান হয়ে যাওয়ার হাত থেকে হিন্দুদের রক্ষা করার জন্য হিন্দু ধমীয় নেতারা ধর্মীয় আচারকে বেশ খানিকটা সংস্কার করে নিতে বাধ্য হয়েছিলেন। সেই সঙ্গেই বাধ্য হয়েছিলেন প্রাচীন হিন্দু চিন্তার কতকগুলো দিককে ফিরিয়ে নিয়ে আসতে। অধঃপতিত হিন্দুধর্মের অধিকাংশ শাখাই এগুলো ভুলেই গিয়েছিল।

এর পর দ্বিতীয় পর্ব। এ পর্বকে হিন্দুধর্মের সংস্কারের যুগ বা নবজাগরণের যুগ বলা হয়ে থাকে। বস্তুত কিছু পরিমাণে দুই-ই সত্য। এই

আন্দোলনের অগ্রণী পুরুষ হলেন রাজা রামমোহন রায় (১৭৭৪-১৮৩৩)—সর্বতোভাবেই এক অসাধারণ ব্যক্তিত্ব। তিনি সংস্কৃত ও মাতৃভাষা বাংলা ছাড়া আরবি, ফারসি, হিব্রু, গ্রিক, ল্যাটিন জানতেন। এই বিদগ্ধ পণ্ডিত বিশ্বের অধিকাংশ ধর্মের মূল শাস্ত্রগ্রন্থ পাঠ করেছেন এটি প্রত্যক্ষ করার জন্যে যে, এদের মধ্যে খুব বেশি কিছু তফাত নেই। ১৮২৮ সালে তিনি ব্রাহ্ম সমাজের প্রতিষ্ঠা করেন। এর ভিত্তি হল উপনিষদের একেশ্বরবাদী তত্ত্ব। এ কাজে তাঁকে গোঁড়া হিন্দু সমাজের বিরুদ্ধতার সামনে দাঁড়াতে হয়েছিল। এই সমাজেরই কিছু মানুষ, যাঁরা বিদ্যাবুদ্ধি বা রুচিতে একটু খাটো, এমন কথাও বলেছিলেন যে নিজের অবস্থানকে জোরালো করার জন্য ঐ উপনিষদগুলো লিখেছিলেন রামমোহন নিজেই। ধর্মের ব্যাপারে রামমোহন খ্রিস্টপূর্ব অষ্টম শতকের উপনিষদের দিকে ফিরে তাকালেও সামাজিক ব্যাপারে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি ছিল প্রগতিবাদী। ভারতীয়দের পশ্চিমি বিজ্ঞান শিক্ষার ব্যাপারে তাঁর আগ্রহ ছিল প্রবল। গণিত, প্রকৃতিবিজ্ঞান, রসায়ন, শারীরসংস্থান এবং অন্যান্য হিতকর বিজ্ঞান শিক্ষার প্রয়োজনীয়তার উপর বিশেষ জোর দিয়ে ভারতের বড়লাটকে চিঠিও দিয়েছিলেন তিনি। সতীদাহ প্রথা[১] উচ্ছেদের জন্য তাঁর আন্দোলনের ফলেই ব্রিটিশ সরকার আইন প্রণয়নে সক্রিয় হয়েছিল। বহু সংবাদপত্রের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন তিনি। নিজেও একটি বাংলা-ইংরেজি পত্রিকা এবং একটি ফারসি সাপ্তাহিক চালিয়েছিলেন। এরই সঙ্গে চালিয়েছিলেন তাঁর অভিযান ১৮২৩ সালের সংবাদপত্র-নিয়ন্ত্রণ আইনের বিরুদ্ধে।

রামমোহনের কাজের ধারাকে বহন করেছিলেন দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮১৭-১৯০৫)। এই সাধুপ্রকৃতির মানুষটি ব্রাহ্মসমাজের ঔপনিষদিক বিশ্বাসকে সুপ্রতিষ্ঠা দেয়ার জন্য অনেক কাজ করেছেন। এঁর পুত্র কবি রবীন্দ্রনাথ (১৮৬১-১৯৪১)। ব্রাহ্ম পরিবারে জন্ম হলেও তিনি সমাজের একটা বড় রকমের দুর্বলতা লক্ষ্য করেছিলেন। এ সমাজ শুধু উচ্চকোটির মানুষদেরই কাছে টেনেছে। সাধারণ মানুষের ধর্ম নিয়ে যে চেষ্টা, যে সংগ্রাম

১. এই অপরাধমূলক লজ্জাজনক প্রথাটির কোনও শাস্ত্রীয় অনুমোদন নেই। হিন্দু সমাজের কোনও কোনও অংশে উচ্চশ্রেণির মধ্যে প্রধানত এর চল ছিল। মহান মুঘল সম্রাট আকবর আগেই এই প্রথা বিলোপের চেষ্টা করেছিলেন এবং হিন্দু মরাঠা নৃপতিরাও এর বিরুদ্ধে ছিলেন। কিন্তু তাঁরা এই অপকর্ম উচ্ছেদে সফল হননি।

তার সঙ্গে কোনও সম্বন্ধই রাখেনি। আমরা লক্ষ্য করি, রবীন্দ্রনাথ তাঁর কবিতা এবং অন্যান্য লেখাতেও অন্ত্যজ শ্রেণির মানুষদের চিন্তাভাবনা, প্রজ্ঞার কথা তুলে ধরেছেন। অক্সফোর্ডে তাঁর হিবার্ট বক্তৃতায় (১৯৩০) বলেছেন মধ্যযুগের মরমিয়া সাধক আর বাউলদের কথা। তাঁর ভালবাসা প্রকাশ পেয়েছে তার মধ্যে। পরিশেষে ব্রাহ্ম সমাজের আর-একটি শাখার কথা বলি। এর নেতা ছিলেন কেশবচন্দ্র সেন (১৮৩৪-৮৪)। এই শাখাটি অনেকটাই খ্রিস্টান মনোভাবাপন্ন।

হিন্দু নবজাগরণের আর এক আন্দোলনের মূলে আর্যসমাজ। ১৮৭৫ সালে এর প্রতিষ্ঠা করেন স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী (১৮২৪-৮৩)। পুরনোকে ফিরিয়ে আনাই এঁদের লক্ষ্য, এঁদের দৃষ্টিভঙ্গি। 'ফিরে চলো বৈদিক লোকে' এই এদের ধ্বনি। আর্যসমাজ সমাজেসবার খুবই ভাল কাজ করেছে শিক্ষা বিস্তারের চেষ্টায়, পিছিয়ে-পড়া শ্রেণির মান উন্নয়নে। যুক্তপ্রদেশ আর পাঞ্জাবে আর্যসমাজের বেশ উৎসাহী অনুগামী ছিল। এবং হিন্দু ধর্মান্দোলনগুলোর মধ্যে বোধহয় একমাত্র আর্যসমাজিরাই ধর্মান্তরণে বিশ্বাসী।

ব্রাহ্মসমাজ ছাড়া হিন্দুধর্মের আর একটি নতুন ধারা গড়ে উঠেছিল বাংলায় রামকৃষ্ণ পরমহংসের (১৮৩৪-৮৬) প্রভাবে। ইনি ভক্তি-আন্দোলনের ধারার সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবেই যুক্ত। রামকৃষ্ণ যে ঐতিহ্যের প্রতিনিধি তা ব্রাহ্ম ধারা থেকে স্বভাবত স্বতন্ত্র। নিছক বৌদ্ধিক মননের মানুষ নন, ঈশ্বরের প্রতি সরল ভক্তিকেই ইনি সবিশেষ গুরুত্ব দেন। নানান দেব-দেবীর মূর্তি নিয়ে লৌকিক হিন্দুধর্মের যে ধারা, তার সঙ্গে তিনি মিলিয়ে নিয়েছিলেন প্রেমাস্পদ, সর্বশক্তিমান, ঈশ্বরে বিশ্বাসকে। কেননা তিনি বলতেন ঈশ্বরকে তিনি দেখতে পান নানারূপে। অবশ্য এই ভাবনা বেদান্তেরই অনুসারী। তিনি নিজে শাস্ত্র নিয়ে বিশেষ মাথা ঘামাননি। তাত্ত্বিক জটিলতা বাদ দিয়ে সরল ভক্তির কথাই বলতেন তিনি। তাঁর বিচিত্র ব্যক্তিত্ব বহু মানুষকে আকৃষ্ট করেছিল। এঁদের মধ্যে একজন রোম্যা রোলাঁ। ইনি রামকৃষ্ণের জীবনীও লিখেছিলেন। রামকৃষ্ণের শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দ (১৮৬২-১৯০২) বেদান্তর অদ্বৈতবাদের তত্ত্ব ভারতে ও বহির্ভারতে প্রচার করেছিলেন। বর্তমানে পাশ্চাত্যর বহু দেশেই

রামকৃষ্ণ মিশনের শাখা আছে। নানাদিক থেকে বিবেকানন্দের ব্যক্তিত্ব তাঁর গুরুর ব্যক্তিত্ব থেকে অনেকটাই আলাদা। সামাজিক সমস্যা নিয়ে তাঁর ছিল প্রবল আগ্রহ। নিজেকে তিনি একজন সমাজবাদী বলে ঘোষণা করতেন। তাঁর আকাঙ্ক্ষা ছিল 'ভারতের ধর্মকে নিয়ে ইউরোপীয় আদর্শে সমাজ গড়ে তোলা'। রামকৃষ্ণ মিশন শিক্ষা বিস্তার, দরিদ্রের জন্য চিকিৎসার ব্যবস্থা ও সাহায্যদানে এবং পাশ্চাত্যে হিন্দুধর্মের তত্ত্বপ্রচারে বেশ ভাল কাজ করে চলেছে।

দক্ষিণ ভারতে এই ধরনের গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র হলেন রমণ মহর্ষি (১৮৭৯-১৯৫০)। তিনি কোনও বিধিবদ্ধ ধর্মতত্ত্ব প্রচার করেননি। তাঁর ধর্মীয় আলোচনায় আত্মতত্ত্বের কথাই বলেছেন শুধু।

এই প্রসঙ্গে আমাদের অবশ্যই শ্রীঅরবিন্দ ঘোষের নাম উল্লেখ করতে হবে। তিনি যোগ শিক্ষার উদ্দেশ্যে একটি হিন্দু আশ্রম গড়ে তুলেছিলেন। আর অতি অবশ্যই উল্লেখ করতে হবে মহাত্মা গাঁন্ধীর নাম। তিনি তাঁর শিক্ষা এবং তাঁর দৃষ্টান্তের সাহায্যে গীতার বাণীকে এক বিরাট জনগোষ্ঠীর বরণীয় জীবন্ত বিশ্বাসের জগৎ করে তুলেছিলেন। উনিশ শতকের শেষ এবং বিশ শতকের গোড়ার দিকের এক রাজনীতিক বাল গঙ্গাধর টিলক। তিনিও গীতা এবং মহাত্মা গাঁন্ধীর প্রতি মনোযোগী হয়ে এই ধারাকে অব্যাহত রেখেছিলেন। ভগবদ্‌গীতা চিরকালই কর্মী মানুষকে আকর্ষণ করেছে, যেমন চিন্তাশীল মনস্বীদের আকর্ষণ করেছে উপনিষদ।

সংক্ষেপে এ কথা বলা যায়, পশ্চিমি প্রভাব এমন সব নতুন চিন্তাধারার উদ্ভব ঘটিয়েছে যা পুরনো তত্ত্বগুলোতেই গুরুত্ব আরোপ করেছে। এর অর্থ এই নয় যে, হিন্দুধর্মে কোথাও কোনও পরিবর্তন ঘটেনি। কেননা দেখা যায় অতীতে হিন্দুধর্মে এমন অনেক প্রবণতা ছিল যেগুলো বর্তমানে লক্ষণীয়ভাবে অনেক বেশি জনপ্রিয়।

ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কিছু অনুমান করতে বা তার পূর্ভাভাস দিতে চাই না। হিন্দুরা চিরকালই ঈশ্বর প্রাপ্তির নানাপথের অস্তিত্বে বিশ্বাসী। ধর্মের বাইরের রূপের বদল হতেই পারে, কিন্তু একজন হিন্দু হিসেবে আমি বিশ্বাস করি, পরমপুরুষের জন্য আর্তি বা ব্যাকুলতার বিনাশ নেই। উপনিষদের একটি বাণী উদ্ধৃত করে এই অধ্যায়ের সমাপ্তি ঘটাই।

'য একোঽবর্ণো বহুধা শক্তিযোগাদ্
বর্ণান্ অনেকান্ নিহিতার্থো দধাতি।
বি চৈতি চান্তে বিশ্বমাদৌ স দেবঃ
স নো বুদ্ধ্যা শুভয়া সংযুনক্তু॥'

(শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্, ৪, ১)

যিনি অদ্বিতীয় ও নির্বিশেষ, যিনি অজ্ঞাতপ্রয়োজনে নানা শক্তি সহায়ে সৃষ্টির প্রাক্কালে নানাপ্রকার পদার্থ সৃষ্টি করেন, লয়কালে যাঁর মধ্যে বিশ্ব বিলীন হয় এবং স্থিতিকালে যাঁর মধ্যে অবস্থান করে, তিনি বিজ্ঞানস্বরূপ পরমাত্মা। তিনি আমাদের শুভবুদ্ধিযুক্ত করুন। ৪/১

তৃতীয় ভাগ

হিন্দু ধর্মগ্রন্থ থেকে নির্বাচিত অংশ

[রচনাকাল খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় সহস্রাব্দ ; এর অধিকাংশ হয়তো খ্রি. পূ. ১২০০ অব্দের কাছাকাছি রচিত।]

১· অজানা ঈশ্বরের উদ্দেশে

(দশম মণ্ডল, সূক্ত ১২১)

সর্বপ্রথমে কেবল হিরণ্যগর্ভই বিদ্যমান ছিলেন। জাতমাত্রই তিনি সর্বভূতের অদ্বিতীয় অধীশ্বর। তিনি এই পৃথিবী ও আকাশকে স্বস্থানে স্থাপন করলেন। হব্য দিয়ে কোন দেবতাকে পূজা করব? (১)

যিনি জীবের আত্মা দিয়েছেন, বল দিয়েছেন, যাঁর আদেশ দেবতারাও মান্য করেন, যাঁর ছায়া অমৃতস্বরূপ, মৃত্যুও যাঁর ছায়া, কে সেই দেবতা যাঁকে হব্য প্রদান করব? (২)

যিনি নিজ মহিমা দ্বারা যাবতীয় দর্শনেন্দ্রিয়সম্পন্ন গতিশক্তিযুক্ত জীবদের অদ্বিতীয় রাজা হয়েছেন, যিনি এই সব দ্বিপদ চতুষ্পদের প্রভু, কে সেই দেবতা যাঁকে হব্য দিয়ে পূজা করব? (৩)

যাঁর মহিমা দ্বারা এই সব হিমাচ্ছন্ন পর্বত উৎপন্ন হয়েছে, সসাগরা ধরা যাঁরই সৃষ্টি বলে উল্লিখিত হয়, এই সব দিক্‌বিদিক যাঁর বাহুস্বরূপ, কে সেই দেবতা যাঁর উদ্দেশে হব্য প্রদান করব? (৪)

এই সমুন্নত আকাশ ও এই পৃথিবীকে যিনি স্বস্থানে দৃঢ়রূপে স্থাপন করেছেন, যিনি স্বর্গলোক ও নাগলোককে স্তম্ভিত করে রেখেছেন, যিনি অন্তরীক্ষলোক পরিমাণ করেছেন, কে সেই দেবতা হব্য দিয়ে যাঁর পূজা করব? (৫)

দ্যাবা পৃথিবী যাঁর দ্বারা সশব্দে স্তম্ভিত ও উল্লসিত হয়েছিল এবং সেই দীপ্তিশীল দ্যাবা পৃথিবী যাঁকে মনে মনে মহিমান্বিত করে বুঝতে পারল, যাঁকে আশ্রয় করে সূর্য উদয় ও দীপ্র হন, কে সেই দেবতা যাঁকে হব্য দিয়ে পূজা করব? (৬)

ভূরি পরিমাণ জল সমস্ত বিশ্বভুবন আচ্ছন্ন করেছিল, গর্ভধারণ করে তারা উৎপন্ন করল অগ্নিকে, তা থেকে দেবতাদের একমাত্র প্রাণস্বরূপ যিনি তিনি আবির্ভূত হলেন। কে সেই দেবতা যাঁকে হব্য দিয়ে পূজা করব? (৭)

যখন জল বলধারণ করে অগ্নিকে উৎপন্ন করল তখন যিনি নিজ মহিমা দ্বারা সেই জলের উপরে সর্বভাগে নিরীক্ষণ করেছিলেন, যিনি দেবতাদের উপরে অদ্বিতীয় দেবতা হলেন, কে সেই দেবতা, যাঁকে হবি সমর্পণ করব?(৮)

যিনি পৃথিবীর জন্মদাতা, যাঁর ধারণক্ষমতা যথার্থ অর্থাৎ অপ্রতিহত, যিনি আকাশকে জন্ম দিলেন, যিনি আনন্দবর্ধনকারী ভূরিপরিমাণ জল সৃষ্টি করেছেন তিনি যেন আমাদের হিংসা না করেন। আর কোন দেবতাকে আমরা হবি সমর্পণ করব? (৯)

হে প্রজাপতি, তুমি ছাড়া অন্য আর কেউ এই সমস্ত উৎপন্ন বস্তুকে আয়ত্ত করে রাখতে পারেনি। যে কামনাতে আমরা তোমার হোম করছি তা যেন সিদ্ধ হয়, আমরা যেন ধনের অধিপতি হই। (১০)

২· সৃজন-সংগীত
(দশম মণ্ডল, সূক্ত ১২৯)

তৎকালে যা নেই, তাও ছিল না, যা আছে ছিল না তাও। পৃথিবীও ছিল না, অতি দূরবিস্তার আকাশও ছিল না। আবরণ করে এমনকি ছিল? কোথায় কার স্থান ছিল? দুর্গম ও গম্ভীর জল কি তখন ছিল? (১)

তখন মৃত্যুও ছিল না, অমরত্বও ছিল না, রাত্রি ও দিনের প্রভেদ ছিল না। কেবল সেই একমাত্র বস্তু বায়ুর সহকারিতা ছাড়া আত্মামাত্র অবলম্বনে নিশ্বাস প্রশ্বাস যুক্ত হয়ে জীবিত ছিলেন। তিনি ছাড়া আর কিছুই ছিল না। (২)

সর্বপ্রথমে অন্ধকারের দ্বারা অন্ধকার আবৃত ছিল। সমস্তই চিহ্নবর্জিত ও চতুর্দিকে জলময় ছিল। অবিদ্যমান বস্তুদ্বারা সেই সর্বব্যাপী আচ্ছন্ন ছিলেন। তপস্যার প্রভাবে সেই এক বস্তু জন্ম নিলেন। (৩)

সর্বপ্রথমে মনের উপর কামের আবির্ভাব হল, তা থেকে সর্বপ্রথম উৎপত্তিকারণ নির্গত হল। বুদ্ধিমানেরা বুদ্ধি দ্বারা আপন হৃদয়ে পর্যালোচনা করে অবিদ্যমান বস্তুতে বিদ্যমান বস্তুর উৎপত্তিস্থান নিরূপণ করলেন। (৪)

রেতোধা পুরুষেরা উদ্ভূত হলেন। মহিমা-সকল উদ্ভূত হলেন। তাদের রশ্মি দুই পার্শ্বে ও নিম্নের দিকে এবং ঊর্ধ্বদিকে বিস্তারিত হল, নিম্নদিকে রইল স্বধা, প্রয়তি রইলেন ঊর্ধ্বদিকে। (৫)

কেই বা প্রকৃত জানে? কেই বা বর্ণনা করবে? কোথা থেকে জন্মাল? কোথা থেকে এই সব নানা সৃষ্টি হল? দেবতারা এই সব নানা সৃষ্টির পর হয়েছেন। কোথা হতে যে হল তা কেই বা জানে? (৬)

এই নানা সৃষ্টি যে কোথা হতে হল, কার থেকে হল, কে সৃষ্টি করেছেন, কি করেননি তা তিনিই জানেন, যিনি এর প্রভুস্বরূপ পরমধামে আছেন। অথবা তিনিও না জানতে পারেন। (৭)

৩· ঊষার উদ্দেশে

(প্রথম মণ্ডল, সূক্ত ১১৩)

জ্যোতিসমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এই জ্যোতি। ঊষা এসেছেন। তাঁর বিচিত্র, জগৎ-প্রকাশক রশ্মিও ব্যাপ্ত হয়ে প্রকাশ পেয়েছে। যেমন রাত্রি সবিতার প্রসূত, তেমনি রাত্রিও ঊষার উৎপত্তির জন্য জন্মস্থান কল্পনা করেছেন।(১)

দীপ্তিময়ী শুভ্রবর্ণা সূর্যের মতো ঊষা এসেছেন ; কৃষ্ণবর্ণা রাত্রি নিজ স্থানে গিয়েছেন ; রাত্রি ও ঊষা উভয়েই সূর্যের বন্ধু এবং উভয়েই অমর। একে অন্যের পর আগমন করেন এবং একে অন্যের বর্ণ বিনাশ করেন; এইভাবে তাঁরা দীপ্তিমান হয়ে বিচরণ করেন। (২)

এই ভগ্নীশ্বর রাত্রি এবং ঊষার একই অনন্ত সঞ্চরণমার্গ দীপ্তিমান সূর্যের দ্বারা আদিষ্ট হয়েছে, তাঁরা একের পর অন্যে সেই পথে বিচরণ করেন। সকল বস্তুর উৎপাদনকারী রাত্রি ও ঊষা ভিন্ন ভিন্ন রূপ ধারণ করলেও সমান মনঃসম্পন্না ; তাঁরা পরস্পরকে বাধা দেন না এবং কখনও স্থির হয়ে অবস্থিতি করেন না।(৩)

আমরা প্রভাসম্পন্না সুনৃতবাক্যের নেত্রী বিচিত্রা ঊষাকে জানি, তিনি আমাদের দ্বার খুলে দিয়েছেন। তিনি সর্বজগৎ আলোকপূর্ণ করে আমাদের ধন প্রকাশ করে দিয়েছেন। তিনি সমস্ত বিশ্বলোক প্রকাশ করে দিয়েছেন।(৪)

যে সমস্ত মানুষ বক্র হয়ে শুয়েছিল ঊষা তার মধ্যে কাউকে ভোগের জন্য, কাউকে যজ্ঞের জন্য এবং কাউকে ধনের জন্য, সকলকেই নিজ নিজ কর্মের জন্য জাগরিত করেছেন। যারা অল্প দেখতে পায় ঊষা তাদের বিশেষরূপে দৃষ্টির জন্য অন্ধকার দূর করেন। বিস্তীর্ণ ঊষা সমস্ত বিশ্বলোক প্রকাশ করে দিয়েছেন। (৫)

ঊষা কাউকে ধনের জন্য, কাউকে অন্নের জন্য, কাউকে মহাযজ্ঞের জন্য, কাউকে অভীষ্ট লাভের জন্য জাগরিত করেন ; তিনি ভিন্ন ভিন্ন জীবনোপায় প্রকাশ করে দেয়ার জন্য সমস্ত বিশ্বলোক প্রকাশ করে দিয়েছেন। (৬)

ঐ নিত্যযৌবনসম্পন্না, শুভ্রবসনা, আকাশদুহিতা অন্ধকার দূর করে মুনষ্যের দর্শনগোচর হয়েছেন। তিনি পার্থিব সমস্ত ধনের ঈশ্বরী। হে সুভগে তুমি আজ এই স্থানে অন্ধকার দূর করো। (৭)

অতীত ঊষাগণ যে অন্তরীক্ষপথ দিয়ে গিয়েছেন সেই পথে ঊষা অনুগমন করছেন ; ভবিষ্যতে অনন্ত ঊষাগণ সেই পথ অনুধাবন করবেন। ঊষা অন্ধকার দূর করে জীবগণকে জাগরিত করে মৃতবৎ সংজ্ঞাশূন্য লোককে চৈতন্য দান করেন। (৮)

হে ঊষা, যেহেতু তুমি অগ্নি প্রজ্বলিত করেছ, সূর্যের আলোকে অন্ধকার দূর করেছ এবং যজ্ঞরত মানুষদের অন্ধকারমুক্ত করে দিয়েছ, অতএব তুমি দেবগণের উপকারজনক কর্ম করেছ। (৯)

কতকাল থেকে ঊষা উৎপন্ন হচ্ছেন, কতকাল পর্যন্ত উৎপন্ন হবেন। বর্তমান ঊষা পূর্ব ঊষাকে সাগ্রহে অনুকরণ করছেন, আবার আগামী ঊষাগুলো এই দীপ্তিময়ী ঊষাকে অনুকরণ করবে। (১০)

যে মানুষেরা অতি পূর্বকালের ঊষাকে আলোক প্রকাশ করতে দেখেছিলেন তাঁরা এখন গত হয়েছেন ; আমরা এখন ঊষাকে দর্শন করছি, ভবিষ্যতে যাঁরা ঊষাকে দর্শন করবেন তাঁরা আসছেন। (১১)

তিনি বিদ্বেষীদের দূর করেন, যজ্ঞপালন করেন, যজ্ঞের জন্য প্রাদুর্ভূত হন, তিনি সুখপ্রদান করেন এবং সুনৃত শব্দ প্রেরণ কেরন। ঊষা কল্যাণবতী ও দেবগণের আকাঙ্ক্ষিত যজ্ঞ ধারণ করেন। হে ঊষা, তুমি উৎকৃষ্টরূপে আজ এই স্থানে আলোক প্রকাশ করো। (১২)

ঊষাদেবী পূর্বকালে নিত্য উদয় হতেন, ধনবতী ঊষা এখনও এই জগৎ অন্ধকারবিমুক্ত করছেন, তেমনি তিনি ভবিষ্যতেও দিনে দিনে উদয় হবেন, কেননা তিনি অজরা ও অমরা হয়ে স্বকীয় তেজে বিচরণ করেন। (১৩)

ঊষা আকাশের বিস্তীর্ণ দিকগুলো আলোকপূর্ণ তেজোদ্বারা দীপ্তিমান করছেন, ঊষাদেবী রাত্রিকৃত কৃষ্ণরূপ দূর করেছেন। সুপ্ত প্রাণীদের জাগরিত করে ঊষা অরুণ অশ্বযুক্ত রথে আগমন করছেন। (১৪)

তিনি পোষণসমর্থ বরণীয় ধন আনয়ন করে এবং সকলকে চৈতন্য দান করে বিচিত্র রশ্মি প্রকাশ করছেন। তিনি পূর্বগত অনেক ঊষার উপমাস্বরূপ এবং আগামী প্রভাযুক্ত ঊষাসমূহের প্রারম্ভস্বরূপ। তিনি রশ্মি বিকাশ করছেন। (১৫)

হে মনুষ্যগণ, ওঠো, আমাদের (শরীর) পরিচালক জীবন এসে উপস্থিত, অন্ধকার অপগত, আলোক সমুপস্থিত। (ঊষা) সূর্যের গমনের জন্য পথ করে দিয়েছেন ; যেখানে অন্নদান চলেছে সেখানে যাব। (১৬)

স্তুতিবাহক স্তোতা প্রভাযুক্ত ঊষাকে স্তব করে সুগ্রথিত বাক্যগুলো উচ্চারণ করছে। হে ধনবতী ঊষা, আজ সেই স্তোতার অন্ধকার বিনাশ করো এবং তাকে সন্ততিযুক্ত অর্থ দান করো। (১৭)

যে গাভী-সম্পন্ন ও সকল বীরযুক্ত ঊষাসমূহ বায়ুর মতো (শীঘ্র) সুনৃত স্তুতি শেষ হলে হব্যদাতা মানুষের অন্ধকার বিনাশ করেন, সেই অশ্বদাতা ঊষা সোম-অভিষবকারীর প্রতি প্রসন্ন হোন। (১৮)

হে ঊষা, তুমি দেবগণের মাতা অদিতির প্রতিস্পর্ধিনী, তুমি যজ্ঞ প্রকাশ করো, বিস্তীর্ণ হয়ে কিরণ দান করো, আমাদের স্তোত্র প্রশংসা করে আমাদের উপর উদয় হও ; হে সকলের বরণীয়, আমাদের জনপদে প্রাধুর্ভূত করো। (১৯)

ঊষাগণ যে কিছু বিচিত্র গ্রহণযোগ্য ধন আনয়ন করে, তা যজ্ঞসম্পাদক স্তোতার কল্যাণ-স্বরূপ। মিত্র, বরুণ, অদিতি, সিন্ধু, পৃথিবী ও দ্যৌঃ আমাদের রক্ষা করুন। (২০)

৪· রুদ্রের উদ্দেশে

[সপ্তম মণ্ডল, সূক্ত ৪৬]

স্থিরকার্মুক, শীঘ্রগামী, বাণবিশিষ্ট, অন্নবান, কারও দ্বারা অনভিভূত, সকলের অভিভবকর এবং তীক্ষ্ণাস্ত্রবিধানকারী রুদ্রের উদ্দেশে স্তুতি করো। তিনি শ্রবণ করুন। (১)

পৃথিবীস্থ ও স্বর্গস্থজনের ঐশ্বর্য দ্বারা তাঁকে জানতে পারা যায়। হে রুদ্র, তোমার স্তবকারী আমাদের প্রজাগণকে পালন করে আমাদের গৃহে গমন করো। আমাদের রোগ দান কোরো না। (২)

অন্তরীক্ষ থেকে বিমুক্ত তোমার যে বিদ্যুৎ ক্ষিতিতলে বিচরণ করে, সে আমাদের পরিত্যাগ করুক। হে স্বপিবাত, তোমার সহস্র ভেষজ আছে; আমাদের পুত্র বা পৌত্রের প্রতি হিংসা কোরো না। (৩)

হে রুদ্র, আমাদের হিংসা কোরো না, আমাদের ত্যাগ কোরো না। তুমি ক্রুদ্ধ হয়ে যে বন্ধন কর, আমরা যেন তার মধ্যে না থাকি, জীবগণের প্রশংসাযোগ্য যজ্ঞে আমাদের ভাগী করো। তোমরা সর্বদাই আমাদের স্বস্তিদ্বারা পালন করো। (৪)

৫· অগ্নির উদ্দেশে

[দ্বিতীয় মণ্ডল, সূক্ত ৪]

হে যজমানগণ, আমি তোমাদের জন্য অত্যন্ত দীপ্তিবিশিষ্ট, পাপবর্জিত, যজমানগণের অতিথিস্বরূপ, হব্যযুক্ত অগ্নিকে আহ্বান করি। তিনি সর্বভূতজ্ঞ এবং মানুষ থেকে দেবতা পর্যন্ত সকলের ধারণকর্তা। ভৃগুগণ অগ্নির পরিচর্যা

করে জলের নিবাসস্থানে অন্তরীক্ষে এবং মানুষের সন্তুতিদের মধ্যে স্থাপন করেছিলেন। দ্রুতগামী অশ্ববিশিষ্ট এবং দেবগণের ঈশ্বর অগ্নি আমাদের বিরোধী সমস্ত ভূতজাতকে পরাভূত করুন। দেবগণ স্বর্গগমনের সময়ে মিত্রের মতো অগ্নিকে মনুষ্যগণের মধ্যে স্থাপন করেছিলেন। সেই অগ্নি হব্যপ্রদায়ী যজমানের জন্য তাঁর যোগ্য গৃহে স্থাপিত হয়ে, যে রাত্রিগণ তাঁকে কামনা করে, সেই রাত্রিতে দীপ্ত হন। নিজের শরীর পুষ্টিকরণের মতো অগ্নির শরীর পুষ্টিকার্যও রমণীয়। অগ্নি যখন চারদিকে ব্যাপ্ত হন এবং কাষ্ঠ দহন করেন তখন তাঁর শরীর অতিশয় সুন্দর হয়। রথে অশ্ব যেমন পুচ্ছ বারবার কাঁপায়, অগ্নিও কাষ্ঠে তেমনি নিজ শিখা কম্পিত করেন। আমার সহযোগী স্তোতারা যে অগ্নির মহত্ত্বের স্তুতি করছেন তিনি আগ্রহী ঋত্বিকদের কাছে স্বীয়রূপ প্রকাশ করছেন। তিনি রমণীয় হব্যের জন্য বিচিত্র কিরণমালায় প্রকাশিত হচ্ছেন। তিনি জীর্ণ হয়েও বারবার তৎক্ষণাৎ যুবা হতে পারেন। যে অগ্নি তৃষিতের মতো বনরাজিকে দগ্ধ করেন, জলের মতো ইতস্তত গমন করেন, রথবাহী অশ্বের শব্দ করেন, তিনি কৃষ্ণবর্ত্মা ও তাপক হলেও নভোলোকশোভিত দ্যুলোকের মতো রমণীয়। যে অগ্নি বিশ্বব্যাপ্ত করেন, সেই দীপ্তিমান অগ্নি শুষ্ক বৃক্ষাদিকে দহন করে কণ্টক প্রভৃতিকে কৃষ্ণ করে, প্রভূত রসাস্বাদন করছেন। হে অগ্নি, তুমি পূর্বে প্রথম সবনে যে রক্ষা করেছিলে, তা স্মরণ করে আমরা আজও তৃতীয় সবনে মনোহর স্তোত্র উচ্চারণ করছি। হে অগ্নি, তুমি আমাদের বীরবিশিষ্ট, মহান, কীর্তিমান সুন্দর অপত্য ও ধন প্রদান করো। হে অগ্নি, গৃৎসমদ ঋষিরা তোমাকে রক্ষক পেয়ে ছন্দপাঠ করে গুহায় অবস্থিত উৎকৃষ্ট স্থানে বর্তমান ধনবিশেষ লাভ করবে। এবং উত্তম পুত্রাদি লাভ করে শত্রুদের অভিভব সাধন করবে। মেধাবী ও স্তুতিকারী যজমানদের অতিপ্রভূত ও প্রসিদ্ধ অন্ন প্রদান করো।

খ· অথর্ববেদ

[অথর্ববেদের মূল সুদূর অতীতে প্রোথিত হলেও বর্তমান রূপের সৃষ্টি আনুমানিক ১০০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে।]

১· দ্বাদশ কাণ্ড, ভূমিসূক্ত ১-২৭

বৃহৎ সত্য, ঋত, ওজঃ, দীক্ষা, তপস্, ব্রহ্ম, যজ্ঞ পৃথিবীকে ধারণ করে আছে। যা কিছু ছিল এবং হবে তার ধারয়িত্রী পৃথিবী আমাদের দান করুন বিরাট আলোকিত রাজ্য।

কত উচ্চাবচ ভূমি, কত বিশাল সমতল—যার মধ্যে বিচিত্রবীর্য ওষধি! নিজে মুক্ত থেকেও কী বাঁধনে বাধছ মানুষকে। আমাদের জন্য তোমার এই বিস্তার।

তোমার মধ্যে আছে সমুদ্র, নদী, জল, আহার্য আর মানুষের কত প্রজাতি, প্রাণের নিশ্বাস নিয়ে এই চলমান জীবন। আমাদের তুমি পানের সৌভাগ্য দাও।

বসুন্ধরা, তোমার চারটি দিক, তোমার মধ্যে জন্ম এই শস্যের, এই মানুষের। তুমি আমাদের দাও গোধন, দাও অন্য সম্পদ।

এখানে আমাদের পূর্বপুরুষের বিকাশ, এখানে দেবতারা অসুর-বিজয়ী। ভূচর, খেচর সকলের স্থান এখানে। হে পৃথিবী, আমাদের আলো দাও, আনন্দ দাও।

হে পৃথিবী, তুমি সকলের আশ্রয়, ঐশ্বর্যদায়িনী তুমি, বিশ্বের তুমি বিশ্রামাগার। বৈশ্বানর অগ্নিকে ধারণ করে আছ তুমি, ইন্দ্রবৃষের ধেনু রয়েছে তোমাতে, আমাদের তুমি সম্পদের অধিকারী করো। এই বিশাল পৃথ্বীকে দেবতারা রেখেছেন অতন্দ্র প্রহরায়, হে পৃথ্বী, আমাদের জন্য মধু দোহন করে দাও তুমি, আমাদের মহান করে তোলো।

এই পৃথিবী ছিল শুধু জলময়, মহাশূন্যে অবস্থিত। প্রজ্ঞার সহায়তায় মনীষীরা জেনেছেন। এর হৃদয়ের অধিষ্ঠান সুদূর স্বর্গলোকে, সত্যে আবৃত। এই ভূমি আমাদের শক্তি দিন, দান করুন সার্বভৌমত্ব।

এই ভূমিতে দিনরাত বয়ে চলেছে বিচিত্র ধারা, নিরন্তর তার বেগ। সেই ধারা আমাদের কাছে পয়োধারা হোক, আমাদের মহীয়ান করে তুলুক।

অশ্বিযুগল যাঁর পরিমাপ করেছেন, যেখানে বিষ্ণুর পদক্ষেপ, শচীপতি ইন্দ্র যাঁকে অমিত্রশূন্য করেছেন সেই মাতৃভূমি আমাদের স্তন্যদান করুন। আমি তাঁর পুত্র।

হে পৃথিবী, তোমার হিমাবৃত পর্বত, তোমার অরণ্য আমাদের প্রতি প্রসন্ন হোক। পিঙ্গলবর্ণা, তমসাবৃতা, রক্তিমাভা, বহুবর্ণা ধ্রুবা পৃথিবী, তুমি ইন্দ্রের দ্বারা সুরক্ষিত। আমি সেখানেই অধিষ্ঠিত— অক্ষত, অদম্য, অনাহত।

পৃথিবী, তোমার নাভিদেশে যে বজ্রবীর্যের জন্ম সেখানে স্থান দাও আমাদের, হে মাতা, আমি তোমার সন্তান। পর্জন্যদেব আমাদের পিতা, আমাদের পালন করুন, রক্ষা করুন।

যে ভূমিতে যাজ্ঞিকেরা বেদি রচনা করেন, যজ্ঞের আয়োজন করেন, যে ভূমিতে যূপগুলো প্রোথিত হয় আহুতিদানের আগে সে ভূমি সমৃদ্ধ হোক, সমৃদ্ধ করুন আমাদেরও।

আমাদের প্রতি যে বিদ্বেষভাবাপন্ন, যে আমাদের যুদ্ধে আহ্বান করে, আমাদের বিধ্বংস যার সংকল্প, অস্ত্র নিয়ে ধাবমান হয় আমাদের দিকে, তাকে তুমি আমাদের বশীভূত করো।

তোমাতে জাত হয়ে, তোমাতেই বিচরণ করে যত দ্বিপাদ, চতুষ্পদ। তুমি তাদের ভরণের ভার নাও। এই মর্ত্যজগতের মরণশীল জীব তোমার আত্মজন। সূর্যদেব এদের জন্য জ্যোতির্ময় কিরণ বর্ষণ করে চলেছেন।

এই সব প্রাণী আমাদের জন্য দোহন করে আনুক। হে ধরিত্রী, তুমি আমাদের দান করো শব্দের মধু।

সকলের একান্ত আপন, সকলের জন্মদাত্রী, সমস্ত ওষধির জন্মভূমি, তুমি ধর্মের দ্বারা বিধৃতা, কল্যাণমী বসুন্ধরা, যেন আমরা চিরকাল তোমার অনুবর্তী হয়ে চলি।

তুমি মহামিলনভূমি। তোমার মধ্যে কী বিপুল বেগ, কী মহাকম্পন, কী

প্রবল চাঞ্চল্য। মহান ইন্দ্র তোমার রক্ষক। তুমি আমাদের স্বর্গের ঔজ্জ্বল্য দান করো। আমাদের যেন কেউ ঘৃণা না করে। তোমার মৃত্তিকার মধ্যে রয়েছে অগ্নি, অগ্নি তোমার লতাগুল্মে, অগ্নি প্রস্তরে, গো অশ্ব সকলের মধ্যে অগ্নি, অগ্নি রয়েছে মানুষের মধ্যে।

তোমার আকাশ আগুন ঝরাচ্ছে দিকদিগন্তকে তপ্ত করে তুলে, বিপুল মহাকাশে সে আগুন প্রজ্জ্বলিত। আর মানুষও প্রজ্জ্বলিত করে তুলেছে হব্যবাহন অগ্নিকে।

তুমিতো পরেছ অগ্নিবসন হে পৃথিবী। আমাকেও অগ্নিময় দীপ্ত তেজে পূর্ণ করো।

২· মৃত্যুর সংকট থেকে ত্রাণের প্রার্থনা

[অষ্টম কাণ্ড, প্রথম অনুবাক]

সর্বপ্রাণীর নাশকর্তা মৃত্যুদেবের উদ্দেশে নমস্কার। হে আয়ুষ্কাম মানবক, তোমার প্রাণ ও অপান অন্তকের অনুগ্রহে এ শরীরে ক্রীড়া করুক। এ পুরুষ সজীব হয়ে পুত্র-পৌত্রাদির সঙ্গে সূর্যের ভাগরূপ ভূলোকে অবস্থান করুক। সকল প্রাণীর আরাধ্য সূর্যদেব মূর্ছারূপ অন্ধকারে প্রবিষ্ট এ পুরুষকে উদ্ধার করুন, সোমদেব, মরুদ্‌গণ এবং ইন্দ্র ও অগ্নি মঙ্গলের জন্য এ পুরুষকে উদ্ধার করুন। হে আয়ুষ্কাম পুরুষ, তোমার মুখ্য প্রাণ চক্ষুরাদি এ শরীরে থাক। তোমার পঞ্চ প্রাণবায়ু, আয়ু ও মন এখানে থাকুক, এগুলো তোমাকে পরিত্যাগ করে যেন অন্যত্র না যায়। হে গতায়ু পুরুষ, পাপদেবতা নির্ঋতির বন্ধনরজ্জুর কাছ থেকে মন্ত্ররূপ দৈববাক্যের দ্বারা তোমাকে ঊর্ধ্বে রাখছি। হে পুরুষ, এ মৃত্যুর পাশগুলো থেকে উৎক্রমণ করো, নিচে পড়ে যেও না। মৃত্যুর পাদবন্ধন পাশ ছিন্ন করতে করতে অগ্নি ও সূর্যের সন্দর্শনের জন্য (অর্থাৎ চিরজীবন লাভের জন্য) এ ভূলোক থেকে বিচ্ছিন্ন হইও না। হে মুমূর্ষু, মাতরিশ্বা বায়ু তোমার সুখের জন্য প্রবাহিত হোক, জলসকল তোমার জন্য অমৃতবর্ষণ করুক, সূর্যদেব তোমার শরীরের যাতে অসুখ হয়, সেভাবে তাপদান করুন। হে পুরুষ, মৃত্যুদেব তোমাকে রক্ষা করুন। তুমি মৃত্যুমুখে পতিত হইও

না। হে পুরুষ, মৃত্যুপাশ থেকে তোমার ঊর্ধ্ব ও নিম্নগমন নেই। তোমার জীবন ও বলের জন্য আমি ঔষধ প্রস্তুত করছি। তুমি ইন্দ্রিয়ের অনুকূল অমরণধর্মী দেহরূপ রথে আরোহণ করো এবং জীর্ণ না হয়ে 'আমি সংজ্ঞা লাভ করেছি'—এ কথা বলো। যমবিষয়ে তোমার মন যেন না যায়, সেখানে বিলীন যেন না হয়। বন্ধুদের জন্য অনবধান হইও না, মৃত পূর্বপুরুষদের অনুগমন কোরো না। ইন্দ্রাদি সকল দেবগণ এ শরীরে তোমাকে রক্ষা করুন। পিতৃলোকে গত পুরুষদের চিন্তা কোরো না, তারা তোমাকে দূর দেশে নিয়ে যাবে। ম্রিয়মাণ পুরুষের জ্ঞাননাশে অন্ধকারে প্রবেশের মতো হয়, সে অন্ধকার থেকে তুমি জ্ঞানলোকে আরোহণ করো, আমরা তোমার হাত ধরে থাকব (অর্থাৎ তোমার আরোহণের অনুকূল প্রযত্ন আমরা করব)। হে মুমূর্ষু, তোমাকে যমের মার্গরক্ষক শ্যাম ও শবল নামক কুকুর দুটি যেন বাধা না দেয়। তাদের দ্বারা অসঙ্গৃষ্ট হয়ে আমাদের কাছে এসো। এ ভূলোকে থেকে কখনও পরাঙ্মুখ হইও না (অর্থাৎ না ফেরবার চিন্তাও মনে স্থান দিয়ো না)। হে গতায়ু পুরুষ, মৃত ব্যক্তি যে পথে গিয়েছে, সে পথে অনুসরণ করে যেয়ো না। এ পথ ভয়ংকর, যে পথে মরবার পূর্বে তুমি যাওনি, সে পথের কথা তোমাকে বলছি। এ মরণরূপ অজ্ঞান অন্ধকারে তুমি পা বাড়িয়ো না, পূর্বদেশে যমপুরীতে ভয় আছে, আমাদের অভিমুখে আগমনপথে তোমার অভয় মঙ্গল রয়েছে।

হে রক্ষাকামী রাজা, জলের মধ্যে বাড়বাদিরূপে বর্তমান অগ্নিসকল তোমাকে রক্ষা করুক। যে অগ্নিকে মানুষেরা আহবনীয়রূপে অথবা পাকাদিরূপে দীপ্ত করে, সে অগ্নি তোমাকে রক্ষা করুক। সকল নরের হিতকারী জঠরাগ্নি ও সকলের জ্ঞাতা যে অগ্নি, সে তোমাকে রক্ষা করুক, দিব্য অগ্নি তার বিদ্যুৎ-রূপ শরীরের সঙ্গে তোমাকে যেন দগ্ধ না করে। মাংসভক্ষক অগ্নি তোমাকে তার আহার্যরূপে যেন মনে না করে। তুমি শবভক্ষক অগ্নি থেকে দূরে বিচরণ করো। দ্যুলোক, পৃথিবী, সূর্য ও চন্দ্রমা ভয় থেকে তোমাকে রক্ষা করুন। অন্তরীক্ষ দেবপ্রেরিত আয়ুধ থেকে তোমাকে রক্ষা করুন। বোধ, প্রতিরোধ, স্বপ্নরহিত, নিদ্রারহিত, সর্বদা দেহরক্ষক, জাগরণশীল— এ সকল দেবগণ যুগ্মরূপে তোমাকে রক্ষা করুন। বোধাদি দেবগণ তোমায় পালন করুন, তোমাকে সব দিক দিয়ে রক্ষা

করুন। সেই দেবতাদের উদ্দেশে নমস্কার। পুত্রভার্যাদির আনন্দের জন্য বায়ু, ইন্দ্র, ধাতা, পালক সবিতা তোমাকে মৃত্যুর কাছ থেকে আকর্ষণ করুন। প্রাণ ও বল যেন তোমাকে ত্যাগ না করে। প্রাণবায়ুকে তোমার আনুকূল্যে আহ্বান করছি। অদিতির পুত্রগণ তোমাকে মৃত্যুর মুখ থেকে ঊর্ধ্বে নিয়ে যাক। অষ্টবসুগণ, ইন্দ্র ও অগ্নিদেব, দ্যুলোকে দেবতা, পৃথিবী এবং সকল দেবগণের পিতা প্রজাপতি তোমার মঙ্গলের জন্য তোমাকে ঊর্ধ্বে ধারণ করুক। সোমপত্নী ওষধি-দেবীগণ তোমাকে মৃত্যুর কাছ থেকে পালন করুন। হে আদিত্যাদি দেবগণ,এ ব্যক্তি ভূলোকেই থাকুক, এ লোক থেকে যেন স্বর্গলোকে না যায়। আমরা সহস্রবীর্যের দ্বারা মৃত্যুর কাছ থেকে একে উদ্ধার করব। হে আয়ুষ্কাম পুরুষ, মৃত্যুর হাত হতে তোমার রক্ষার জন্য আয়ুর ধারক দেবগণ তোমার সন্ধান করুন। বন্ধুপত্নীগণ যেন তোমার জন্য অশ্রুবিসর্জন না করে। তোমার দুঃখে বান্ধবগণ যেন রোদন না করে। হে মৃত্যুগ্রস্ত পুরুষ, তোমাকে মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরে পেয়েছি। আবার নতুন জীবন লাভ করে তুমি ফিরে এসেছ। তুমি সম্পূর্ণাঙ্গ হয়েছ। সব কিছু তোমার চক্ষুর বিষয়ীভূত হোক। তোমার শত বৎসর আয়ু লাভ হয়েছে। হে মূর্ছিত পুরুষ, তুমি অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়েছিলে, জ্ঞান ফিরে পেয়েছ, তোমার কাছ থেকে সকল অন্ধকার চলে গেছে। তোমার নিকট থেকে বাইরের ও ভেতরের সকল রোগ আমরা দূর করেছি।

হে আয়ুষ্কাম পুরুষ, আমাদের ক্রিয়মাণ অমৃতের ধারা অনুভব করতে আরম্ভ করো। জরা পর্যন্ত অবিচ্ছিন্ন ভোজন তোমার হোক। সে জন্য মৃত্যুর দ্বারা অপহৃত তোমার আয়ু আমরা নিয়ে আসছি। আমাদের সত্ত্বগুণের প্রতিবন্ধক রজোগুণ, আবরক তমোগুণ ও হিংসা প্রাপ্ত হয়ো না। হে পুরুষ, জীবিত মানুষের জ্যোতি আমাদের অভিমুখী হয়ে লাভ করো। শত বৎসর আয়ুলাভের জন্য মৃত্যুর পাশ ছিন্ন করে তোমাকে নিয়ে আসছি। তোমার জন্য দীর্ঘ আয়ু স্থাপন করছি। হে গতায়ু পুরুষ, তোমার প্রাণ আশ্রয়ভূত বাহ্য বায়ু থেকে লাভ করেছি। তোমার চক্ষু সূর্য থেকে লাভ করেছি। যে মন নির্গত হয়েছিল সে মন তোমাতেই ধারণ করছি। তুমি সর্বাঙ্গযুক্ত হইও জিহ্বার দ্বারা আলাপ করো। মন্থন থেকে উৎপন্ন অল্প অগ্নি যেমন মুখবায়ুর দ্বারা দীপিত হয়, সেরূপ হে গতপ্রাণ পুরুষ, প্রাণের দ্বারা অল্পপ্রাণ তোমাকে

প্রভূত প্রাণযুক্ত করছি। হে মৃত্যু, তোমার ক্রূর চক্ষুকে নমস্কার। তোমার প্রকৃষ্ট বলকে নমস্কার। এ পুরুষ জীবিত হোক। এ পুরুষকে সচল করার চেষ্টা করছি। এ মুমূর্ষু পুরুষের চিকিৎসা করছি। হে মৃত্যু, তুমি এ পুরুষকে বিনাশ কোরো না। জীবপ্রদ, বলকারক ওষধিকে এ পুরুষের অনিষ্টবিনাশের জন্য আমি শান্তিকর্মে আহ্বান করছি। হে মৃত্যু, তুমি একে বিনাশ করতে উদ্যত হইও না। এ তোমারই জন, একে প্রাণের সঙ্গে যুক্ত করো। এ ভূলোকে সর্বত্র এর গতি হোক। হে ভব ও শর্ব, তোমরা দুই জন সুখী হও, এ পুরুষকে সুখ দাও। উপস্থিত ব্যাধি প্রভৃতি পাপ দূর করে একে আয়ু দাও। হে মৃত্যু, তোমার কাছ থেকে মৃত্যুর আশঙ্কাকারী এ পুরুষকে মৃত্যুর হাত থেকে উদ্ধার করো। সর্বাঙ্গসম্পন্ন, শ্রবণশক্তিযুক্ত, বার্ধক্য পর্যন্ত শত বৎসর জীবিত থেকে অনন্যাপেক্ষ হয়ে এ ভোগ লাভ করুক। হে পুরুষ, রুদ্রাদি দেবগণের আয়ুধ তোমাকে বর্জন করুক। মূর্ছারূপ আবরণ থেকে তোমাকে আমি রক্ষা করছি। দূর থেকে অগ্নিকে সরিয়ে দিচ্ছি। তোমার জীবনলাভের জন্য প্রাচীর তৈরি করছি। হে মৃত্যু, এ মুমূর্ষু পুরুষকে রক্ষা করার জন্য আমরা একে মন্ত্ররূপ বর্ম পরিয়ে দিচ্ছি।

হে আয়ুষ্কাম পুরুষ, তোমার শরীরে প্রাণ ও অপান বায়ু স্থির করছি। জরা ও মৃত্যু তোমাকে যাতে স্পর্শ না করে সেইরূপ চেষ্টা করছি। দীর্ঘায়ু যুক্ত করে তোমাকে অবিনাশী করছি। মন্ত্রপ্রভাবে যমদূতদের দূরে সরিয়ে দিচ্ছি। পাপদেবতা নির্ঋতিকে, মাংসভক্ষক পিশাচদের এবং যে সকল দুষ্টভাবাপন্ন অন্ধকারের মতো আবরক রাক্ষস আছে, তাদের আমরা বিনাশ করছি। অমর, চিরজীবী, জাতবেদা অগ্নির কাছ থেকে হে পুরুষ, তোমার প্রাণভিক্ষা করছি। যাতে তুমি হিংসিত না হও এবং অমর হও, সেইরূপ শান্তিকর্ম তোমার জন্য করছি। তা তোমার সমৃদ্ধকর হোক। হে কুমার, দ্যাবাপৃথিবী তোমার কল্যাণকর, অসন্তাপকারী ও শ্রীপ্রদ হোক, সূর্য তোমার সুখের জন্য তাপ দিক, তোমার মনের অনুকূলে সুখকররূপে বায়ু প্রবাহিত হোক এবং দিব্য স্বাদু জলসমূহ মঙ্গলময়রূপে বর্ষিত হোক। হে কুমার, ওষধিসকল তোমার সুখকর হোক। তোমাকে পৃথিবীর নিম্নভাগ থেকে উত্তরভাগে উদ্ধৃত করছি। সেখানে অদিতির পুত্র সূর্য ও চন্দ্র উভয়ে তোমাকে রক্ষা করুক। হে বালক, তোমার যে উত্তরীয় বস্ত্র আছে এবং যে বস্ত্র তুমি

নীবিদেশে পরিধান করেছ, এ দুই প্রকার বস্ত্র তোমার শরীরের সুখকর করছি। তার সংস্পর্শে যাতে মৃদুতা লাভ কর সেইরূপ করছি। হে সবিতাদেব, তুমি কেশের ছেদকরূপে শোভন তেজোযুক্ত ক্ষুরের দ্বারা কেশ ও শ্মশ্রু বপন করে বালকের মুখ দীপ্ত করো। আমাদের পুত্রের আয়ু কেড়ে নিইও না। হে অন্নভক্ষণকারী বালক, ব্রীহি ও যব তোমার সুখকর, বলকর ও ভোজনের পর মধুর হোক। এ ব্রীহি যব শরীরের রোগ বিনাশ করে বালককে পাপ থেকে মুক্ত করুক। হে কুমার, তুমি যে অন্ন ভক্ষণ করছ, দুগ্ধের মতো সারভূত (অথবা দুগ্ধমিশ্রিত) যে অন্নপান করছ, যা সুখে ভক্ষণীয় ও যা অভক্ষণীয় (কঠিন দ্রব্য অথবা অত্যন্ত কটু তিক্ত বলে অখাদ্য), সে সকল অন্ন আমি নির্বিষ (অমৃতময়) করছি। হে বিশ্বদেবগণ, ধনাপহারক ও ভক্ষক রাক্ষস-পিশাচদের কাছ থেকে আমাদের এ বালককে রক্ষা করো।

হে বালক, তোমার শত বৎসর আয়ু আমি অযুতসংখ্যক করছি। তোমাকে দুই, তিন, চার যুগল করছি। (জায়াপতিরূপে এক যুগ, পুত্রকন্যারূপে দুই যুগ, পুত্র-পৌত্রাদিরূপে বহু যুগল করছি। অথবা সত্য, ত্রেতা, দ্বাপরাদি বহু যুগ পর্যন্ত পরমায়ুর প্রার্থনা করা হয়েছে।) ইন্দ্র, অগ্নি ও সকল দেবগণ অক্ষুব্ধ হয়ে আমাদের প্রার্থনা অনুমোদন করুন। (যদিও একশো বছর পরমায়ুই মানুষের সম্ভব হয় না, তথাপি 'আকল্প বেঁচে থাকো, কল্প পর্যন্ত তোমার আয়ু হোক,' ইত্যাদি আশীর্বাদ-বচনের মতো এখানে দীর্ঘায়ু প্রার্থনা করা হয়েছে)। হে বালক, শরৎ, হেমন্ত, বসন্ত, গ্রীষ্ম— সকল ঋতুর অভিমানী দেবতাদের উদ্দেশে তোমাকে রক্ষার জন্য প্রদান করছি। যে বর্ষগুলোতে ভোগসাধনরূপ ওষধিগুলো বর্ধিত হয়, সে বর্ষগুলো তোমার সুখকর হোক। মৃত্যু হচ্ছে দ্বিপদ মনুষ্যাদির অধিপতি, চতুষ্পদ গবাদির অধীশ্বর। অতএব এদের অধিপতি মৃত্যুর হাত থেকে মন্ত্রপ্রভাবে তোমাকে উদ্ধার করছি। মৃত্যুভয়ে তুমি ভীত হইও না, হে দৈববিমুখ জন, তুমি মৃত্যুলাভ করবে না। অতএব ভয় কোরো না। এ শান্তিকর্মে কেউ কখনও প্রাণত্যাগ করে না, অথবা মরণকালীন দুঃসহ মূর্ছালাভ করে না। যজ্ঞে অগ্নির যেমন পরিধি নির্মাণ করা হয়, সেরূপ তোমার জীবনলাভের জন্য পরিধি নির্মাণ করা হচ্ছে। হে শান্তিকামী পুরুষ, আমার কৃত শান্তিকর্ম সমান বন্ধুদের থেকে ও অভিচারকৃত হিংসা থেকে তোমাকে রক্ষা করুক। তুমি

অমরণশীল, অমর ও দীর্ঘজীবী হও। চক্ষুরাদি ইন্দ্রয়রূপ অমুখ্যপ্রাণ যেন তোমার শরীর ত্যাগ না করে। যমের যে জ্বর, শিরোব্যথাদি একশো হিংসক হেতি আছে এবং নাশকারী হিংসিক আছে, সেই দ্বিবিধ মৃত্যু থেকে ইন্দ্রাদি দেবগণ তোমাকে মুক্ত করুক। বৈশ্বানর অগ্নির কাছ থেকে তোমাকে মুক্ত করুক। হে বৃক্ষ, তুমি অগ্নির পারপ্রাপক শরীররূপ। তুমি রাক্ষসহন্তা, শত্রুনাশক ও রোগনিবারক পূতদ্রু নামক ঔষধ, তুমি আমাদের অভীষ্ট সাধন করো।

গ· উপনিষদ

(উপনিষদগুলো দীর্ঘকাল ধরে রচিত হয়েছে, কিন্তু তার অধিকাংশই রচিত হয়েছে আনুমানিক আটশো অথবা সাতশো খ্রিস্টপূর্বাব্দে।)

১· ঈশোপনিষদ

ব্রহ্মাণ্ডে যা কিছু অনিত্য বস্তু আছে, সে সমস্তই পরমেশ্বরের দ্বারা আচ্ছন্ন। ত্যাগের দ্বারা ভোগ করো। কারও ধনে লোভ কোরো না।

যে ব্যক্তি এই জগতে শত বৎসর বেঁচে থাকতে ইচ্ছুক, তিনি কর্ম করেই বাঁচতে ইচ্ছা করবেন। এই রকম আয়ুষ্কামী তোমার পক্ষে এ ছাড়া অন্য কোনও উপায় নেই যাতে তোমাতে কর্ম লিপ্ত না হতে পারে।

অসুরদের আবাসভূত এই সমস্ত মানুষ দৃষ্টিপ্রতিরোধক অজ্ঞান-অন্ধকারে আচ্ছাদিত। যে সব মানুষ আত্মজ্ঞানহীন তারা সকলেই দেহত্যাগ করে সেই সব লোকে গমন করে।

(সেই আত্মতত্ত্ব) অচল, এক এবং মন থেকেও বেগবান। পূর্বগামী এঁকে ইন্দ্রিয়রা পায় না। ইনি স্থির থেকেও দ্রুতগামী, সকলকে অতিক্রম করে যান। ইনি আছেন বলেই সর্বকর্ম আপনাতে ধারণ করেন। সূত্রাত্মা।

ইনি চলেন, ইনি চলেন না ; ইনি দূরে, আবার ইনি নিকটে ; ইনি এই সমস্ত জগতের ভেতরে, আবার এই সমস্ত জগতের বাহিরে।

যিনি সমস্ত বস্তুকে আত্মাতে এবং সমস্ত বস্তুতেই আত্মাকে দেখেন তিনি সেই দর্শনের বলেই কাউকে ঘৃণা করেন না।

জ্ঞানীর যে আত্মায় সমুদয় বস্তু আত্মারূপে এক হয়ে গেল, একত্বদর্শীর আত্মা মোহই বা কী, শোকই বা কী?

তিনি সর্বব্যাপী, জ্যোতির্ময়, অশরীর, অক্ষত, শিরাহীন, নির্মল,

অপাপবিদ্ধ, সর্বদর্শী, মনের নিয়ন্তা, সর্বোত্তম ও স্বয়ম্ভূ। তিনি নিত্যকালস্থায়ী, সংবৎসরাখ্য প্রজাপতিদের জন্য যথানুরূপ কর্তব্য বিধান করেন।

যাঁরা কেবল কর্মের অনুষ্ঠান করেন, তাঁরা দৃষ্টিবিরোধী অন্ধকারে প্রবেশ করেন আর যাঁরা দেবতাজ্ঞানেই নিরত, তাঁরা গাঢ়তর অন্ধকারে প্রবেশ করেন।

যাঁরা আমাদের কাছে উক্ত উপাসনা ও কর্মের ব্যাখ্যা করেছেন, আমরা তাঁদের এই বাণী শুনেছি "দেবতাজ্ঞানের পৃথক ফলই উল্লিখিত হয়েছে এবং কর্মের পৃথক ফলই উল্লিখিত হয়েছে।"

যিনি দেবতাজ্ঞান ও কর্ম এই উভয়কে একত্র জানেন, তিনি কর্মের দ্বারা মৃত্যুকে অতিক্রম করে জ্ঞানের সহায়তায় অমরত্ব বা অমৃতত্ব লাভ করেন।

হিরণ্ময় পাত্রের দ্বারা সত্যের মুখ আবৃত আছে ; হে জগৎ পরিপোষক সূর্য, সত্যধর্মা আমার উপলব্ধির জন্য আপনি তা অপসারিত করুন।

হে পূষন, হে একাকি বিচরণকারী, হে নিয়ন্তা, হে প্রজাপতিতনয়, হে সূর্য, আপনি কিরণসমূহ সংবরণ করুন, তেজ সংহরণ করুন। আপনার যে কল্যাণতম রূপ তাই আমি দর্শন করব। যিনি আদিত্য মণ্ডলে অবস্থিত পুরুষ, যাঁর থেকে আমি অভিন্ন তাঁকে দর্শন করব আমি।

প্রাণবায়ু মহাবায়ুতে বিলীন হোক, এই শরীর ভস্মীভূত হোক, হে ওম্-শব্দ-প্রতীক মনোময় অগ্নি, আপনি আমার স্মরণীয় সমস্ত স্মরণ করুন। আর আমি যা কিছু করেছি তাও স্মরণ করুন। হে অগ্নি, স্মরণীয় সব স্মরণ করুন এবং কৃতকর্ম সব স্মরণ করুন।

হে অগ্নি, মহার্ঘ সম্পদ লাভের জন্য আপনি আমাদের সুপথে নিয়ে যান, হে দেব, সর্বপ্রাণীর কর্ম ও চিত্তবৃত্তি আপনার জানা আছে— আপনি আমাদের নিকট থেকে কুটিল পাপ বিদূরিত করুন ; আপনার উদ্দেশে বহু নমস্কারবচন উচ্চারণ করছি!

২· বৃহদারণ্যক উপনিষদ
(দ্বিতীয় অধ্যায়, চতুর্থ ব্রাহ্মণ)

যাজ্ঞবল্ক্য বললেন, "প্রিয়ে মৈত্রেয়ি, আমি এই (গার্হস্থ্য) আশ্রম থেকে উচ্চতর (সন্ন্যাস) আশ্রমে যেতে উদ্যত হয়েছি ; তোমার সম্মতি চাই।

তোমার সম্মতি থাকলে এই কাত্যায়নীর সঙ্গে তোমার সম্বন্ধের অবসান করতে চাই।"

মৈত্রেয়ী বললেন, "হে ভগবন্, যদিই বা ধনপরিপূর্ণা এই সমগ্র বসুন্ধরা আমার হয়, আমি কি তার দ্বারা অমর হতে পারব?" যাজ্ঞবল্ক্য বললেন, "না। সম্পদশালী ব্যক্তিদের জীবন যেমন (ভোগপরায়ণ), তোমার জীবন ঠিক তেমনি হবে। কিন্তু বিত্তের দ্বারা অমরত্ব লাভের আশা নেই।"

মৈত্রেয়ী বললেন, "যার দ্বারা আমি অমৃতত্ব লাভ করব না, তার দ্বারা আমি কী করব? আপনি (অমরত্বের সাধন বলে) যা জানেন, কেবল তাই আমাকে বলুন।"

যাজ্ঞবল্ক্য বললেন, "হে প্রিয়ে, তুমিতো আমার আদরণীয়াই ছিলে ; এখনও চিত্তানুকূল কথাই বলছ। কিন্তু আমি যখন ব্যাখ্যা করতে থাকব, তখন তুমি এর অর্থ নিশ্চিতরূপে ধ্যান করতে যত্ন করো।"

তিনি বললেন, "হে প্রিয়ে, পতির জন্যই যে পতি প্রিয় হন তা নয় ; (পত্নীর) আপনার প্রয়োজনেই পতি প্রিয় হন। হে প্রিয়ে, পত্নীর জন্যই যে পত্নী প্রিয় হন তা নয় ; (পতির) আত্মপ্রয়োজনেই পত্নী প্রিয় হন। হে প্রিয়ে, পুত্রদের জন্যই যে পুত্রেরা প্রিয় হয় তা নয় ; (পিতা-মাতার) আত্মপ্রয়োজনেই পুত্রেরা প্রিয় হয়। হে প্রিয়ে, সম্পদের জন্যই যে সম্পদ প্রিয় হয় তা নয় ; (মানুষের) আত্মপ্রয়োজনেই সম্পদ প্রিয় হয়। হে প্রিয়ে, ব্রাহ্মণের জন্যই যে ব্রাহ্মণ (অপরের) প্রিয় হন তা নয় ; (অন্যের) আত্মপ্রয়োজনেই ব্রাহ্মণ প্রিয় হন। হে প্রিয়ে, ক্ষত্রিয়ের জন্যই যে ক্ষত্রিয় প্রিয় হন তা নয় ; (অন্যের) আত্মপ্রয়োজনেই ক্ষত্রিয় প্রিয় হন। লোকসমূহের জন্য যে লোকসমূহ প্রিয় হন তা নয় ; (জীবগণের) আত্মপ্রয়োজনেই লোকসমূহ প্রিয় হন। হে প্রিয়ে, দেবগণের জন্যই যে দেবগণ প্রিয় হন তা নয় ; (যাজ্ঞিকের) আত্মপ্রয়োজনেই দেবগণ প্রিয় হন। হে প্রিয়ে, ভূতবর্গের জন্যই যে ভূতবর্গ প্রিয় হয় তা নয় ; আত্মার জন্যই ভূতগণ প্রিয় হয়। হে প্রিয়ে, সর্ববস্তুর জন্যই যে সর্ববস্তু প্রিয় হয় তা নয় ; আত্মার জন্যই সর্ববস্তু প্রিয় হয়। হে প্রিয়ে মৈত্রেয়ি, আত্মাই দ্রষ্টব্য, শ্রোতব্য, মন্তব্য ও নিশ্চিতরূপে ধেয়। হে প্রিয়ে, শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসনের দ্বারা আত্মার দর্শন হলে তাদ্দ্বারাই এ সমস্ত বিদিত হয়।

যিনি ব্রাহ্মণজাতিকে আত্মা থেকে ভিন্ন বলে জানেন, ব্রাহ্মণজাতি তাঁকে প্রত্যাখ্যান করেন। যিনি ক্ষত্রিয়জাতিকে আত্মা থেকে ভিন্ন বলে জানেন,

ক্ষত্রিয় জাতি তাঁকে প্রত্যাখ্যান করেন। যিনি লোকসমূহকে আত্মা থেকে পৃথক বলে জানেন, লোকসমূহ তাঁকে প্রত্যাখ্যান করে। যিনি দেবগণকে আত্মা থেকে পৃথক বলে জানেন, দেবগণ তাঁকে প্রত্যাখ্যান করেন। যিনি ভূতবর্গকে আত্মা থেকে পৃথক বলে জানেন, ভূতবর্গ তাঁকে প্রত্যাখ্যান করে। যিনি নিখিল বস্তুকে আত্মা থেকে পৃথক বলে জানেন, নিখিল বস্তু তাঁকে প্রত্যাখ্যান করে। এই ব্রাহ্মণজাতি, এই ক্ষত্রিয়জাতি, এই লোকসমূহ, এই দেববৃন্দ, এই ভূতবর্গ এবং এই নিখিল বস্তু (তাই) যা এই আত্মা।

উক্ত বিষয়ে দৃষ্টান্ত এই— যেমন দুন্দুভি আহত হতে থাকলে তা থেকে নির্গত ধ্বনিবিশেষকে পৃথকভাবে গ্রহণ করতে পারা যায় না, কিন্তু দুন্দুভির শব্দসামান্য অথবা দুন্দুভিবাদ্য গৃহীত হলে ধ্বনিবিশেষও গৃহীত হয়, কিংবা যেমন শঙ্খ নিনাদিত হতে থাকলে তা থেকে নির্গত বিশেষ ধ্বনিগুলোকে পৃথকভাবে গ্রহণ করতে পারা যায় না, কিন্তু শঙ্খের শব্দসামান্য অথবা শঙ্খবাদন গৃহীত হলে (তার অন্তর্গত) বিশেষ ধ্বনিগুলোও গৃহীত হয় ; এবং যেমন বীণা ঝংকৃত হলে তা থেকে নির্গত বিশেষ সুরগুলোকে পৃথকভাবে গ্রহণ করতে পারা যায় না, কিন্তু বীণার সুরসামান্য অথবা বীণাঝংকার গৃহীত হলে বিশেষ সুরগুলোকেও গ্রহণ করা হয় (তেমনি প্রজ্ঞান ব্যতিরেকে স্বপ্ন ও জাগরণে কোনও বস্তুবিশেষ গৃহীত হয় না)।

উক্ত বিষয়ে দৃষ্টান্ত এই— যেমন আর্দ্র কাষ্ঠের দ্বারা প্রজ্বলিত অগ্নি থেকে নানাবিধ ধূম নির্গত হয়, তেমনি ঋগ্বেদ, যজুর্বেদ, সামবেদ, অথর্ববেদ, ইতিহাস, পুরাণ, বিদ্যা, রহস্যবিদ্যা, শ্লোকসকল, সূত্রসমূহ, অনুব্যাখ্যাসকল, ব্যাখ্যাসকল— এই সমস্তই এই পরমাত্মার নিশ্বাস (সদৃশ্য)।

সমুদ্র যেমন জলরাশির একমাত্র মিলনাধার, তেমনি ত্বক সমস্ত স্পর্শের একমাত্র গতি, নাসিকাদ্বয় সমস্ত গন্ধের একমাত্র গতি, জিহ্বা সমস্ত রসের একমাত্র গতি, চক্ষু সমস্ত রূপের একমাত্র গতি, কর্ণ সমস্ত শব্দের একমাত্র গতি, মন সমস্ত সংকল্পের একমাত্র গতি, হৃদয় বা বুদ্ধি সমস্ত বিদ্যার একমাত্র গতি, হস্তদ্বয় সমস্ত কর্মের একমাত্র গতি, পাদদ্বয় সমস্ত পথের (চলার) একমাত্র গতি এবং বাক্ সমস্ত বেদের একমাত্র গতি।

এ বিষয়ে দৃষ্টান্ত এই— লবণখণ্ড জলে প্রক্ষিপ্ত হলে যেমন জলেই বিলীন হয়, কেউই আর তাকে তুলে নিতে পারে না— তখন যে স্থান থেকেই জল

তোলা হোক না কেন কেবল লবণাস্বাদই পাওয়া যায়— ঠিক তেমনি, হে প্রিয়ে, অনন্ত অপার এই মহদ্ভূত কেবল বিজ্ঞানস্বরূপই বটেন। (আত্মার খণ্ডিত ভাবটি) এই ভূতবর্গরূপ কারণবশতঃ প্রকাশ লাভ করে ভূতবর্গের বিলয়ের সঙ্গে সঙ্গেই বিলীন হয়ে থাকে। দেহেন্দ্রিয় থেকে বিমুক্ত হলে আর সংজ্ঞা (বিশেষ জ্ঞান) থাকে না। হে প্রিয়ে,এই আমার বক্তব্য।"

মৈত্রেয়ী বললেন, "কার্যকারণ থেকে বিমুক্ত হলে আর সংজ্ঞা (অর্থাৎ জ্ঞান) থাকে না— এ কথা বলে আপনি আমাকে বিভ্রান্ত করলেন।"

যাজ্ঞবল্ক্য বললেন, "হে প্রিয়ে, আমি মোহজনক বাক্য বলছি না, এই মহদ্ভূত অবশ্যই বিজ্ঞান-সমর্থ।

"যখন ব্যষ্টিভাবের উদয় হয় তখন যেহেতু ব্রহ্মে দ্বৈতপ্রায় হয়ে থাকে, তখন একে অপরকে আঘ্রাণ করে, একে অপরকে দর্শন করে, একে অপরকে শ্রবণ করে, একে অপরকে বিষয় বলে, একে অপর বিষয় চিন্তা করে, একে অপর বিষয় জানে। কিন্তু যখন সমস্ত এঁর আত্মাই হয়ে গেল তখন কিসের দ্বারা কী আঘ্রাণ করবে, কিসের দ্বারা কী দেখবে, কিসের দ্বারা কী শুনবে, কিসের দ্বারা কী বলবে, কিসের দ্বারা কি চিন্তা করবে, কিসের দ্বারা কী জানবে? যাঁর সহায়ে লোকে এই সমস্তকে জানে, তাঁকে কিসের দ্বারা জানবে? হে প্রিয়ে, বিজ্ঞাতাকে কিসের দ্বারা জানবে?"

৩· বৃহদারণ্যক উপনিষদ
(৩য় অধ্যায়, ৮ম ব্রাহ্মণ)

অতঃপর বাচক্নবী বললেন, শ্রদ্ধেয় ব্রাহ্মণগণ, অনুমতি হলে আমি এঁকে দুটি প্রশ্ন করব। ইনি যদি আমার এই প্রশ্ন দুটির উত্তর দেন, তবে আপনাদের কেউ কখনও এঁকে ব্রহ্মবিচারে জয় করতে পারবেন না। (ব্রাহ্মণেরা)—"গার্গি, প্রশ্ন করুন।"

গার্গী বললেন, "যাজ্ঞবল্ক্য, আমি আপনাকে প্রশ্ন করছি। কাশীদেশীয় কোন বীরসন্তান বা বিদেহরাজ যেমন জ্যাবিমুক্ত ধনুতে জ্যা আরোপণ করে শত্রুদের পীড়াদায়ক ও বংশখণ্ডযুক্ত শরদ্বয় হস্তে গ্রহণ করে সন্নিকটে উপস্থিত হন, ঠিক তেমনি আমি দুটি প্রশ্ন নিয়ে আপনার (প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে) সমীপে উত্থিত হলাম। ঐ দুটির উত্তর আমাকে বলুন)"

গার্গী বললেন, "যাজ্ঞবল্ক্য, যা দ্যুলোকের ঊর্ধ্বে, যা পৃথিবীর নিম্নে, যা ব্রহ্মাণ্ডকপালদ্বয়ের মধ্যে এই উভয় লোকরূপে বিদ্যমান, যা হয়েছে, যা বর্তমান ও যা হবে— এই সব যা কিছু পণ্ডিতেরা বলে থাকেন— তা কার মধ্যে ওতপ্রোত?"

যাজ্ঞবল্ক্য বললেন, "গার্গি, যা দ্যুলোকের ঊর্ধ্বে, যা পৃথিবীর নিম্নে, যা ব্রহ্মাণ্ডকপালদ্বয়ের মধ্যে এই উভয় লোকরূপে বিদ্যমান, যা হয়েছে, যা বর্তমান ও যা হবে— এই সব যা কিছু পণ্ডিতেরা বলে থাকেন— তা আকাশে ওতপ্রোত রয়েছে।"

গার্গী বললেন, "যাজ্ঞবল্ক্য, আপনি আমার একটি প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন। তাই আপনাকে নমস্কার। অপর প্রশ্নের জন্য প্রস্তুত হোন।"

"গার্গি, প্রশ্ন করুন।" (গার্গী) "আকাশ আবার কার মধ্যে ওতপ্রোত?"

যাজ্ঞবল্ক্য বললেন, "গার্গি, ব্রহ্মজ্ঞেরা এঁকেই সেই অক্ষর বলে থাকেন। ইনি অস্থূল, অনণু, অহ্রস্ব, অদীর্ঘ, অলোহিত, অস্নেহ, অচ্ছায়, অতমঃ, অবায়ু, অনাকাশ, অসঙ্গ, অরস, অগন্ধ, অচক্ষুষ্ক, অশ্রোত্র, অবাক্, অমনঃ, অতেজস্ক, অপ্রাণ, অমুখ, অমাত্র, অনন্তর ও অবাহ্য। তিনি কাউকে ভক্ষণ করেন না এবং অপর কেউ তাঁকে ভক্ষণ করে না।

"গার্গি, এই অক্ষরেরই প্রশাসনে সূর্য ও চন্দ্র বিধৃত হয়ে অবস্থিত আছেন। গার্গি, এই অক্ষরেরই প্রশাসনে দ্যুলোক ও ভূলোক বিধৃত হয়ে অবস্থিত আছে। গার্গি, এই অক্ষরেরই প্রশাসনে নিমেষ, মুহূর্ত, দিবারাত্র, পক্ষ, মাস, ঋতু ও সংবৎসর—এই (কালাবয়ব)গুলো বিধৃত হয়ে অবস্থান করছে। গার্গি, এই অক্ষরেরই প্রশাসনে শ্বেত পর্বতরাজি থেকে নির্গত হয়ে পূর্ববাহিনী, পশ্চিমবাহিনী ও অপরাপর নদীগুলো নিজ নিজ (নির্দিষ্ট) দিকে প্রবাহিত হচ্ছে। গার্গি, এই অক্ষরেরই প্রশাসনে (জ্ঞানী) মানবেরা দানকারীদের প্রশংসা করেন, দেবগণ যজমানের অনুগত হন এবং পিতৃগণ দর্বীহোমের উপর নির্ভর করেন।

"গার্গি, কেউ যদি এই অক্ষরকে না জেনে বহু সহস্র বৎসরও হোম, যজ্ঞ করে, বা তপানুষ্ঠান করে, তথাপি বিনাশই হয়ে থাকে। যে অক্ষরকে না জেনে ইহলোক ত্যাগ করে সে দুঃখী। যিনি অক্ষরকে জেনে ইহলোক ত্যাগ করেন, তিনি ব্রাহ্মণ।"

“গার্গি, এই অক্ষরই অদৃষ্ট হলেও দ্রষ্টা, অশ্রুত হলেও শ্রোতা, মননের অবিষয় হলেও মন্তা, অবিজ্ঞাত হলেও বিজ্ঞাতা। গার্গি, এই অক্ষরেই আকাশ ওতপ্রোত হয়ে আছে।”

গার্গী বললেন, “শ্রদ্ধেয় ব্রাহ্মণগণ, এঁকে নমস্কার করেই যদি আপনারা এঁর কাছে অব্যাহতি পান, তবে তাই যথেষ্ট মনে করবেন। আপনাদের মধ্যে কেউই এঁকে ব্রহ্মবাদে পরাস্ত করতে পারবেন না।”

অতঃপর বাচক্নবী বিরত হলেন।

৪· ছান্দোগ্য উপনিষদ

৬ষ্ঠ অধ্যায়

প্রথম খণ্ড

পুরাকালে অরুণ-পৌত্র শ্বেতকেতু নামে এক ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর পিতা তাঁকে বললেন, “হে শ্বেতকেতু, তুমি ব্রহ্মচর্য অবলম্বনে গুরুগৃহে বাস করো। হে সৌম্য, আমাদের বংশে কেউই অধ্যয়ন না করে ব্রহ্মবন্ধুসদৃশ হয় না।

শ্বেতকেতু বারো বৎসর বয়সে গুরুগৃহে গিয়ে সমস্ত বেদ অধ্যয়ন করে গম্ভীরচিত্ত, বেদজ্ঞানাভিমানী ও অবিনীতস্বভাব হয়ে চব্বিশ বৎসর বয়সে ফিরে এলেন। পিতা আরুণি তাঁকে বললেন, “হে সৌম্য, তুমিতো দেখছি, গম্ভীরচিত্ত, বেদজ্ঞানাভিমানী ও অবিনীতস্বভাব হয়েছে ; সেই আদেশটি জিজ্ঞাসা করেছিলে কি, যাঁর জ্ঞানে অশ্রুত বিষয় শ্রুত হয়, অচিন্তিত বিষয় সুচিন্তিত হয় ও অনিশ্চিত বিষয় সুনিশ্চিত হয়?”

শ্বেতকেতু প্রশ্ন করলেন, “সে আদেশ আবার কেমন?”

“হে সৌম্য, যেমন একটি মৃত্তিকাপিণ্ডের দ্বারা মৃত্তিকার পরিণামভূত সমস্তই জানা যেতে পারে ; কারণ সমস্ত বিকারই বাক্-অবলম্বনে অবস্থিত নামমাত্র, কেবল মৃত্তিকাই সত্য ; যেমন একটি সুবর্ণপিণ্ডের দ্বারা সুবর্ণের পরিণামভূত সমস্তই জানা যেতে পারে, যেমন একটি লৌহপিণ্ডের দ্বারা লৌহের পরিণামভূত সমস্তই জানা যেতে পারে। — হে সৌম্য, এই রূপেই উক্ত উপদেশ হয়ে থাকে।

(শ্বেতকেতু) "পূজ্যপাদ গুরুগণ এ বিষয়টি অবশ্যই জানতেন না। কেন না, জানলে আমাকে না বলতেন কেন? যাই হোক, আপনি আমাকে বলুন।"

পিতা বললেন, "হে সৌম্য, তথাস্তু।"

দ্বিতীয় খণ্ড

"হে সৌম্য, সৃষ্টির পূর্বে এই জগৎ এক অদ্বিতীয় সদ্রূপে (বিদ্যমান) ছিল। এ বিষয়ে কেউ কেউ বলেন, "এই জগৎ পূর্বে এক অদ্বিতীয় অসৎস্বরূপ ছিল, সেই অসৎ থেকে সৎ জাত হল।"

(আরুণি) বললেন, "পরন্তু এ কিভাবে সম্ভব? অসৎ থেকে কিভাবে সৎ জাত হতে পারে? হে সৌম্য, প্রকৃতপক্ষে সৃষ্টির পূর্বে একমাত্র অদ্বিতীয় সৎই ছিলেন।"

"ওই সৎ ঈক্ষণ করলেন, 'আমি বহু হব, প্রকৃষ্ঠরূপে জাত হব।' তিনি তেজ সৃষ্টি করলেন। সেই তেজ ঈক্ষণ করলেন, 'আমি বহু হব, প্রকৃষ্টরূপে জাত হব।' উক্ত তেজ জল সৃষ্টি করলেন। এই হেতু যখনই মানুষ সন্তাপগ্রস্ত হয় বা ঘর্মাক্ত হয়, তখনই তেজ থেকে জল উৎপন্ন হয়।"

"উক্ত জল ঈক্ষণ করলেন, 'বহু হব, প্রকৃষ্টরূপে জাত হব।' ঐ জলরূপী সৎ অন্ন অর্থাৎ পৃথিবী সৃজন করলেন। এই হেতু যেখানেই বর্ষণ হয়, সেখানেই অন্ন জাত হয়, সেখানে জল থেকেই ভক্ষ্য অন্ন উৎপন্ন হয়।"

তৃতীয় খণ্ড

"পূর্বোক্ত এই ভূতবর্গের মাত্র তিনটি কারণ আছে— অণ্ডজ, জীবজ, উদ্ভিজ্জ।

"পূর্বোক্ত এই (সৎস্বরূপ) দেবতা ঈক্ষণ করলেন, 'অধুনা আমি এই প্রাণধারক আত্মারূপে এই তিন দেবতার মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হয়ে নাম ও রূপ অভিব্যক্ত করি।"

"উক্ত তিন দেবতার প্রত্যেককে ত্রিবৃৎ করব," এই চিন্তা করে উক্ত দেবতা এই তিনটি দেবতার মধ্যে প্রাণবিধারক আত্মারূপে অনুপ্রবিষ্ট হয়ে নাম ও রূপ ব্যক্ত করলেন।

"তাঁদের প্রত্যেককে ত্রিবৃৎ করলেন। পরন্তু হে সৌম্য, এই তিনটি দেবতা যেভাবে প্রত্যেকে (শরীর সমূহের বাইরে) ত্রিবৃৎ হন, তা আমার সকাশে অবগত হও।"

চতুর্থ খণ্ড

"(ত্রিবৃৎকৃত স্থূল) অগ্নিতে যে রক্তবর্ণ দেখা যায় তাই অগ্নির রূপ। (স্থূল অগ্নিতে) যে শুক্লবর্ণ তাই জলের রূপ ; (স্থূল অগ্নিতে) যে কৃষ্ণবর্ণ তাই পৃথিবীর রূপ ; এইভাবে অগ্নি থেকে তোমার অগ্নিত্ববুদ্ধি অপগত হল ; কারণ সমস্ত বিকারই বাগবলম্বনে অবস্থিত নামমাত্র, কেবল তিনটি রূপই সত্য।

"আদিত্যে যে রক্তবর্ণ দেখা যায় তাই তেজের রূপ ; যে শুক্লবর্ণ দেখা যায় তা জলের রূপ ; যে কৃষ্ণবর্ণ তা পৃথিবীর রূপ ; এইভাবে আদিত্য থেকে তোমার আদিত্যত্ববুদ্ধি অপগত হল ; কারণ সমস্ত বিকারই বাগবলম্বনে অবস্থিত নামমাত্র, কেবল তিনটি রূপই সত্য।

"চন্দ্রে যে রক্তবর্ণ দেখা যায়, তা তেজের রূপ ; চন্দ্রে যে শুভ্রবর্ণ তা জলের ; যে কৃষ্ণবর্ণ তা পৃথিবীর ; এইভাবে চন্দ্র থেকে চন্দ্রত্ববুদ্ধি অপসৃত হল ; কারণ সমস্ত বিকারই বাগবলম্বনে অবস্থিত নামমাত্র, কেবল তিনটি রূপই সত্য।

"বিদ্যুতে যে রক্তবর্ণ তা তেজের রূপ, যে শুভ্রবর্ণ তা জলের যা কৃষ্ণবর্ণ তা পৃথিবীর— এইভাবে বিদ্যুৎ থেকে তোমার বিদ্যুত্ববুদ্ধি অপসৃত হল ; কারণ সমস্ত বিকারই বাগবলম্বনে অবস্থিত নামমাত্র, কেবল তিনটি রূপই সত্য।

এ কথা জেনেই প্রাচীন মহাগৃহস্থ ও মহাশ্রোত্রীয়েরা বলেছেন, "সম্প্রতি আমাদের বংশীয়ের কাছে কেউই এমন কিছু বলতে পারেন না, যা অশ্রুত, অচিন্তিত বা অবিদিত।" কারণ এগুলো থেকেই তাঁরা অবগত হয়েছেন।

"যে কোনোটি দুর্জ্ঞেয়স্বরূপ বলে অনুভূত হয়েছিল, তাকে তাঁরা এই দেবতাদেরই মিশ্রণ বলে জেনেছিলেন। হে সৌম্য, যেমনভাবে এই তিনটি দেবতা পুরুষের দ্বারা ভুক্ত হয়ে প্রত্যেকে ত্রিবৃৎ হন, তা আমার কাছে অবগত হও।"

"অন্ন ভক্ষিত হয়ে ত্রিবিধ আকারে পরিণত হয়। স্থুলতম অংশ মলে, মধ্যমাংশ মাংসে ও সূক্ষ্মতম অংশ মনে পরিণত হয়।

"জল পীত হয়ে ত্রিবিধাকারে পরিণত হয়। তার স্থুলতম অংশ মূত্রে, মধ্যমাংশ রক্তে, সূক্ষ্মতম অংশ প্রাণে পরিণত হয়।

[প্রাণ জলের পূর্বে সৃষ্ট বলে জলের বিকার নয়; তবে শরীরে অবস্থিতির জন্য তা জলের উপর নির্ভর করে।]

"তেজ (ঘৃতাতি) ভক্ষিত হয়ে ত্রিবিধ রূপান্তর প্রাপ্ত হয়; তার স্থুলতম অংশ অস্থিতে, মধ্যমাংশ মজ্জায় ও সূক্ষ্মতম অংশ বাকে পরিণত হয়।

"অতএব হে সৌম্য, মন অন্নময়, প্রাণ জলময় এবং বাক্ তেজোময়!"

ষষ্ঠ খণ্ড

"হে সৌম্য, দধি যখন মথিত হয় তখন তার যেটি সূক্ষ্মাংশ তা উপরে উঠে আসে, তা ঘৃতে পরিণত হয়।

"ঠিক এইভাবেই ভক্ষ্যমাণ অন্নের যেটি সূক্ষ্মাংশ, তা উপরে উঠে মনে পরিণত হয় (অর্থাৎ মনকে পুষ্ট করে)।

"হে সৌম্য, পীয়মান জলের একটি সূক্ষ্মাংশ, তা উপরে ওঠে এবং তা হয় প্রাণ। হে সৌম্য, ভুজ্যমান তেজের যেটি সূক্ষ্মাংশ, তা উপরে ওঠে এবং তা হয় বাক্। অতএব হে সৌম্য, মন অন্নময়, প্রাণ জলময়, বাক্ তেজোময়।"

"আপনি পুনশ্চ আমাকে বুঝিয়ে দিন।"

"হে সৌম্য, তাই হোক।"

সপ্তম খণ্ড

"হে সৌম্য, পুরুষের ষোড়শ কলা আছে। পঞ্চদশ দিন আহার কোরো না, তবে যথেচ্ছ জল পান কোরো। কারণ প্রাণ জলময়। যে জলপান করে তার প্রাণবিয়োগ হয় না।

পিতা বললেন, "হে সৌম্য, ঋক, যজুঃ ও সাম উচ্চারণ করো।"

শ্বেতকেতু বললেন, "ঐগুলোতো আমার মনে প্রতিভাত হচ্ছে না।"

পিতা বললেন, "হে সৌম্য, সুপ্রজ্বলিত বিশাল অগ্নির একটি অঙ্গার অবশিষ্ট থাকলে যেমন হয়— তার দ্বারা ততোধিক কিছুই দগ্ধ হয় না— হে সৌম্য, তোমারও তেমনি ষোড়শ কলার মধ্যে একটি কলা অবশিষ্ট আছে ; সম্প্রতি তৎসহায়ে বেদসমূহ অনুভব করতে পারছ না। তুমি আহার করো, পরে আমার কথা বুঝতে পারবে।"

তিনি আহার করলেন। তারপর পিতার সকাশে গমন করলেন। পিতা তাঁকে যা কিছু জিজ্ঞাসা করলেন, তিনি সে সব বিষয়েই তাঁর ব্যুৎপত্তি দেখালেন।

পিতা বললেন, "হে সৌম্য, সুপ্রজ্বলিত সেই বিশাল অগ্নির উক্ত অবশিষ্ট খদ্যোতপরিমিত অঙ্গারটিকে যদি তৃণসংযোগে বাড়ানো হয় তবে তার দ্বারা যেমন ততোধিক বস্তুও দগ্ধ হয়, তেমনি হে সৌম্য, তোমার ষোড়শ কলার একটিমাত্র কলা অবশিষ্ট ছিল। সেই কলাটি অন্নসংযোগে প্রজ্বলিত হয়েছে ; তার দ্বারা এখন বেদসমূহ অনুভব করছ। অতএব হে সৌম্য, মন অন্নময়, প্রাণ জলময় এবং বাক্ তেজোময়।"

পিতার বাক্য থেকে শ্বেতকেতু এ কথা অবগত হলেন।

অষ্টম খণ্ড

উদ্দালক আরুণি একদা পুত্র শ্বেতকেতু বললেন, "সৌম্য, আমার নিকটে স্বপ্নের মর্ম অবগত হও।" যখন বলা হয় যে, কেউ সুষুপ্ত হয়েছেন, তখন হে সৌম্য, তিনি সতের সঙ্গে একীভূত হন এবং নিজ স্বরূপে গমন করেন। সেইজন্য লোকে এঁকে 'সুষুপ্ত' (স্বপিতি) এই শব্দে নির্দেশ করে, কেন না তখন তিনি স্ব-স্বরূপকে প্রাপ্ত হন।

"উক্ত বিষয়ে দৃষ্টান্ত এই— যেমন সূত্রে আবদ্ধ কোনও পক্ষী ইতস্তত উড়ে অন্য কোথাও আশ্রয় না পেয়ে অবশেষে বন্ধনস্থানকেই আশ্রয় করে, ঠিক তেমনি, হে সৌম্য, উক্ত জীব (স্বপ্ন ও জাগরণে) ইতস্তত বিচরণ করে অন্য কোথাও আশ্রয় না পেয়ে আত্মাকেই আশ্রয় করে ; কারণ হে সৌম্য, জীব পরমাত্মাতেই আশ্রিত।

"হে সৌম্য, আমার নিকট ক্ষুধা ও পিপাসার তথ্য অবগত হও। কারও সম্বন্ধে যখন বলা হয় যে ইনি ক্ষুধার্ত হয়েছেন, তখন এটাই বুঝতে হবে যে জলই উক্ত অন্নকে পরিপাক করে। এ বিষয়ে দৃষ্টান্ত এই-- যেমন গোপালক, অশ্বপালক, লোকনায়ক ইত্যাদি শব্দ আছে তেমনি সে সময়ে লোকে জলকে 'অশনায়া' বলে। তাই হে সৌম্য, এই দেহরূপ অঙ্কুরটিকে কারণান্তর থেকে উদ্‌গত বলে জানবে। কেন না এ নিষ্কারণ হতে পারে না।"

শ্বেতকেতু প্রশ্ন করলেন, "এই দেহের কারণ কোথায়?"

পিতা বললেন, "অন্ন ভিন্ন কোথায় আবার এই দেহের কারণ থাকতে পারে? হে সৌম্য, ঠিক এইভাবেই অন্নরূপ অঙ্কুর-অবলম্বনে জলরূপ মূলকে অবগত হও ; হে সৌম্য, জলরূপ অঙ্কুর অবলম্বনে তেজোরূপ মূলকে অবগত হও, হে সৌম্য, তেজোরূপ অঙ্কুর অবলম্বনে সদ্‌রূপ মূলকে অবগত হও। হে সৌম্য, চরাচর এই সমস্তই সৎ থেকে উৎপন্ন, সতে আশ্রিত ও সতে বিলীন হয়। হে সৌম্য, যেরূপে কিন্তু এই তিনটি দেবতা পুরুষের দ্বারা ভক্ষিত হয়ে প্রত্যেকে ত্রিবৃৎ হন, তা পূর্বে বলা হয়েছে। হে সৌম্য, এই পুরুষ যখন মুমূর্ষু হয়, তখন তার বাক্ মনে, মন প্রাণে, প্রাণ তেজে এবং তেজ পরম দেবতায় উপসংহৃত হয়।

"সেই যে সূক্ষ্ম কারণ তাঁর দ্বারাই এই সমস্ত জগৎ আত্মবান্। তিনিই পরমার্থ সত্য, তিনি আত্মা। হে শ্বেতকেতু, তুমি সেই সৎ।"

শ্বেতকেতু বললেন, "ভগবন্, আপনি আমাকে পুনর্বার বুঝিয়ে দিন।" পিতা বললেন, "হে সৌম্য, তাই হোক।"

নবম খণ্ড

"হে সৌম্য, মধুকরগণ যখন মধু প্রস্তুত করে, অর্থাৎ নানাবিধ ফলপ্রসূ বৃক্ষরাজির রসসমূহকে একত্র সংগ্রহ করে উক্ত রসকে একভাবাপন্ন করে, তখন যেমন সেই মধুমধ্যস্থ রসগুলো 'আমি অমুক গাছের রস, আমি অমুক গাছের রস' এভাবে নিজের পৃথক পরিচয় পায় না, ঠিক তেমনি হে সৌম্য, এই জীবগণ সৎ-স্বরূপকে পেয়েও 'আমি সৎস্বরূপ পেয়েছি' এ কথা জানতে পারে না।

"ঐ জীবেরা নিদ্রাদির পূর্বে ব্যাঘ্র, সিংহ, বৃক, বরাহ, কীট, পতঙ্গ, দংশ বা মশক— যা যা ছিল (নিদ্রাদির পরে) ফিরে এসেও তাই হয়ে থাকে।

এই সমস্তের মধ্যে সার হল সৎ। শ্বেতকেতু, তুমিও তাই।"

"অনুগ্রহ করে আমাকে আরও বলুন।"

"তথাস্তু", পিতা বললেন।

দশম খণ্ড

"হে সৌম্য, এই পূর্ববাহিনী নদীগুলো পূর্বদিকে প্রবাহিত হয় এবং পশ্চিমবাহিনী নদীগুলো পশ্চিমদিকে প্রবাহিত হয়। তারা সমুদ্র থেকে উত্থিত হয়ে সুমদ্রেই লীন হয় এবং সমুদ্রস্বরূপই হয়ে যায়। সমুদ্রমধ্যস্থ নদীগুলো যেমন 'আমি অমুক নদী' এভাবে নিজের পরিচয় পায় না, ঠিক তেমনি, হে সৌম্য, এই জীবেরা সৎ হতে এসেও জানতে পারে না, 'আমি সৎ হতে এসেছি।' ঐ জীবেরা পূর্বে ব্যাঘ্র, সিংহ, বৃক, বরাহ, কীট, পতঙ্গ, দংশ বা মশক— যা যা ছিল, ফিরে এসেও তাই হয়ে থাকে।

"যা কিছু রয়েছে তার সার বস্তু হল আত্মা। সেই হল সৎ। হে শ্বেতকেতু, তুমিও তাই।"

"আমাকে আরও অবগত করান অনুগ্রহ করে।"

পিতা বললেন, "বৎস, তথাস্তু।"

একাদশ খণ্ড

"হে সৌম্য, সম্মুখের এই বিশাল বৃক্ষের মূলে কেউ আঘাত করলে বৃক্ষটি বেঁচে থেকেই রস ক্ষরণ করে, মধ্যে কেউ আঘাত করলে বেঁচে থেকেই রস ক্ষরণ করে, অগ্রভাগে কেউ আঘাত করলে বৃক্ষটি বেঁচে থেকেই রস ক্ষরণ করে ; ঐ বৃক্ষটি জীবাত্মার দ্বারা অনুস্যূত বলেই অবিরাম রস সংগ্রহ করে সানন্দে বিদ্যমান থাকে।

"জীব এই বৃক্ষের একটি শাখাকে ত্যাগ করলে তা শুকিয়ে যায় ; দ্বিতীয় একটিকে ত্যাগ করলে তাও শুকিয়ে যায় ; তৃতীয়টিকে ত্যাগ করলে তাও শুকিয়ে যায় ; সমগ্র বৃক্ষকে ত্যাগ করলে সমগ্রই শুকিয়ে যায়।"

পিতা বললেন, "হে সৌম্য, ঠিক এই ভাবেই জেনো— জীববিযুক্ত হয়েও এই শরীর মরে, জীব মরে না।"

দ্বাদশ খণ্ড

"এই (সুবিশাল) বটবৃক্ষ থেকে একটি বটফল আহরণ করো।"

(শ্বেতকেতু)— "এই যে ভগবন্।"

(পিতা)—"ভাঙো।"

(শ্বেতকেতু)—"ভগবন্, ভাঙা হয়েছে।"

(পিতা)—"এতে কী দেখছ?"

(শ্বেতকেতু)—"ভগবন্, অণুর মতো বীজ।"

(পিতা)—"এদের একটি ভাঙো।"

(শ্বেতকেতু)—"ভগবন্, ভাঙা হয়েছে।"

(পিতা)—"এতে কী দেখছ?"

(শ্বেতকেতু)—"কিছুই না ভগবন্।"

(পিতা)—"বীজের এই যে সূক্ষ্ম অংশটি দেখছ না, এই সূক্ষ্মাংশ থেকে উৎপন্ন হয়ে এই মহাবটবৃক্ষটি এই ভাবে রয়েছে। হে সৌম্য, শ্রদ্ধা অবলম্বন করো।"

শ্বেতকেতু বললেন—"মহাশয়, আমাকে আরও অবগত করান।"

পিতা বললেন, "তথাস্তু, হে পুত্র।"

ত্রয়োদশ খণ্ড

(পিতা)—"এই লবণ জলে ফেলে প্রাতঃকালে আমার সমীপে এসো।"

শ্বেতকেতু তাই করলেন। পিতা তাঁকে বললেন, "বৎস, রাত্রে যে লবণ জলে ফেলেছিলে, তা নিয়ে এসো।" অনুসন্ধান করেও পুত্র তা পেলেন না যদিও তা জলেই ছিল। পিতা বললেন, "বৎস, এই জলের উপরিভাগ থেকে আচমন করো ; কেমন বোধ করছ?"

(পুত্র)—"লবণাক্ত।"

"মধ্যভাগ থেকে আচমন করো ; কেমন বোধ করছ?"

"লবণাক্ত।"

"অধোভাগ থেকে আচমন করো ; কেমন বোধ হচ্ছে?"

"লবণাক্ত।"

"এই জল ফেলে দিয়ে আমার কাছে এসে বসো।"

শ্বেতকেতু তাই করলেন। "ওই লবণ সব সময়েই ছিল" (এ কথা বলতে বলতে ফিরলেন।) পিতা বললেন, "এই জলের মধ্যে থাকলেও যেমন তুমি তাকে দেখতে পাওনি তেমনি, হে সৌম্য, এই দেহমধ্যেই সৎ (ব্রহ্ম) বিদ্যমান আছেন।"

পুত্র বললেন, "আমাকে আরও জানান।"

পিতা বললেন, "বৎস, তথাস্তু।"

চতুর্দশ খণ্ড

"হে সৌম্য, কারও চোখ বেঁধে দিয়ে তাকে গান্ধার দেশ থেকে এনে আরও নির্জন জায়গায় ছেড়ে দিলে সে যেমন (দিগ্‌ভ্রান্ত হয়ে) কখনও পূর্বমুখে, কখনও উত্তরমুখে, কখনও দক্ষিণমুখে, কখনওবা পশ্চিমমুখে এই বলে চিৎকার করতে থাকে, "আমাকে চোখ বন্ধ অবস্থায় এখানে এনেছে এবং চোখ বন্ধ অবস্থায়ই ফেলে গেছে।"

"তখন তার বন্ধনমোচন করে কেউ যদি বলে, "এই দিকে গান্ধারদেশ, এই দিকে যাও' তবে (তখন) সেই উপদেশ-প্রাপ্ত মেধাবী ব্যক্তি যেমন গ্রাম হতে গ্রামান্তরের কথা জিজ্ঞাসা করে গান্ধার দেশেই উপস্থিত হয়, ঠিক তেমনি এই সংসারে প্রবিষ্ট ব্যক্তি গুরুর দ্বারা উপদিষ্ট হয়ে (ব্রহ্ম)জ্ঞান লাভ করেন। যতক্ষণ তিনি দেহমুক্ত না হন, ততক্ষণই তাঁর (ব্রহ্মলীন হওয়ার) বিলম্ব হয় ; তারপর অবিলম্বে তিনি ব্রহ্মত্ব প্রাপ্ত হন।"

"সেই সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম সারাৎসারের মধ্যেই সবকিছুর অস্তিত্ব। সেই বস্তু হল সৎ, সেই বস্তু আত্মা। হে শ্বেতকেতু, তুমিও তাই।"

পুত্র বললেন, "দেব, আমাকে আরও জানান।"

পিতা বললেন, "পুত্র, তথাস্তু।"

"হে সৌম্য, মানুষ যখন রোগক্লিষ্ট হয় তখন জ্ঞাতিগণ এই বলতে বলতে তাঁকে ঘিরে বসে, 'আমাকে চিনছ কি?' যতক্ষণ তার বাক্, মনে, মন প্রাণে, প্রাণ তেজে এবং তেজ পরম দেবতায় উপসংহৃত না হয়, ততক্ষণই সে চিনতে পারে।

"তারপর যখন তার বাক্ মনে, মন প্রাণে, প্রাণ তেজে এবং তেজ পরম দেবতায় উপসংহৃত হয়, তখন সে চিনতে পারে না।

"ওই সারাৎসারই সৎ, আত্মা। হে শ্বেতকেতু, তুমিও তাই।"

শ্বেতকেতু বললেন, "হে দেব আরও বলুন।"

"তথাস্তু" পিতা উত্তর দিলেন।

ষোড়শ খণ্ড

"হে সৌম্য, 'এই ব্যক্তি পরস্ব গ্রহণ করেছেন, এর পরীক্ষার জন্য কুঠার তপ্ত করো'—এই রকম বলতে বলতে (রাজপুরুষেরা) যখন কোনও বদ্ধ-হস্ত ব্যক্তিকে নিয়ে আসে, তখন সে যদি ঐ কাজ করে থাকে, তবে সে ঐ কারণেই (অর্থাৎ ঐ চৌর্যবশতই) আপনার স্বরূপটি অস্বীকার করে। সেই মিথ্যা অভিসন্ধিযুক্ত ব্যক্তি আপনার স্বরূপটি অস্বীকার করে। সেই মিথ্যা অভিসন্ধিযুক্ত ব্যক্তি আপনার স্বরূপকে মিথ্যার দ্বারা আবৃত করে তপ্ত কুঠার গ্রহণ করে ; সে তার দ্বারা দগ্ধ হয় এবং পরিশেষে নিহত হয়।

"আর যদি সে ঐ কাজের কর্তা না হয়, তবে ঐ কারণেই আপনার প্রকৃত স্বরূপ স্বীকার করে। সেই সত্যাভিসন্ধ ব্যক্তি সত্যের দ্বারা নিজেকে আচ্ছাদিত করে উত্তপ্ত পরশু গ্রহণ করে। সে দগ্ধ হয় না এবং তারপর সে বন্ধন থেকে মুক্ত হয়।

ঐ স্থলে যেমন (সত্যসন্ধ) দগ্ধ হয় না, (তেমনি সত্যসন্ধ ব্যক্তির পুনর্জন্ম হয় না।) এই সদাখ্য বস্তুর দ্বারাই এই সমস্ত আত্মবান ; তিনিই সত্য, তিনিই আত্মা। হে শ্বেতকেতু, তুমিই সেই।"

পিতার নিকট শ্বেতকেতু সেই সৎস্বরূপকে উপলব্ধি করলেন।

৫· মুণ্ডক উপনিষদ

(৩য় মুণ্ডক)

প্রথম খণ্ড

সদা সম্মিলিত ও সমান নামধারী দুটি পক্ষী একই বৃক্ষকে আশ্রয় করে আছে। তাদের মধ্যে একটি স্বাদু ফল ভক্ষণ করে, অপরটি ভক্ষণ না করে দর্শন করে।

জীব সেই একই বৃক্ষে আসক্ত হয়ে দীনভাব প্রাপ্ত হয় এবং তার জন্য দুশ্চিন্তা সহকারে সন্তাপ করে থাকে। যখন সে বহুজনসেবিত ও দেহবিলক্ষণ ঈশ্বরকে এবং তাঁর এইরূপ মহিমাকে (আপনা হতে অভিন্নরূপে) দর্শন করে, তখন বীতশোক হয়।

সাক্ষাৎকামী সাধক যখন হিরণ্যবর্ণ, জগৎকর্তা, পরমেশ্বর, পরিপূর্ণস্বরূপ ও জগৎকারণ ব্রহ্মাকে দর্শন করেন, তখন সেই বিদ্বান পুণ্য ও পাপ সমূলে নাশ করে বিগতক্লেশ হন এবং পরম সাম্য প্রাপ্ত হন।

যিনি প্রাণের প্রাণ পরমেশ্বর, তিনি সর্বভূতরূপে বহুভাবে প্রকাশিত হয়। এঁকে যে বিদ্বান জানেন, তিনি অতিবাদী হন না। তিনি আত্মক্রীড়, আত্মরতি ও ক্রিয়াবান— ইনিই ব্রহ্মবিদ্‌গণের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম।

যাঁকে নির্মলস্বভাব যতিবৃদ্ধ উপলব্ধি করেন, সেই জ্যোতির্ময় শুদ্ধ আত্মাকে অবিচল সত্য, অবিরাম একাগ্রতা, নিত্য সম্যক আত্মদর্শন ও অটুট ব্রহ্মচর্যের দ্বারাই হৃদয়াকাশে উপলব্ধি করতে হয়।

সত্যেরই জয় হয়, মিথ্যার নয় ; সত্যরূপ সাধনের দ্বারা লভ্য সেই সর্বোত্তম পুরুষার্থ যেখানে নিহিত আছে, সেখানে আপ্তকাম ঋষিরা যে পথে গমন করেন, সেই দেবযান মার্গও সত্যের দ্বারা অবিচ্ছিন্নভাবে আস্তীর্ণ।

বৃহৎ এবং দিব্য, অচিন্ত্যস্বরূপ এবং সূক্ষ্ম হতেও সূক্ষ্মতর ঐ ব্রহ্ম বহুরূপে প্রকাশ পান। তিনি দূর হতেও সুদূরে অথচ এই দেহেই অতি নিকটে— এই জগতে চেতন জীবগণের হৃদয়গুহাতেই তিনি অবস্থিত।

ব্রহ্ম চক্ষু দ্বারা গৃহীত হন না, বাক্যের দ্বারাও নন। অপর ইন্দ্রিয়ের দ্বারা, তপস্যা দ্বারা অথবা অগ্নিহোত্রাদি কর্মের দ্বারাও গৃহীত হন না। বুদ্ধি নির্মল

হলেই লোক ব্রহ্মজ্ঞানের যোগ্য হয়, অতএব ধ্যানপরায়ণ ব্যক্তিই সেই নিরবয়ব ব্রহ্মকে দর্শন করেন।

আত্মার দ্বারা জীবগণের ইন্দ্রিয়সহ সমস্ত্র চিত্ত ওতপ্রোত রয়েছে। চিত্ত প্রসন্ন হলেই এই আত্মা আপনাকে বিশেষরূপে প্রকটিত করেন। সুতরাং এই দেহে প্রাণ পঞ্চ প্রকারে সম্প্রবিষ্ট হয়ে আছে, সেই দেহের মধ্যেই বিশুদ্ধ চিত্তের দ্বারা এই সূক্ষ্ম আত্মাকে জানতে হবে।

নির্মলান্তঃকরণ আত্মবিদ পুরুষ যে যে লোক-বিষয়ে মনের দ্বারা সংকল্প করেন এবং তিনি যে সকল ভোগ প্রার্থনা করেন, সেই সকল লোক এবং সেই সকল ভোগই প্রাপ্ত হন। সুতরাং যিনি বিভূতি কামনা করেন, তিনি আত্মজ্ঞানীর পূজা করবেন।

দ্বিতীয় খণ্ড

যে ব্রহ্মে সমস্ত জগৎ সমর্পিত রয়েছে এবং যিনি নির্মল জ্যোতিতে প্রকাশ পান, আত্মজ্ঞ পুরুষ পরম আশ্রয় সেই ব্রহ্মকে জানেন। বিভূতি-তৃষ্ণা-বর্জিত যে সকল ধীমান ব্যক্তি আত্মজ্ঞ পুরুষের সেবা করেন, তাঁরা আর শরীর গ্রহণ করেন না।

যিনি বিষয়ের গুণাবলী অনুধ্যান করে ভোগ্য বিষয়গুলো কামনা করেন, তিনি কামনা-পরিবেষ্টিত হয়ে সেই সেই কাম্যবিষয়ের মধ্যে জন্মগ্রহণ করেন। কিন্তু যিনি পূর্ণকাম এবং যাঁর আত্মা স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন, তাঁর জীবিতাবস্থায়ই সকল কামনা বিলীন হয়।

বহু শাস্ত্রাভ্যাসের দ্বারা ঐ আত্মাকে পাওয়া যায় না, মেধার দ্বারাও নয়, বহু শ্রবণের দ্বারাও নয়, সাধক যে পরমাত্মাকে বরণ করেন, সেই আত্মবরণের দ্বারাই তিনি লভ্য। সেই মুমুক্ষুর এই আত্মাই আপনার পারমার্থিক স্বরূপ প্রকাশ করেন।

এই আত্মা বলহীনের দ্বারা লভ্য নন, প্রমাদের দ্বারা বা সন্ন্যাসরহিত জ্ঞানের দ্বারাও লভ্য নন, পরন্তু যে বিবেকী এই সকল উপায় অবলম্বনে যত্ন করেন, তাঁরই আত্মা সর্বাশ্র ব্রহ্মে প্রবেশ করেন।

এই আত্মাকে অবগত হলে সাক্ষাৎকারিগণ জ্ঞান ভিন্ন অন্য কিছুতেই তৃপ্ত

হন না। তাঁদের আত্মা পরমাত্মায় প্রতিষ্ঠিত হন ; তাঁরা আসক্তিশূন্য এবং উপরতেন্দ্রিয় হন। এই ধীর ও নিত্যসমাহিত ব্যক্তিগণ জীবনকালে সর্বব্যাপী ব্রহ্মকে সর্বত্র প্রাপ্ত হয়ে (দেহপাতকালেও) সর্বস্বরূপেই প্রবেশ করেন।

বেদান্তজনিত বিজ্ঞানের বিষয় পরমাত্মা যাঁদের কাছে সুনিশ্চিত হয়েছেন, সন্ন্যাস-যোগ-অবলম্বনে যাঁরা বিশুদ্ধচিত্ত হয়েছেন এবং যাঁরা যত্নশীল, তাঁরা সকলে (জীবদ্দশাতেই) পরমাত্মার সঙ্গে একীভূত হয়ে চরম দেহত্যাগকালে সর্বত্র নির্বাণপ্রাপ্ত হন।

যে কেউ সেই পরব্রহ্মকে জানেন, তিনি ব্রহ্মই হয়ে থাকেন। এঁর কুলে কেউ অব্রহ্মবিদ্ হন না। তিনি মানস সন্তাপ অতিক্রম করেন এবং ধর্মাধর্ম অতিক্রম করেন। তিনি হৃদয়স্থ অবিদ্যাগ্রন্থিগুলো থেকে নির্মুক্ত হয়ে অমর হন।

ঐ ব্রহ্মবিদ্যা কিভাবে দান করতে হবে, তা এই মন্ত্রে বলা হয়েছে— যাঁরা যথাশাস্ত্র ধর্মপরায়ণ, বেদনিষ্ঠ ও অপর-ব্রহ্মোপাসক, যাঁরা শ্রদ্ধার সঙ্গে একর্ষি নামক অগ্নিতে স্বয়ং আহুতি প্রদান করেন এবং যাঁরা মস্তকে অগ্নি-ধারণরূপ ব্রত যথাবিধি আচরণ করেছেন, তাঁদেরই কাছে এই ব্রহ্মবিদ্যা বলবে।

অঙ্গিরা ঋষি এই সত্য অক্ষর পুরুষের উপদেশ করেছিলেন। তিনি ব্রত আচরণ করেননি, তিনি তা পাঠ করেন না। পরম ঋষিদের নমস্কার। পরম ঋষিদের নমস্কার।

ঘ· ভগবদ্‌গীতা

[খ্রি. পূ. ৪০০ থেকে খ্রি. পূ. ২০০ এই সময়ের মধ্যে মূলত রচিত। অধিকাংশ প্রাচীন হিন্দু শাস্ত্রগ্রন্থের মতো গীতার ক্ষেত্রেও রচনাকাল নিয়ে মতান্তর আছে। কেউ কেউ মনে করেন ভগবদ্‌গীতা প্রাক্‌-বৌদ্ধ যুগের অর্থাৎ খ্রি. পূ. ষষ্ঠ শতকের পূর্বেকার।]

তৃতীয় অধ্যায়

অর্জুনের উক্তি :

হে জনার্দন, যদি আপনার মতে কর্ম অপেক্ষা জ্ঞান শ্রেষ্ঠ হয়, তবে আমাকে এই হিংসাত্মক কর্মে (যুদ্ধে) কেন নিযুক্ত করছেন?

আপন সন্দেহজনকরূপে প্রতীয়মান বাক্যের দ্বারা আমার মন যেন ভ্রান্ত করছেন। এই উভয়ের একটি আমাকে নিশ্চয় করে বলুন, যার ফলে আমি শ্রেয়োলাভ করতে পারি।

শ্রীভগবানের উক্তি :

হে নিষ্পাপ অর্জুন, ইহলোকে জ্ঞানীদের জন্য জ্ঞানযোগ এবং নিষ্কাম কর্মীদের জন্য কর্মযোগ— এই দুই প্রকার নিষ্ঠার বিষয় সৃষ্টির প্রারম্ভে আমি বেদমুখে বলেছি। কর্মানুষ্ঠান না করে কেউ নৈষ্কর্ম্য লাভ করতে পারে না। কর্মযোগে চিত্তশুদ্ধি ও আত্মবিবেক না হলে নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধি হয় না। কেবলমাত্র জ্ঞানশূন্য কর্মত্যাগ দিয়ে ঐ অবস্থা লাভ অসম্ভব।

কর্ম না করে কেউই ক্ষণমাত্রও থাকতে পারে না। অস্বতন্ত্র হয়ে সকলেই

মায়াজাত সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ গুণের প্রভাবে কর্ম করতে বাধ্য হয়। যে মূঢ় ব্যক্তি হস্ত, পদ ও বাক্যাদি পঞ্চকর্মেন্দ্রিয় সংযত করে মনে মনে শব্দরসাদি ইন্দ্রিয়-বিষয় স্মরণ করে অবস্থান করে, তাকে মিথ্যাচারী বলে। কিন্তু যিনি বিবেকযুক্ত মনের দ্বারা চক্ষুকর্মাদি পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় সংযত করে অনাসক্ত-ভাবে কর্মেন্দ্রিয়ের সাহায্যে কর্মানুষ্ঠান করেন, তিনি পূর্বোক্ত মিথ্যাচারী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

তুমি শাস্ত্রোপদিষ্ট নিত্যকর্ম করো। কর্ম না করা অপেক্ষা কর্ম করাই শ্রেয়। কর্মহীন হলে তোমার দেহযাত্রাও নির্বাহ হবে না। ঈশ্বরের প্রীতির জন্য অনুষ্ঠিত কর্ম ছাড়া অন্য কর্ম বন্ধনের কারণ হয়। অতএব তুমি ভগবানের উদ্দেশ্যে অনাসক্ত হয়ে বর্ণাশ্রমোচিত কর্ম করো।

হে পার্থ, যে ব্যক্তি এইভাবে ঈশ্বর কর্তৃক প্রবর্তিত কর্মচক্রের অনুগামী না হয়, সেই ইন্দ্রিয়াসক্ত পাপী ব্যক্তি বৃথা জীবনধারণ করে।

কিন্তু যে ব্যক্তি আত্মাতেই প্রীত, আত্মাতেই তৃপ্ত এবং আত্মাতেই সন্তুষ্ট, তাঁর কোনও কর্তব্য নেই।

আত্মজ্ঞানীর ইহজগতে কর্মানুষ্ঠানের কোনও প্রয়োজন নেই, কর্ম না করলেও তাঁদের কোনও প্রত্যবায় হয় না ; অতএব তুমি অনাসক্ত হয়ে সর্বদা কর্তব্য কর্মের অনুষ্ঠান করো। কামনাশূন্য হয়ে কর্ম করলে মানুষ নিশ্চয় মুক্তিলাভ করে।

হে পার্থ, স্বর্গমর্ত্যাদি তিন লোকে আমার কোনও কর্তব্য কর্ম নেই এবং আমার অপ্রাপ্ত বা প্রাপ্তব্য বস্তু নেই। তথাপি আমি লোককল্যাণের জন্য সর্বদা কর্মে ব্যাপৃত আছি ; কর্মত্যাগ করিনি।

হে পার্থ, যদি আমি অনলস হয়ে কর্মে প্রবৃত্ত না হই, তবে মানবেরা সর্বপ্রকারে আমার অবলম্বিত পথেরই অনুবর্তী হবে ; অলস হয়ে কর্মত্যাগ করবে।

হে ভারত, অজ্ঞানীরা আসক্ত হয়ে যেমন কর্ম করেন, জ্ঞানীরা অনাসক্ত হয়ে লোকশিক্ষার জন্য তেমনি কর্ম করেন।

প্রকৃতির গুণের দ্বারা ভ্রান্ত ব্যক্তিরা দেহেন্দ্রিয় সংঘাতের কর্মে আসক্ত হন অর্থাৎ ফলের জন্য আমরা কর্ম করি এমন অভিমান করেন। সর্বজ্ঞ আত্মবিৎ সেই অজ্ঞ অনাত্মবিৎ মন্দবুদ্ধি ব্যক্তিদের বিচালিত করবেন না। পরমেশ্বরের

জন্য ভৃত্যবৎ কর্ম করছি—এই বুদ্ধি দ্বারা আমাতে সমস্ত কর্ম সমর্পণ করে ফলাসক্তিহীন, মমত্বহীন ও শোকশূন্য হয়ে তুমি যুদ্ধ করো।

যাঁরা নিষ্কাম কর্মবিষয়ে শ্রদ্ধাবান ও অসূয়াশূন্য হয়ে আমার এই মত সর্বদা অনুষ্ঠান করেন, তাঁরাও ধর্মাধর্মাদি কর্মের কর্তৃত্ববুদ্ধিরূপ বন্ধন থেকে মুক্ত হন।

কিন্তু যে অশ্রদ্ধাবান ব্যক্তিরা আমার এই বাক্যের নিন্দা করে এবং তা পালন করে না, সেই বিবেকহীন ব্যক্তিদের সর্বজ্ঞান-মূঢ় ও পরমার্থভ্রষ্ট বলে জেনো।

জ্ঞানীও স্বীয় প্রকৃতির অনুরূপ কাজ করেন, অজ্ঞের কী কথা? প্রাণীরা নিজ নিজ প্রকৃতিকে অনুসরণ করে ; এই জন্যই আমার উপদিষ্ট স্বধর্মাচরণ করতে পারে না; সুতরাং আমার বা অন্যের শাসন বা নিষেধে কী ফল হবে? সকল ইন্দ্রিয়েরই অনুকূল ও প্রতিকূল বিষয়ভেদে যথাক্রমে আসক্তি ও বিদ্বেষ অবশ্যম্ভাবী ; কিছুতেই তাদের বশীভূত হবে না। কারণ এই দুটি জীবের শ্রেয়োমার্গের প্রতিকূল। স্বধর্মের অনুষ্ঠান দোষযুক্ত হলেও উত্তমরূপে অনুষ্ঠিত পরধর্মের চেয়ে উৎকৃষ্ট। স্বধর্মে নিধনও কল্যাণকর, কিন্তু পরধর্ম ভয়াবহ।

অর্জুনের উক্তি :

হে কৃষ্ণ, মানুষ কার দ্বারা চালিত হয়ে অনিচ্ছা সত্ত্বেও যেন বলপূর্বক নিযুক্ত হয়েই পাপাচরণে প্রবৃত্ত হয়?

শ্রীভগবানের উক্তি :

এটি রজোগুণজাত, দুষ্পূরণীয় ও অত্যুগ্র কাম এবং এটিই ক্রোধ। সংসারে একে মহাশত্রু বলে জানবে।

হে কৌন্তেয়, এই কাম জ্ঞানীর চিরশত্রু। এই তৃষ্ণারূপ কামের দ্বারা বিবেকবুদ্ধি আবৃত থাকে। তুমি প্রথমে ইন্দ্রিয়গুলোকে বশীভূত করে জ্ঞান ও বিজ্ঞাননাশক পাপরূপ এই কামকে পরিহার করো। স্থূল দেহ থেকে

ইন্দ্রিয় শ্রেষ্ঠ। ইন্দ্রিয় থেকে মন এবং মন থেকে বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ। যিনি সকলের অভ্যন্তরে, তিনিই বুদ্ধির স্রষ্টা পরমাত্মা। হে অর্জুন, শুদ্ধ বুদ্ধি দ্বারা মনকে সমাহিত করে বুদ্ধির স্রষ্টা পরমাত্মাকে এইভাবে জেনেই অজ্ঞানমূলক দুর্জয় শত্রু কামকে জ্ঞানের দ্বারা মূলোচ্ছেদ করে বিনাশ করো।

দ্বাদশ অধ্যায়

অর্জুনের উক্তি :

হে ভগবান, এইভাবে নিরন্তর ভগবৎকর্মাদিতে নিযুক্ত হয়ে যে সব অনন্যশরণ ভক্ত সমাহিতচিত্তে আপনার যথাদর্শিত বিশ্বরূপের উপাসনা করেন এবং যাঁরা সমস্ত বাসনা ও কর্ম পরিত্যাগ করে সর্বোপাধিরহিত ইন্দ্রিয়াতীত অক্ষর ব্রহ্মের উপাসনা করেন,এই উভয়ের মধ্যে কারা শ্রেষ্ঠ যোগী?

শ্রীভগবানের উক্তি :

পরমেশ্বরের ভজন দ্বারাই জীবের উদ্ধার হয়— এই বিশ্বাস দৃঢ় করে যাঁরা আমার বিশ্বরূপে মনোনিবেশ করে মচ্চিত্ত হয়ে অহোরাত্র অতিবাহিত করেন, তাঁরাই আমার মতে শ্রেষ্ঠ যোগী।

কিন্তু যাঁরা সর্বদা ইষ্ট ও অনিষ্ট প্রাপ্তিতে রাগ ও দ্বেষ-রহিত, সকল প্রাণীর কল্যাণে নিযুক্ত এবং ইন্দ্রিয়সংযমী, যাঁরা শব্দাদিপ্রমাণ দ্বারা অপ্রতিপাদ্য, প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের অগোচর, সর্বব্যাপী, মনাতীত, কূটস্থ, অচ্যুতস্বরূপ এবং শাশ্বত নির্গুণ ব্রহ্মের উপাসনা করেন তাঁরা আমাকেই প্রাপ্ত হন। এই সকল জ্ঞানী আমার আত্মাই।

যাঁদের চিত্ত নির্গুণ, নিরাকার ব্রহ্মে আসক্ত, তাঁদের সিদ্ধিলাভের জন্য ভগবৎকর্মাদিপরায়ণ সগুণ উপাসক অপেক্ষা অধিকতর ক্লেশ পেতে হয় ; কারণ নির্গুণ ব্রহ্মে নিষ্ঠালাভ করা দেহাভিমানী ব্যক্তিদের পক্ষে অতিশয় কষ্টকর।

হে পার্থ, কিন্তু যাঁরা সমস্ত কর্ম আমাতেই সমর্পণ করে 'আমিই পরম পুরুষার্থরূপে উপাস্য'— এইভাবে মৎপরায়ণ হয়ে অনন্য যোগের দ্বারা আমার উপাসনা ও ধ্যান করেন, মদ্গতচিত্ত সেই সকল ভক্তকে মৃত্যুময় সংসারসাগর থেকে আমি অচিরে উদ্ধার করি।

অতএব, আমার বিশ্বরূপেই তুমি মন সমাহিত করো, আমাতেই বুদ্ধি নিবিষ্ট করো। এ রকম করলে দেহান্তে তুমি নিশ্চয় মৎস্বরূপে স্থিতিলাভ করবে, এতে কোনও সন্দেহ নেই।

হে ধনঞ্জয়, যদি তুমি আমাতে স্থিরভাবে চিত্ত সমাহিত করতে না পারো তবে অভ্যাস-যোগের দ্বারা বিশ্বরূপ আমাকে লাভ করতে যত্ন করো।

যদি তুমি এইরকম অভ্যাসে সমর্থ না হও তবে ভগবৎপ্রীতিকর কর্মে একনিষ্ঠ হও। কারণ আমার জন্য কর্ম করতে করতেই তুমি ক্রমে চিত্তশুদ্ধি ও মোক্ষলাভ করবে।

আর যদি এতেও অক্ষম হও, তবে ইন্দ্রিয় সংযম করে আমাতে সর্বকর্ম-সমর্পণরূপ যোগ আশ্রয় করে যাবৎ অনুষ্ঠিত কর্মের ফলত্যাগ করবে।

অবিবেকপূর্বক অভ্যাস অপেক্ষা শ্রুতি ও যুক্তি দ্বারা আত্মনিশ্চয় উৎকৃষ্ট। এই রকম আত্মনিশ্চয় অপেক্ষা জ্ঞানপূর্বক ধ্যান শ্রেষ্ঠ ; জ্ঞানপূর্বক ধ্যানের থেকে কর্মফলত্যাগ শ্রেষ্ঠ। কর্মফলত্যাগের অব্যবহিত পরেই সহেতুক সংসার নিবৃত্তিরূপ পরম শান্তি লাভ হয়।

যিনি সকল প্রাণীর প্রতি দ্বেষহীন, মিত্রভাবাপন্ন, দয়ালু, মমত্ববুদ্ধিশূন্য, নিরহংকার, সুখে আসক্তি ও দুঃখে দ্বেষ-বর্জিত, ক্ষমাশীল, সর্বদা সন্তুষ্ট, সদা সমাহিতচিত্ত, সদা সংযত স্বভাব, সদা তত্ত্ববিষয়ে দৃঢ়নিশ্চয় এবং যাঁর মন ও বুদ্ধি সর্বদা আমাতে অর্পিত, তিনি আমার প্রিয় ভক্ত।

যিনি কাউকেও উদ্বিগ্ন করেন না, যিনি কারও দ্বারা উদ্বিগ্ন হন না এবং যিনি হর্ষ ও বিষাদ, ভয় ও উদ্বেগ থেকে মুক্ত, তিনি আমার প্রিয় ভক্ত।

যিনি নিস্পৃহ, বাহ্যাভ্যন্তর-শুচি, দক্ষ, পক্ষপাতশূন্য, ভয়হীন এবং সকামকর্মের অনুষ্ঠান-ত্যাগী, তিনি আমার প্রিয় ভক্ত।

যিনি ইষ্টপ্রাপ্তিতে হৃষ্ট হন না, অনিষ্টপ্রাপ্তিতে দ্বেষ করেন না, প্রিয়বিয়োগে শোক করেন না, অপ্রাপ্ত ইষ্টবস্তু আকাঙ্ক্ষা করেন না এবং শুভাশুভ সকল কর্ম পরিত্যাগ করেছেন, তিনি আমার প্রিয় ভক্ত।

যিনি আসক্তিহীন এবং শত্রু ও মিত্রে সমবুদ্ধি, যিনি সম্মানে ও অপমানে অবিচলিত, যিনি শীতোষ্ণজনিত সুখে ও দুঃখে নির্বিকার, পরমাত্মাতে স্থিরবুদ্ধি, প্রশংসায় হর্ষ ও নিন্দায় বিষাদশূন্য সুতরাং সংযতবাক্, সর্বাবস্থায় যৎকিঞ্চিৎলাভে সন্তুষ্ট এবং নির্দিষ্ট বাসস্থানহীন, তিনি আমার প্রিয় ভক্ত।

যে সকল মৎপরায়ণ ভক্ত এই মোক্ষদায়ক ধর্ম ঐভাবে শ্রদ্ধাসম্পন্ন হয়ে সাধন করেন, তাঁরাই আমার অতীব প্রিয়।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

অর্জুনের উক্তি

হে কেশব, প্রকৃতি ও পুরুষ, ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ, জ্ঞান ও জ্ঞেয়— এই সব আমি জানতে ইচ্ছা করি।

শ্রীভগবানের উক্তি

হে অর্জুন, এই ভোগায়তন শরীররূপী দৃশ্যটিকে ক্ষেত্র বলা হয়। যিনি এই শরীরকে জানেন, অর্থাৎ স্বাভাবিক বা ঔপদেশিক জ্ঞানের বিষয় করেন, ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞবিদ্‌গণ তাঁকে ক্ষেত্রজ্ঞ বলেন।

হে অর্জুন, সকল ক্ষেত্রের স্রষ্টা ক্ষেত্রজ্ঞ এক। ক্ষেত্রজ্ঞ ক্ষেত্র হ্‌ইতে পৃথক। আমাকে সেই ক্ষেত্রজ্ঞ বলে জানবে। ব্রহ্মাদি-স্থাবরান্ত সর্বদেহই প্রকৃতির পরিণাম। এক ক্ষেত্রজ্ঞ দেহাদি উপাধি দ্বারা প্রবিভক্তের মতো প্রতীয়মান হন। তাঁকে সর্বোপাধিবিবর্জিত, সদসদাদি সমস্ত শব্দ ও প্রত্যয়ের অগোচর 'আমি' বলে জানবে। কারণ ক্ষেত্র আর ক্ষেত্রজ্ঞের এই রকম জ্ঞানই আমার মতে প্রকৃত জ্ঞান।

সেই ক্ষেত্র যা ও যে রকম যেমন ধর্মযুক্ত, যেমন বিকারযুক্ত যা থেকে যেভাবে উৎপন্ন হয় এবং সেই ক্ষেত্রজ্ঞ স্বরূপত যা ও যেমন উপাধিকৃত শক্তিশালী, তা সংক্ষেপে আমার কাছে শোনো।

এই ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের স্বরূপ বশিষ্ঠাদি ঋষিরা নানাভাবে বর্ণনা করেছেন। ঋক্ প্রভৃতি বেদচতুষ্টয়ের নানা শাখাতেও এই তত্ত্ব বিচিত্র ছন্দে বিভিন্নভাবে গীত হয়েছে এবং যুক্তিযুক্ত ও ব্রহ্মস্বরূপ-প্রতিপাদক বেদবাক্যের দ্বারা এই তত্ত্ব অসন্দিগ্ধভাবে নির্ণীত হয়েছে।

পঞ্চ সূক্ষম মহাভূত, মহাভূতের কারণ অহংকার, অহংকারের কারণ বুদ্ধি, বুদ্ধির কারণ মূল প্রকৃতি, দশ ইন্দ্রিয় ও মন, ইন্দ্রিয়ের পঞ্চ বিষয় স্থূল পঞ্চভূত এবং ইচ্ছা, দ্বেষ, সুখ, দুঃখ, দেহ-সংঘাত ও দেহ-সংঘাতে অভিব্যক্ত চেতনা ও ধৃতি— এই সব বিকারযুক্ত ক্ষেত্র সংক্ষেপে বর্ণিত হল।

উৎকর্ষ সত্ত্বেও আত্মশ্লাঘারাহিত্য, দম্ভশূন্যতা, প্রাণীপীড়নে অনিচ্ছা, ক্ষমা, সরলতা, গুরুসেবা, বহিরন্তর-শৌচ, মোক্ষমার্গে স্থিরতা, স্বাভাবিক প্রবৃত্তিকে সংযত করে সন্মার্গে পরিচালনা, ইন্দ্রিয়ভোগ্য বস্তুতে বিরক্তি, অভিমানশূন্যতা, জন্ম-মৃত্যু-জরা-ব্যাধিরূপ দুঃখে পুনঃ পুনঃ দোষদর্শন, বিষয়ে অনাসক্তি, স্ত্রী, পুত্র ও গৃহাদিতে মমত্বাভাব, শুভাশুভ প্রাপ্তিতে সদা চিত্তের সাম্যভাব, ভগবানই একমাত্র গতি—এই নিশ্চিত বুদ্ধির দ্বারা আমাতে অচলা ভক্তি, নির্জন বাস, প্রাকৃতজনের সংস্রব ত্যাগ, আত্মানাত্মবিবেক, জ্ঞানে নিষ্ঠা ও তত্ত্বজ্ঞানার্থ-দর্শন— এই সব আত্মজ্ঞানের সাধন বলে কথিত হয়। এর বিপরীত ভাব ও দাম্ভিকতাদি অজ্ঞান বলে জ্ঞেয় এবং সংসারপ্রবৃত্তির কারণ বলে পরিহার্য।

হে অর্জুন, যা জ্ঞাতব্য, যা জেনে অমৃতত্ব (মোক্ষ) লাভ হয়, তা তোমাকে বলব। তিনি আদিহীন পরব্রহ্ম। তিনি সৎশব্দ ও সৎ প্রত্যয়ের অগোচর এবং অসৎ শব্দ ও অসৎ প্রত্যয়েরও অগোচর। কারণ ইন্দ্রিয়গোচর বস্তুই সৎ বা অসৎ শব্দ ও প্রত্যয়ের গোচর হয় ; কিন্তু ব্রহ্ম ইন্দ্রিয়াতীত। তিনি (পরব্রহ্ম) সমগ্র বিশ্বকে ব্যাপ্ত করে বিরাজিত। সকল শরীরের হস্ত ও পদ, চক্ষু ও কর্ণ, মস্তক ও মুখ তাঁর হস্ত ও পদ, চক্ষু ও কর্ণ এবং মস্তক ও মুখ।

সমস্ত অন্তরিন্দ্রিয় ও বহিরিন্দ্রিয়ের কার্যসমূহের দ্বারা তিনি অবভাসিত হন। তিনি ইন্দ্রিয়কার্যে লিপ্ত আছেন এইরূপ প্রতীত হলেও বস্তুত তিনি কোনও ইন্দ্রিয় ব্যাপারে ব্যাপৃত নন। কারণ তিনি সকল ইন্দ্রিয়বিহীন। তিনি সমস্ত সংশ্লেষরহিত। তথাপি মরুভূমি যেমন মৃগতৃষ্ণিকার আস্পদ, তেমনি

তিনি সর্বভূতের আশ্রয়। তিনি ত্রিগুণরহিত। অথচ তিনি মায়া দ্বারা ত্রিগুণের পরিণাম সুখ, দুঃখ ও মোহের উপলব্ধা।

তিনি চরাচর সর্বভূতের অন্তরে ও বাহিরে এবং স্থাবর ও জঙ্গম দেহসমূহে বিরাজিত। অতি সূক্ষ্ম বলে তিনি অবিজ্ঞেয়। তিনি অজ্ঞানীর অজ্ঞাত বলে অতি দূরে এবং আত্ম-স্বরূপে জ্ঞাত বলে জ্ঞানীর অতি নিকটে।

ব্রহ্ম অপরিচ্ছিন্ন হয়েও সর্বভূতে বিভক্তরূপে প্রতীত হন। রজ্জু যেমন কল্পিত সর্পাদির সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের কারণ তেমনি তিনি সর্বভূতের পালক, সংহারক ও স্রষ্টা।

ব্রহ্ম আদিত্যাদি জ্যোতিসমূহেরও জ্যোতি এবং অজ্ঞানরূপ অন্ধকারের দ্বারা অসংস্পৃষ্ট। জ্ঞান, জ্ঞেয় এবং জ্ঞানগম্যরূপে তিনি সকলের হৃদয়ে অধিষ্ঠিত।

এইভাবে ক্ষেত্র, জ্ঞান এবং জ্ঞেয় সংক্ষেপে বলা হল। আমার ভক্ত ক্ষেত্র, জ্ঞান ও জ্ঞেয়ের যথার্থ তত্ত্ব অবগত হয়ে ব্রহ্মভাবলাভে সমর্থ হন।

প্রকৃতি ও পুরুষ উভয়কেই অনাদি বলে জানবে। বুদ্ধ্যাদি দেহেন্দ্রিয় পর্যন্ত বিকারসমূহ এবং সুখ-দুঃখ ও মোহাত্মক গুণসমূহ প্রকৃতি থেকে উৎপন্ন বলে জানবে।

প্রকৃতি কার্য এবং করণের উৎপত্তির কারণ এবং পুরুষ (জীব) সুখ ও দুঃখসমূহের উপলব্ধির কারণ বলে বলা হয়।

পুরুষ (ভোক্তা, ক্ষেত্রজ্ঞ) প্রকৃতিতে অবস্থিত হয়ে সুখ-দুঃখ-কার্য-করণরূপ পরিণত ও মোহাকারে অভিব্যক্ত প্রকৃতির গুণসমূহ ভোগ করেন। এই সকল গুণে আত্মভাবই পুরুষের দেবাদি সৎ জন্ম ও পশ্বাদি অসৎ জন্ম ও সদসদ্‌যোনিরূপ মনুষ্যজন্ম গ্রহণের প্রধান কারণ।

যিনি দেহ, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি প্রভৃতির সাক্ষী বলে এবং অনুমোদনকর্তা, ভর্তা, ভোক্তা, মহেশ্বর, পরমাত্মারূপে শ্রুতিতে উক্ত হন, সেই পুরুষোত্তমই এই দেহে বর্তমান আছেন অর্থাৎ উপলব্ধ হন।

যিনি পুরুষকে (ব্রহ্মকে) সাক্ষাৎ আত্মভাবে জানেন ও সকল বিকারের সঙ্গে অবিদ্যারূপ প্রকৃতিকে মিথ্যা বলে জানেন, যে কোনও অবস্থায় বিদ্যমান হয়েও তিনি পুনর্বার জন্মগ্রহণ করেন না।

কেউ কেউ ধ্যানের দ্বারা শুদ্ধ অন্তঃকরণ-সহায়ে বুদ্ধিতে সাক্ষীভূত

প্রত্যক্‌চৈতন্যকে দর্শন করেন। অন্য কেউ কেউ জ্ঞানযোগ দ্বারা এবং অপর কেউ কর্মযোগ দ্বারা আত্মদর্শন করেন।

অপর কেউ কেউ এই ভাবে আত্মাকে জানতে না পেরে আচার্যের নিকট উপদেশ গ্রহণ করে উপাসনা করেন। তাঁরাও গুরুদত্ত উপদেশ নিষ্ঠার সঙ্গে সাধন করে এই মৃত্যুময় সংসার অতিক্রম করেন।

হে অর্জুন, যা কিছু স্থাবর এবং জঙ্গম পদার্থ উৎপন্ন হয়, সেই সবই ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের সংযোগে উৎপন্ন হয় জানবে।

যিনি বিনাশশীল, সর্বভূতে নির্বিশেষভাবে অবস্থিত অবিনাশী পরমাত্মাকে দর্শন করেন, তিনিই সম্যগ্‌দর্শী।

সেই সমদর্শী সর্বত্র নির্বিশেষরূপে অবস্থিত পরমাত্মাকে দর্শন করেন বলে নিজে নিজেকে হিংসা করেন না। সেই হেতু তিনি পরম গতি প্রাপ্ত হন।

কায়মনোবাক্যের দ্বারা কৃত সকল কর্ম প্রকৃতি দ্বারাই সর্বপ্রকারে সম্পাদিত এবং আত্মাকে সর্বোপাধিবিবর্জিত বলে যিনি দর্শন করেন, তিনিই সম্যগ্‌দর্শী।

যখন তিনি পৃথক পৃথক ভূতসমূহকে আত্মাতেই একত্র অবস্থিত দর্শন করেন এবং সেই আত্মা থেকেই ভূতসকলের বিকাশ উপলব্ধি করেন, তখন তিনি ব্রহ্মস্বরূপ হন।

হে কৌন্তেয়, এই পরমাত্মা অনাদি ও নির্গুণ বলে অব্যয়। সেইহেতু তিনি শরীর সমূহে অবস্থিত হলেও কোনও কর্ম করেন না। সুতরাং কখনও কোনও কর্মফলে লিপ্ত হন না।

যেমন সর্বব্যাপী আকাশ পঙ্কাদি সকল পদার্থে অবস্থিত হয়েও অতি সূক্ষ্ম বলে কোনও বস্তুতে লিপ্ত হয় না, সেইরূপ সকল প্রকার দেহে থেকেও আত্মা দৈহিক গুণ বা দোষে কখনও লিপ্ত হন না।

হে ভারত, যেমন একমাত্র সূর্য সমগ্র জগৎকে আলোকিত করেন, তেমনি এক পরমাত্মা সমস্ত ক্ষেত্রকে প্রকাশিত করেন। কিন্তু তিনি কখনোই প্রকাশ্য ক্ষেত্রের ধর্ম দ্বারা লিপ্ত হন না।

যাঁরা এই ভাবে ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের পরস্পর প্রভেদ জানেন এবং ভূতসমূহের অবিদ্যারূপ প্রকৃতির মিথ্যাত্ব জ্ঞানচক্ষু দ্বারা জ্ঞাত হন, তাঁরা পরব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন।

নির্দেশিকা